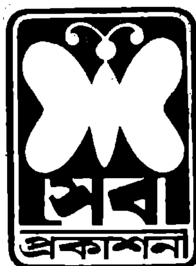
কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন



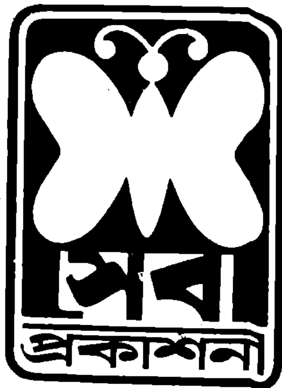
ভলিউম

ভলিউম ১



কুয়াশা ১, ২, ৩

কাজী আনোয়ার হোসেন



Sheeman
Dhaka
1992

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রণঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-1
KUASHA SERIES
By: Qazi Anwar Husain

কুয়াশা ১

এক

প্রচণ্ড শীত। মাঘের প্রথম। রাত দেড়টা। সেগুন বাগান।

সমস্ত এলাকাটা ঘুমে অচেতন। জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। কেবল টহলদার নাইট গার্ড টহল দিয়ে ফিরছে। মাঝে মাঝে হুইস্‌ল্ বাজাচ্ছে, সাথে সাথেই দূর থেকে ক্ষীণ প্রত্যুত্তর আসছে ভেসে।

খট্ খট্ খট্। টহলদারের লাঠির শব্দে রাত্রি আরও নিঝুম হয়ে আসে। রাস্তার পাশে সারি সারি লাইটপোস্টের আলোর চারধারে অনেকগুলো পোকা অনবরত ঘোরে।

এমনি সময় দেখা গেল একখানি কালো শেভ্রোলে গাড়ি সামনের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। গাড়িটা কাছে এলে নাম্বার প্লেটের দিকে নজর যেতেই টহলদারের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। সশব্দে জুতো ঠুকে স্যালুট করলো সে। সিটি এস. পি.-র গাড়ি। ভিতরটা অন্ধকার। কেউ মাথা নাড়লো কিনা বোঝা গেল না। গাড়ি সমান গতিতে এগিয়ে গেল সামনে।

গাড়িটা এসে থামলো একটা একতলা বাড়ির সামনে। এদিকটা অন্ধকার। মৃদু গর্জন করে এঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল। একজন ওভারকোট পরা লোক নামলো গাড়ি থেকে। নিঃশব্দে আগন্তুক এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। হাতে তার ছোটো একটা বাক্স।

লোকালয় থেকে কিছু দূরে বাড়িটা। অনেকদিনের পুরোনো বাড়ি, কিন্তু এখনও বেশ মজবুত আছে। বাড়ির সামনে খানিকটা বাগান। এলোমেলো করে অনেক ফুলগাছ লাগানো। মাঝে মাঝে পেয়ারা, জামরুল আর আম-কাঁঠালের গাছ। সবটা মিলে জঙ্গল বলে বোধ হয়। তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা বাগানটা। ছোট্ট একটা লোহার গেট আছে বাড়িতে ঢুকবার জন্যে।

কোনও শব্দ না করে গেট খুললো লোকটা। একবার চারদিকে চাইলো, তারপর ঢুকে পড়লো বাগানের ভিতর। সোজা এগিয়ে গেল সে বাড়িটার দিকে। সব কটা দরজাই বন্ধ ভিতর থেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো আগন্তুক, তারপর একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। মোটা শিক দেয়া জানালা। বেডরুম। সমস্ত ঘরটার মধ্যে কেবল এই জানালাই খোলা। হাতের বাক্স খুলে ফেললো লোকটা। ওটা কিসের

যেন একটা যন্ত্র। ক্যামেরার মতো দেখতে। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেগুলেট করে নিয়ে যন্ত্রটার মুখ শিকের নিচের দিকে ধরে একটা বোতাম টিপতেই মুহূর্তে আশ্চর্যজনক ভাবে গলে গেল লোহার গরাদ। এইভাবে সব কটা গরাদই গলিয়ে ফেললো আগন্তুক। তারপর অবলীলাক্রমে একটা একটা করে সব শিক বাঁকিয়ে উপর দিকে তুলে দিলো।

এবার নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো লোকটা। দুজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে মস্ত একটা খাটের উপর লেপ মুড়ি দিয়ে। স্বামী–স্ত্রী বলেই মনে হয়। খাটের তলে একটা হ্যারিকেন রাখা, আলো খুব কমানো। খাটের কাছে একটা দামী আয়রন সেফ। চাবি ঢোকাবার জায়গায় বোতাম টিপে যন্ত্রটা ধরতেই নাম করা কোম্পানীর আয়রন সেফ আলগা হয়ে গেল। কয়েক তোড়া নোট এবং গোটাকতক গিনি পকেটে পুরলো আগন্তুক। আরেকটা দেরাজে কয়েকটা দামী গহনা। হীরে সেট করা বহুমূল্য নেকলেসটা পকেটে ফেললো সে।

এবারে বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিলো লোকটা। তারপর যন্ত্রটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। পুরুষ লোকটার গায়ের উপর থেকে লেপ খানিকটা সরিয়ে দিয়ে তার বুকের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে বোতাম টিপে দিলো। ঘুমন্ত লোকটা আচমকা চোখ খুলে তাকালো। তারপর খোলা অবস্থাতেই স্থির হয়ে গেল চোখজোড়া।

নির্বিকারভাবে যন্ত্রটা বাক্সে পুরলো লোকটা। সন্তর্পণে মৃত ব্যক্তির শরীরের উপর থেকে সবটা লেপ সরিয়ে দিলো। তারপর পাঁজাকোলা করে ভারি মৃতদেহটা অনায়াসে তুলে নিলো বিছানা থেকে। খাটটা খচ্ মচ্ আওয়াজ করে উঠলো। স্ত্রীলোকটি পাশ ফিরে লেপটা আরও টেনে নিয়ে শুলো। আততায়ী একটু চমকে উঠেছিল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গেটের কাছে এসে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর লাশটা পিছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে স্টার্ট দিলো গাড়ি।

সেগুন বাগানের লম্বা রাস্তাটা দিয়ে কালো গাড়িটা দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। কেউ জানলো না এর মধ্যে কী কাণ্ড হয়ে গেল। ভোর পাঁচটা অবধি তেমনি হুইস্‌ল্ বেজে চললো। পোকাগুলো লাইটপোস্টের চারধারে অনবরত ঘুরতেই থাকলো।

দুই

প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের ছোট্ট একতলা বাড়ির ড্রইংরুম। দামী পুরু কার্পেট বিছানো মেঝেতে। সোফা সেটটি অত্যন্ত রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের বড় অয়েল পেইন্টিংটা। এক

নজরে বোঝা যায় বাড়ির কর্তাটি অগাধ সম্পত্তির মালিক।

সকালবেলা স্নান সেরে একটা দামী কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়িয়ে ড্রইংরুমে এসে বসেছে শহীদ। খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে আর বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। আজ ভোরে কামালের আসবার কথা। দু'বন্ধু শিকারে যাবে সাত-গম্বুজের কাছে মাছরাঙা বিলে। আজকাল নাকি বেশ পাখি পড়ছে ঐ বিলে।

শহীদ ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পেয়ে পাস করেছে গেল বছর। কামাল এবার ইকনমিক্সে পাস করলো।

শহীদ কামাল দু'জনেই অল্পবয়সে বাবাকে হারায়। ওদের বাবা দু'জন ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনেই ছিলেন অসীম সাহসী। তাঁরা আফ্রিকায় গিয়েছিলেন লিম্পোপো নদীর কুমীর শিকার করতে। সেখানেই দু'জনের মৃত্যু হয়। বিস্তারিত ভাবে কিছুই জানা যায়নি, কেবল মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছেছে ঢাকায়। সেদিন বাড়িতে যে কী কান্নার রোল উঠেছিল এখনও অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে শহীদের। আজ পাঁচ বছর হয় মা-ও মারা গেছেন তার।

গফুর এসে দাঁড়ালো। ভারী পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদামণি চা এনে দেবো?'

'না। কামাল আসুক। আমরা একসাথেই নাস্তা করবো। প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিস।'

কিছু না বলে চলে গেল গফুর। ভাবটা যেন, 'সে কথা তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে? আমার আক্কেল নেই?' মাসের প্রথম এক থোক টাকা গফুরের হাতে দিয়ে শহীদ নিশ্চিন্ত থাকে। আপাততঃ এই গার্জেনের উপর নিজের ভার ছেড়ে দিয়েছে সে। মা মারা যাওয়ার এক বছর আগে গফুর এসে ঢুকেছে এই বাড়িতে। এরই মধ্যে সে সমস্ত সংসারের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। সংসার অবশ্য খুবই ছোটো, শহীদ আর তার ছোটো বোন লীনা। স্কুল ফাঁকি দিতে চাইলে বকাঝকা দিয়ে স্কুলে পাঠানো, কাঁচা কুল খেলে তম্বি করা; এসব কাজ শহীদ পারে না, গফুরকেই করতে হয়। যেমন প্রকাণ্ড তার শরীরের কাঠামো, তেমনি সরল এবং বিশ্বস্ত লোক এই গফুর।

অপরাধ বিজ্ঞানে শহীদের অসীম আগ্রহ। মাথা খুব পরিষ্কার এবং অ্যাডভেঞ্চারের পাগল সে। তাই স্বভাবতই সে গোয়েন্দাগিরির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এরই মধ্যে কয়েকটা কেসে সে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। ওর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর পর্যন্ত। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ওকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে।

ইদানীং কামালও গোয়েন্দাগিরির দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে। আগে সে শহীদকে বকতো—'তোর মাথায় কি ঢুকেছে রে? এসব ছাড়। গোয়েন্দাগিরি ভদ্রলোকের কাজ?' কিন্তু এখন প্রায়ই সে শহীদকে এটা ওটা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। নেশাটা ওকেও

ধরেছে। ও এখন লুকিয়ে লুকিয়ে ক্রিমিনলজির বই পড়ে। কামাল কিছু দুর্বল প্রকৃতি লোক। শহীদের মতো অমন পেটা শরীরও তার নেই, অমন অসুরের মতো শক্তি নেই। মাঝারি গোছের সুন্দর চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। টানাটানা দুই চোখ।

ঠিক সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে কামাল এসে ঢুকলো। হাতে একটা দোন বন্দুক। ওকে দেখেই শহীদ ফোঁস করে উঠলো, 'কিরে, এই তোর পাঁচটা?'

কামাল কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলোএমন সময় গফুর নাস্তা নিয়ে ঘ ঢুকলো। টোস্ট, ডিম-পোচ এবং মোটা মোটা গোটা কয়েক অমৃতসাগর কলা।

শহীদ একটা কলার প্রায় অর্ধেকটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে, এমন সময় ক্রিং ক্রি করে ফোন বেজে উঠলো। ফোনের দিকে আঙুল দিয়ে কামালকে ইশারা করতে কামাল ওর দুরবস্থা দেখে একটু হেসে ফোনের দিকে গেল।

'হ্যালো!···ইয়েস!···শহীদকে চাই? ধরুন ডেকে দিচ্ছি।'

শহীদ মুখের কলা শেষ করে ফোন ধরলো।

'হ্যালো! কে?···হারুন? ···কি বললে? পুলিসে খবর দিয়েছো? ···দাওনি? ···আমি বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি, এর মধ্যে পুলিসে ফোন করো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলো শহীদ। মুখটা চিন্তিত। কামালকে বললো, 'তুই বোস আমি কাপড় পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। আজ আর শিকারে যাওয়া হবে না। হারুনের চাচাকে পাওয়া যাচ্ছে না, টাকা পয়সাও চুরি গেছে কাল রাতে। আমরা সেখানেই যাবো।'

কিছুক্ষণ পর শহীদ বেরিয়ে এলো ট্রপিক্যালের একটা দামী স্যুট পরে। চা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, দুই ঢোকে শেষ করলো চা-টুকু। ইতিমধ্যে প্লেটের যাবতীয় সবকিছু কামাল আত্মসাৎ করে ফেলেছে।

শহীদের ছোট্ট মরিস মাইনর মযহারুল হক সাহেবের বাসার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঢাকার বিখ্যাত ধনী মযহারুল হক। একটা জুয়েলারীর দোকান আছে ইসলামপুরে, এছাড়া তিনটে বড় বড় হোটেলের মালিক। যুদ্ধের সময় কন্ট্রাক্টরী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিলেন। ছেলেপুলে হয়নি। মৃত বড় ভাইয়ের একমাত্র পুত্র হারুনকে তিনি পিতৃস্নেহে মানুষ করেছেন। শহীদের সাথেই পদার্থবিজ্ঞানে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়ে পাস করেছে হারুন। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে সে এখন পি. এইচ. ডি.-র জন্যে রিসার্চ করছে।

গাড়ি থামতেই হারুন ছুটে এলো। তার সদা হাসিখুশি মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। শহীদ কোনও রকম সম্ভাষণ না করেই বললো, 'যে ঘরে চুরি হয়েছে, সে ঘরে আমাদের নিয়ে চলো। পুলিস এখনও আসেনি নিশ্চয়ই? তার আগেই আমি একবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বাগানের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হারুন বললো, 'আমি একেবারে ভড়কে গেছি শহীদ। আইন-কানুন তো আমি কিছু বুঝি না, আমার ভয় হচ্ছে পুলিস আমাকে না সন্দেহ করে। আমিই তো কাকার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাই তোমাকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার উপরই আমি নির্ভর করছি পুরোপুরি। তুমি পারবে না ভাই আমাকে বাঁচাতে?'

কেমন যেন জড়ানো জড়ানো গলায় সে কথাগুলো বললো। শেষটায় সে শহীদের দুই হাত ধরে ফেললো। বিস্মিত হয়ে শহীদ লক্ষ্য করলো কি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে হারুন। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললো, 'তুমি এতো অস্থির হয়ো না, হারুন। চোর ধরা পড়বেই। তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

হারুন তাদের নিয়ে গেল একটা ঘরে। ঘরটার আসবাবপত্র খুবই কম, বেশ ছিমছাম। গরাদ বাঁকানো জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো শহীদ। ভালো করে লক্ষ্য করলো চৌকাঠের উপর কয়েক ফোঁটা গলা লোহা। কি করে এই লোহা গলানো সম্ভব তা কিছুতেই তার মাথায় এলো না। আয়রণ সেফটার কাছে এসে দাঁড়ালো, সেখানেও পরীক্ষা করলো কি ভাবে ষ্টীল গলে গিয়েছে। তার কপালে ভাঁজ পড়লো কয়েকটা। হারুনকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কাকার সাথে এ ঘরে আর কে কে থাকেন?'

'চাচী আম্মা থাকেন।'

'ওঁকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

হারুন বাড়ির ভিতর চলে গেল। একটু পরেই তার সাথে এলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। শহীদ, কামাল দুজনেই তাঁকে আদাব দিলো। তিনিও আদাব জানিয়ে বললেন, 'বসো বাবারা।' বলে নিজেই খাটের উপর বসে পড়লেন।

শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা চাচী আম্মা, কাল আপনি কোনও কিছুর শব্দ শুনতে পাননি রাতের বেলা?'

'না বাবা। আমি হাঁপানিতে কষ্ট পাই, রাতে ঘুম হয় না। তাই আজ মাসখানেক ধরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুই। ভোর ছ'টা -সাড়ে ছ'টার আগে আর আমার ঘুম ভাঙে না।'

এতগুলো কথা বলে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। শহীদ বললো, 'আচ্ছা আয়রণ সেফে কি কি ছিলো বলতে পারবেন?'

'উনি কাল দুপুরে পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলেন, সেই টাকা ছিলো, কিছু গহনা ছিলো, আর গিনি ছিলো কয়েকটা।' সুন্দর সাজিয়ে কথাগুলো বলেন ভদ্রমহিলা।

'সবই চুরি হয়ে গেছে?'

'গহনা বেশির ভাগই রয়েছে। একটা হীরে বসানো হার শুধু গেছে গহনা থেকে।

আর টাকা গিনি সবই গেছে।'

'হীরে বসানো হারটার দাম কতো হবে?'

'পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে উনি ওটা তৈরি করেছিলেন হারুনের বউকে দেবার জন্যে। হারুনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে কিনা।'

'কাকা যখন বিছানা থেকে উঠে যান, আপনি টের পাননি?'

'না বাবা।'

'আচ্ছা চাচী আম্মা, আমরা এবার আসি।'

শহীদ কামালের হাত ধরে এগিয়ে গেল। হারুন পিছন পিছন চললো। জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বুঝতে পারলে, শহীদ?'

'কিছুমাত্র না। তুমি কাউকে সন্দেহ করো এ ব্যাপারে?'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ভৌতিক বলে বোধ হচ্ছে আমার কাছে। তাছাড়া আমি রিসার্চ নিয়ে থাকি, কাকার বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কারো সঙ্গে আমার বিশেষ চেনাশোনাও নেই। কাকে সন্দেহ করবো?'

গাড়ির কাছে এসে হারুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো শহীদ।

'গুডবাই। রমনা থানাটা ঘুরে যাই একটু।'

হারুন মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, 'দেখো ভাই, একটা কিছু সুরাহা তোমার করতেই হবে। তোমার যা খরচ পড়ে আমাকে বিল দিয়ো তক্ষুণি শোধ করে দেবো।'

'তুমি জানো আমি শখের গোয়েন্দা। যদি কিছু করি, কারো অনুরোধের অপেক্ষা রাখবো না। তাছাড়া টাকার প্রয়োজনও আমার পড়বে না।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিলো শহীদ। হারুন কি বলতে যাচ্ছিলো, গাড়ি চলতে শুরু করায় থেমে গেল।

অনেক খোঁজ করে টহলদার নাইটগার্ডকে বের করে শহীদ জানতে পারলো যে রাত প্রায় দেড়টা-দুটোর সময় সিটি এস. পি.-র গাড়ি গিয়েছিল সেগুন বাগানে। আধঘন্টা পরেই আবার সে গাড়ি ফিরে যায়। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এস. পি. সাহেবের গাড়ি চিনলে কি করে?'

'হাজুর, চিবারলেট গাড়ি আছিলো, পন্দ্রসও বাইশ নম্বর আছিলো।'

'আর কোনও গাড়ি যায়নি বেশি রাতে ওদিকে?'

'না হাজুর।'

কামাল বললো, 'পথে যাতে বাধা না পায় তার জন্যে শেভ্রোলে গাড়িতে প্রয়োজন মতো নম্বর লাগিয়ে নিতে পারে চোর বা চোরেরা।'

'হ্যাঁ, তা পারে।' গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো শহীদ। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে

সে।

পরদিন কাগজে খবর বেরোলো, 'বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব মযহারুল হক নিখোঁজ।' এরপর সবিস্তারে চুরির কথা লেখা হয়েছে। সব শেষে লিখেছে, "বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে তীক্ষ্ণধী শখের গোয়েন্দা মি. শহীদ খান এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছেন।'

তিন

তিনদিন পর খবরের কাগজের মফঃস্বল সংবাদ বিভাগে ছোট্ট করে একটা খবর বেরোলো। 'গোয়ালন্দ স্টীমার ঘাটের নিকট নদীতে একটি লাশ ভাসিয়া যাইতেছিল। স্থানীয় ধীবররা উহা পাইয়া নিকটস্থ থানায় পৌছাইয়া দিয়াছে। মৃতদেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিলো। তাহার শরীরের সহিত একটি ভারি পাথর বাঁধা ছিলো। মুখে অনেকগুলো ছুরিকাঘাতের চিহ্ন থাকায় মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় নাই। ময়না তদন্তের জন্য লাশ রাজবাড়িতে পাঠানো হইয়াছে।'

খবরটা কারো নজরে পড়লো, কেউবা দেখলোই না। অনেকের মতো শহীদও পড়লো খবরটা।

ঠিক যেদিন খবরটা বেরোলো তার পরদিন আবার বড় বড় হরফে খবরঃ

'গতরাতে লক্ষপতি অক্ষয় ব্যানার্জির বাড়িতে চুরি। সেই সঙ্গে অক্ষয় ব্যানার্জি নিখোঁজ। বহুমূল্য অলঙ্কারাদি এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া চোরের নিরাপদে পলায়ন...' ইত্যাদি।

শহীদ ভাবছিল, এ ব্যাপারটা তাকে না জানাবার কারণ কি? তবে কি পুলিস তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে? পত্রিকা অফিসেও রাতের বেলাই জানানো হয়েছে, অথচ...।

ঠিক সেই সময়ই টেলিফোন বেজে উঠলো।

'হ্যালো! ...লোকমান সাহেব? ...এক্ষুণি আসতে হবে...আচ্ছা, আসছি পনেরো মিনিটের মধ্যে।'

রিসিভার নামিয়ে পিছনে ঘুরতেই শহীদ দেখলো কামাল দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। কামাল বললো, 'যাক, পেয়ে গেলাম তোকে। আমি খবরটা দেখেই এক দৌড়ে চলে এসেছি। ভাবছিলাম তুই হয়তো এতক্ষণে বেরিয়ে পরেছিস।'

'তুই একটু বোস, আমি কাপড়টা পরে আসি। এখনই থানায় যেতে হবে। তুইও চল আমার সঙ্গে।'

শহীদের গাড়িটা রমনা থানার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকমান সাহেব এগিয়ে এলেন। সালাম বিনিময়ের পর শহীদ আর কামালকে নিয়ে অফিস ঘরে বসালেন লোকমান সাহেব। ইনিই রমনা থানার ও. সি.। মানুষটা খুবই আলাপী হাসিখুশি। শহীদের সাথে তাঁর অনেকদিনের পরিচয়। গত কয়েকটা কেসে এই লোকমান সাহেব অনেক সাহায্য করেছেন শহীদকে।

নিজের চেয়ারটায় বসে লোকমান সাহেব বললেন, 'মি. শহীদ, প্রথমেই কাজের কথা বলি। পর পর দুটো ঘটনা ঘটে গেল সেগুন বাগান আর পুরোনো পল্টনে। কাজে কাজেই পুলিস বিভাগ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই দেখুন আই. জি. সাহেবের চিঠি। আপনার উপর তাঁর অত্যন্ত আস্থা আছে, তাই তিনি প্রাইভেট্লি এই ব্যাপারে আপনাকে এন্‌গেজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার যা কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তা আমাদের করতে হুকুম দিয়েছেন।'

শহীদ আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে বললো, 'আপনাদের সাহায্য পাওয়া আমার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এজন্য ধন্যবাদ।'

'এখন আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'আপাততঃ অক্ষয় ব্যানার্জির বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

'এক্ষুণি স্লিপ দিয়ে দিচ্ছি।' খশ খশ করে লিখতে লাগলেন লোকমান সাহেব। চিঠিটা নিয়ে শহীদ উঠতেই লোকমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কী উঠছেন যে? চা আনতে বলেছি তো! একটু বসুন, চা খেয়ে যাবেন। এ···সিপাই, জলদি চায়ে লাগাও।'

'মাফ করুন, মি. লোকমান। আজ নয়, অন্যদিন এসে খেয়ে যাবো—উঠে পড়ে শহীদ।'

শহীদের মরীস মাইনর যখন রাস্তায় চলে, তখন বাইরে না চাইলে বোঝাই যায় না চলছে কি দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো পল্টনে অক্ষয় বাবুর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। দুজন সেন্ট্রি গেটের সামনে দাঁড়ানো। স্লিপটা আর তার উপরকার সিলটা দেখে সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দিলো তারা।

দোতলার উপর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো একজন সেন্ট্রি। সুন্দর করে সাজানো গোছানো ঘরটা। অক্ষয় বাবুর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আজ বিশ বছর হয় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আর বিয়ে করেননি। ছেলেপুলে নেই, টাকা পয়সা আছে প্রচুর। একটা হাসপাতাল খুলেছেন তিনি বছর তিনেক হলো—সেখানে বিনামূল্যে প্রায়

পাঁচশো রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া অনেক স্কুল কলেজে তিনি প্রতি বছর মোটা টাকা দান করেন।

অক্ষয় বাবুর ঘরটার সাথেই পশ্চিম দিকে একটা ঝোলানো বারান্দা আছে। সেখানে একটা ইজিচেয়ার রাখা। বিকেলের পড়ন্ত রোদে গা-টা একটু গরম করবার জন্য অক্ষয় বাবু এখানে এসে বসতেন। ঘরের মধ্যে খোলা হাঁ করা রয়েছে একটা দেয়াল সিন্দুক। বিছানার কাছে একটা ছোটো টেবিলে কিছু বই-পত্র আর কয়েকটা মলমের কৌটো। বারান্দার দিকের একটা জানালার গরাদ বাঁকিয়ে উপর দিকে তোলা।

শহীদ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, মযহারুল হক সাহেবের বাড়িতে যেভাবে লোহা গলানো হয়েছিল, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে এখানকার লোহাও গলানো হয়েছে।

পুলিস রাতে চাকরের ফোন পেয়ে এসে এ ঘরের দরজা ভেঙেছে। একজন চাকরের কাজ রাত তিনটের সময় অক্ষয় বাবুর জন্যে এক কাপ কফি করে তাঁকে ডেকে তোলা—তিনি তখন থেকে বাকি রাতটুকু পড়াশোনা করতেন। কিন্তু কাল অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁকে ঘুম থেকে ওঠাতে না পেরে চাকর আর সবাইকে ডেকে তোলে। তারা অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করে পুলিসে ফোন করে। পুলিস এসে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে।

শহীদ এতসব বৃত্তান্ত একটা চাকরের কাছ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তাহলে অক্ষয় বাবু কোন্ পথে নিখোঁজ হলেন? একমাত্র পথ হচ্ছে বারান্দা। কেউ তাঁকে পিঠে বেঁধে নিয়ে রশি বেয়ে নিচে নেমে গেছে কিংবা তাঁকে রশিতে ঝুলিয়ে আগে মাটিতে নামিয়ে তারপর নিজে নেমে গেছে। তবে কি তাঁকে অজ্ঞান করে নিয়েছিল আগেই, নাকি খুন করা হয়েছিল?

আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখলো শহীদ। কেউ নতুন কিছু বলতে পারলো না। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শহীদ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। পিছনে কামাল। কোনো কথা নেই কারো মুখে। আকাশ পাতাল কতো কি ভাবছে তারা। কোনও চিহ্নই পিছনে ফেলে যায়নি চোর।

চার

চার-পাঁচ দিন পার হয়ে গেছে। শহীদের শোবার ঘরে পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শহীদ আর কামাল রেডিয়ো শুনছে। কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছে—তারই রীলে শুনছে দুজন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনবার অত্যন্ত আগ্রহ উভয়েরই। মনের এই দিকটায় দুজনের অদ্ভুত মিল। রবিশঙ্করের সেতার হচ্ছে। ললিত

রাগে আলাপ চলছে। অপূর্ব সুন্দর বাজাচ্ছে। ঠিক মনের কথাটা সুর হয়ে বেরিয়ে আসছে যেন। শহীদ মনে মনে আওড়ায় 'তড়পত হুঁ য্যয়সে জল বিন্ মীন'। তন্ময় হয়ে গিয়েছে দুজন।

রাত সাড়ে–বারোটার দিকে বাজনা প্রায় শেষ হয়ে এলো। অতি দ্রুত লয়ে ঝালা চলছে, ঝালার মধ্যে ছোটো ছোটো গমক তান। তবলা প্রাণপণে বাজাচ্ছে, এ–ও যে সে নয়, চতুরলাল তবল্চি।

ঠিক এমনি সময়ে ক্রিং ক্রিং করে ড্রইংরুমে ফোন বেজে উঠলো। সমস্ত মুখটা বিরক্তিতে বিকৃত করে শহীদ উঠে গেল। ফোন বেজেই চলেছে। রাগ লাগে শহীদের।

শহীদ যখন ফিরে এলো তখন একটা লম্বা তেহাই দিয়ে শেষ হলো বাজনা। রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের ফোন রে?'

'লোকমান সাহেব ফোন করেছিলেন। আবার আরেকখানে চুরি। মানুষও একজন গায়েব। ব্যাটারা পেলো কি বল্ দেখি? আমাকে যেতে বলছিলেন লোকমান সাহেব—আমি বলে দিলাম যাবো না।'

'যাবি না কেন?'

'কোনও লাভ নেই। কোনও সূত্র পাওয়া যাবে না সেখানে গিয়ে। শুধু শুধু হয়রানি এই শীতের রাতে।'

'কার বাড়িতে হামলা হলো এবার?'

'রোকনপুরের ডক্টর ইখতিয়ার আহমেদের বাড়িতে। ভদ্রলোক এম. আর. সি. পি.। ঠিক একই ভাবে শিক বাঁকিয়ে চোর ঢুকেছিল। নিখোঁজ হয়েছে ডাক্তারের বারো বছরের ছেলে।

'কিন্তু কি আশ্চর্য! বার বার চোর অবলীলাক্রমে নিজের কাজ সারছে, কোনও কিছুই করা যাচ্ছে না। এর কি কোনও প্রতিকার নেই?'

'কি জানি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'আমার কিন্তু একটা ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তোকে এতোদিন বলিনি। একটা ক্ষীণ আশার রেখা হয়তো পাবি। এই দেখ দুইটা দিনের খবরের কাটিং। প্রথম নিখোঁজের ঠিক তিন দিন পর এটা বেরিয়েছিল। আর দ্বিতীয় নিখোঁজের তিনদিন পর এই–টা। একই ভাবে দু'দুটো মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ায় গোয়ালন্দে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবার তিনদিন পর যদি আরেকটা মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে আমরা গোয়ালন্দ রওনা হতে পারি, কি বলিস?'

কামালের গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে শহীদ হেসে ফেললো। বললো, 'আমরা রওনা হতে পারি মানে? আমি গোয়েন্দা মানুষ, আমি যেতে পারি, কিন্তু তুই

যাবি কোন দুঃখে?'

'ব্যঙ্গ করছিস, না সর্প করছিস বুঝতে পারছি না। কি ভেবেছিস? তোর পিছন পিছন খামোকাই ঘুরছি নাকি? আমি যাবো না মানে? একশো বার যাবো, যাবোই তো।'

'না, তুই আবার এসব গোয়েন্দাগিরি তেমন পছন্দ করিস না কিনা, তাই বলছিলাম। যাকগে, যে খবরটার কথা তুই বলছিস, সেটা আমারও নজরে পড়েছে। আমি হক সাহেব আর অক্ষয় ব্যানার্জীর শরীরে কি কি চিহ্ন ছিলো, প্রথমে তাই জেনেছি। তারপর রাজবাড়ি হাসপাতালে ট্রাঙ্ককল করেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জানতে পেলাম প্রথম জনের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হয়েছিল, আর দ্বিতীয় জনের ডান পায়ের হাঁটুর কাছ থেকে খানিকটা মাংস কাটা ছিলো। হারুনের কাছ থেকে জানতে পারি তার কাকার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের উপর মস্ত এক আঁচিল ছিলো। আর অক্ষয় বাবুর চাকরের কাছ থেকে জানতে পারি, প্রায় দেড় বছর যাবত তিনি হাঁটুর কাছে একটা দাদ হওয়ায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। অনেক পয়সা খরচ করেও সেটা সারানো যাচ্ছিলো না। এখন বুঝতেই পারছিস, আমাদের সন্দেহ শতকরা নব্বই ভাগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে।'

'তাহলে চল্ না, আমরা গোয়ালন্দ রওনা হয়ে যাই।'

'দেখা যাক। আয় আপাততঃ শুয়ে পড়ি, রাত অনেক হয়েছে।'

দুজনেই বিছানায় ঢুকে পড়েছে, এমন সময় কামালের চোখে পড়লো মাথার দিককার জান'লার গরাদ ধরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সার্সির ওপারে লোকটার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। চমকে লাফিয়ে উঠে বসলো কামাল। চিৎকার করে উঠলো, 'কে ওখানে?'

স্যাঁৎ করে সরে গেল মুখটা। বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো শহীদ। জানালাটা খুলতেই দড়াম করে একটা পাথর এসে লাগলো শহীদের কপালে। উঃ করে একটা আর্তনাদ--শহীদ ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। কামাল ছুটে এসে ধরলো শহীদকে । বাইরে একটা মোটর স্টার্ট নেয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কামাল চেয়ে দেখলো একটা গাড়ির পিছনের লালবাতি দুটো দ্রুত বেগে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে

পাঁচ

সকাল বেলা কামাল ঘুম থেকে উঠে দেখলো শহীদ আলোয়ান জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে

বসে আছে চেয়ারে। চোখ বন্ধ। গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে কামাল বললো, 'উঠলাম।'

একটু চমকে উঠলো শহীদ। তারপর একটা খাম ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো। বিছানার কাছে মাটিতে পড়লো খামটা। কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেললো কামাল। ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। তাতে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখাঃ

শহীদ খান,

তুমি আমার পেছনে লাগতে এসো না। আমি জানি, যদি কেউ কখনও আমার কাজে বাধা দিতে পারে, সে হচ্ছো তুমি। পুলিস বা তাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর সাধ্য নেই আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না। যে টাকা আমি চুরি করেছি সে সমস্তই মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হচ্ছে। আর যে সব মানুষ আমি চুরি করেছি, তাদের লাগিয়েছি আমার গবেষণার কাজে। আর ক'দিন পর যখন পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে যাবে আমার আবিষ্কার দেখে, যখন পৃথিবীর মানুষ প্রভূত উপকার পাবে সেই আবিষ্কার থেকে, তখন বুঝবে সামান্য কিছু টাকা আর কয়েকজন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমি কতো বড় দান দিয়ে গেলাম পৃথিবীটাকে। ইতি—

কুয়াশা।

কামাল চিঠিটা শেষ করে দেখলো শহীদ আবার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। সে বললো, 'চিঠিটা পেলি কোথায়?'

'আমাদের মশারীর উপর।'

'কি ঠিক করলি?'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শহীদ বললো, 'একটা কথা জানিস, এই ধরনের লোকদের ওপর আমার বড় একটা দুর্বলতা আছে। আমি জানি, এমন কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে মানুষ খুন করতে হয়। অথচ সেটা বেআইনী। সামান্য একটু বেআইনী কাজ করলে হয়তো পৃথিবীর মস্ত বড় উপকার হয়, তবু তা করা যাবে না। যারা বিজ্ঞান-পাগল, তারা কোনও আইন মানে না। প্রয়োজন মতো মানুষ খুন করা এদের কাছে অতি সাধারণ কাজ।

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, শহীদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'তাই বলে মনে করিস না আমি এই মানুষ খুন আর টাকা চুরির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো। আমি এই পাগল বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে আমার সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

একটানা এতগুলো কথা বলে শহীদ চুপ করলো। কামাল বললো, 'আমিও তাই

বুঝি। যে করে হোক এই লোককে ধরিয়ে দিতেই হবে পুলিশের হাতে।'

নারায়ণগঞ্জ–গোয়ালন্দ স্টীমার চাঁদপুর ঘুরে যায়। বড্ডো বেশি সময় লাগে তাতে। বেলা দুটোর সময় স্টীমারে উঠলে গোয়ালন্দ পৌঁছায় ভোর পাঁচটায়। সারাদিন হৈচৈ। টং টং করে নোঙর ফেলবার সময় শিকলের শব্দ। নানা রকম ফেরিওয়ালার ডাক। কলা, সন্দেশ, দৈ, রসগোল্লা, চানাচুর। অনেক রাতে স্টীমার একটু চুপ হয়। কেবল এঞ্জিনের একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে কারো কোলের বাচ্চা কেঁদে ওঠে।

শহীদ আর কামাল সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিনে শুয়ে। বিকেলে স্টীমারের সামনের ডেকে চেয়ার পেতে বসেছিল ওরা। তাতে কামালের সর্দি করেছে। সে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, আর শহীদ কি একটা মোটা ইংরেজি বই পড়ছে কম্বলটা দিয়ে পিঠ পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে। এমন সময় কেবিনের দরজায় টোকা পড়লো। শহীদ দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে গফুর?'

'তোমরা কিছু খাবে, দাদামণি?'

'এতো রাতে আবার কি খাওয়াতে চাস?' অবাক হয় শহীদ।

'কফি বানিয়ে দেব?'

'কফি বানাবি মানে? কোথায় বানাবি? কি করে বানাবি?'

গফুর গম্ভীর ভাবে বলে, 'সব কিছুই আমি সাথে করে এনেছি।'

'সাবাস গফুর, এতো গোলমালের মধ্যেও তোর ছোটোখাট কথা মনে থাকে?'

প্রশংসায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে গফুর বললো, 'তোমার একলার জন্যে বানাবো, না কামাল ভাইও খাবে?'

'ওকে আর জাগাস্ না। বেচারার সর্দি লেগে গেছে। এখন একটু ঘুমোচ্ছে ঘুমিয়ে নিক।'

এই কথা বলতেই পাশ ফিরে গফুরের দিকে চেয়ে একটা মনোরম হাসি দিয়ে কামাল আবার ঘুরে শুলো।

আর কোনো কথা না বলে গফুর নিজের কাজে লেগে গেল।

বছর কয়েক ধরে দাদামণির মাথায় যে কি ভূত চেপেছে, তাই নিয়ে গফুরের খুবই চিন্তা হয়। গম্ভীর ভাবে সে গত দু'বছর ধরে দাদামণির কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছে। তাতে চিন্তা তার বাড়ছে বই কমছে না। কিছুদিন যাবত সে শহীদকে চোখে চোখে রাখছে। গোয়ালন্দ যাবার কথা কিছুই শহীদ বলেনি গফুরকে। যেদিন রওনা হবে সেদিন গফুরকে একটু ব্যস্ত দেখা গেল। গোটা নয়েকের দিকে গম্ভীরভাবে শহীদকে বললো, 'ছোটো আপাকে কামাল ভাইদের বাড়ি রেখে এলাম।'

আশ্চর্য হয়ে শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন রে?'

'ছোটো আপা তো একা বাড়িতে থাকতে পারবেন না!'

আরও আশ্চর্য হয়ে যায় শহীদ। 'কেন, তাকে একলা থাকতে হবে কেন?'

গম্ভীরভাবে গফুর ঘোষণা করলো, 'আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি।' এই কথা বলে আর কোনও কথা উঠতে না দিয়ে সে সরে গেল সামনে থেকে। শহীদ হাঁ করে খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো।

দুজনকে দুকাপ কফি দিয়ে গফুর চলে গেল। কামাল উঠে দরজা বন্ধ করে এলো। এমন সময় ঠক্ করে দরজায় একটা শব্দ হলো। দরজা আবার খুলতে যাচ্ছিলো কামাল। শহীদ লাফিয়ে উঠে ওকে ধরলো। তারপর বেশ জোরে ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

কোনও জবাব নেই। আবার টোকার শব্দ হলো। আরও জোরে শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'—এবারও কোনও জবাব নেই। কামাল একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তাকে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে শহীদ প্রথমে নিঃশব্দে বল্টুটা খুললো, তারপর একটা কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আরেকটা খুলে ফেললো। সাথে সাথেই ঘরের ভিতর কাঠের দেয়ালে খট্ করে আওয়াজ হলো। ছোট্ট একটা তীর বিঁধে আছে দেয়ালে। দরজাতেও দুটো একই রকমের তীর বিঁধে আছে। বাইরে চাইলো শহীদ। কেউ কোথাও নেই, কেবল সামনে কিছু দূরে স্টীমার–ক্যান্টিনে একটা বেঞ্চির উপর একজন লোক আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

তীর দুটো খুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো শহীদ। ঘরের দেয়ালে যে তীরটা বিঁধে ছিলো সেটাও খুলে আনলো।

ছ'ইঞ্চি লম্বা। পিছনে অনেকগুলো নরম পালক। পালকের কাছটাতে একটা ছোট্ট চিঠি। শহীদের ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়লো কামাল চিঠিটার উপর। তাতে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখাঃ

শহীদ খান,

তোমাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার কাজে বাধা দিয়ো না। তবু তুমি আমার পিছনে লেগেই রয়েছো। আমার শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করবার জন্যে এটুকু করলাম। এ তীর চিঠি বয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বুকে একটু বিঁধেছে, যদি পটাশিয়াম সায়ানাইড বয়ে নিয়ে এটুকু বিঁধতো তবে কেমন হতো? আমার পক্ষে তা অসম্ভব নয়। অতএব, বন্ধু, ঘরে ফিরে যাও। নইলে পরে এমন বহু সুযোগই আমি পাবো যখন তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবো না। তোমার মতো

বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এর বেশি বলা বাহুল্য মনে করছি। ইতি—

কুয়াশা।

শহীদ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো চিঠিটা পড়ে।

কামাল বললো, 'কী সাংঘাতিক লোক দেখেছিস!'

'দেখলাম। বন্ধু একটু ভুল করেছে। মনে করেছে তীর সোজা এসে আমার বুকে বিঁধেছে।'

'বিঁধতোই তো! আমি তো মনে করেছিলাম দরজায় টোকা পড়ছে, গফুর এসেছে বুঝি। তুই বুঝলি কি করে, এ টোকায় সন্দেহ করবার কিছু আছে?'

'টোকার আওয়াজ শুনলেই চেনা যায়। একটা টোকার ফলে দরজায় কখনও ঘর্র্ শব্দ হয় না।'

'তুই বাইরে কাউকে দেখলি না?'

'একজন লোক বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিলো কম্বল মুড়ি দিয়ে।'

'ও-ই বোধকরি তীর মেরেছে।'

'বোধকরি কেন, আমার স্থির বিশ্বাস ও-ই মেরেছে।'

'তাহলে তাড়া করে ধরলি না কেন? চল্ ব্যাটাকে ধরে পুলিশে দিই।'

'এখন কোনো লাভ নেই গিয়ে। দরজা খুলে দেখ কেউ নেই ওখানে।'

কামাল দরজা খুলেই দেখলো সত্যিই কেউ নেই। শহীদ বললো, 'আমি দরজা খুলেই ওর কাছে ছুটে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে আহত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হতো না। ওদের আরও লোক নিশ্চয়ই ছিলো কাছাকাছি নল হাতে করে। আমরা এগোলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ রকম ছোটো তীর এসে লাগতো।'

'নল হাতে থাকবে কেন?'

'এই তীরগুলো ধনুক থেকে ছোঁড়া হয়নি। বর্মায় পাখি শিকারের জন্যে এই রকম তীর ব্যবহার করা হয়।'

টেক্‌নাফ অঞ্চলে মগদের মধ্যেও এর ব্যবহার আছে। সরু একটা নলের মধ্যে এই তীর ভরে অন্যদিকে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে হয়। অনায়াসে তিরিশ চল্লিশ হাত দূরে এই তীর ফেলা যায় ফুঁ দিয়ে। অভ্যেস হয়ে গেলে পঞ্চাশ ষাট গজ পর্যন্ত যায়। তীরের আগায় গ্রামোফোনের পিনের মতো একটা চোখা লোহা থাকে, পিছনে থাকে পালক। তাতে করে খুব ভালো সই হয়।'

'অদ্ভুত পদ্ধতি তো! লোহাটার আগায় সামান্য একটু বিষ মাখিয়ে নিলেই একটা মানুষকে অনায়াসে সাবাড় করে দেয়া যায়। কোনো শব্দ নেই। বন্দুকের চেয়ে মারাত্মক!'

'ওসব চিন্তা এখন রাখ তো। কাল সারাদিন অনেক কাজ আছে, এখন একটু ঘুমিয়ে নে।'

এই বলে দুই ঢোকে কফিটুকু শেষ করে শহীদ খাটের তলায় রেখে দিলো কাপটা। তারপর বিছানায় শুয়ে কম্বল টেনে দিলো গলা পর্যন্ত। কামালও তার বিছানায় ঢুকলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম এলো না।

ছয়

গোয়ালন্দ থানার দারোগা কামালের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শহীদ আর গফুরকে নিয়ে অসঙ্কোচে তার বাড়িতে গিয়ে উঠলো কামাল। তমিজউদ্দিন মোল্লা অত্যন্ত অমায়িক লোক। খুব খাতির করলেন ওদের। দারোগা হিসেবে এখানে খুব হাঁক ডাক আছে। মাছ, দুধ, ঘি, ফল ইত্যাদি বিনা পয়সায় প্রচুর পরিমাণে তাঁর বাড়িতে আসে; টাকা পয়সা তিনি মোটেই নেন না, সেটা হারাম। স্টীমার ঘাট থেকে বাড়িটা সিকি মাইল মতো হবে।

বেলা বারোটার দিকে স্টীমার ঘাটে একটা গোলমাল শোনা গেল। তমিজ সাহেবের মুখটা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। কামাল ও শহীদ আশ্চর্য হয়ে গেল তাঁর এই পরিবর্তন দেখে। কামাল প্রশ্ন করলো, 'গোলমাল কিসের?'

তমিজ সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কি জানি? আবার হয়তো লাশ পাওয়া গেছে নদীতে। কিছুদিন যাবত কয়েকদিন পর পর লাশ পাওয়া যাচ্ছে নদীতে। এমন আর এই এলাকায় হয়নি। বড্ডো ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। এখন লাশ আবার পাঠাতে হবে রাজবাড়ি পোস্ট মর্টেমের জন্যে। সাথে আবার তার পুলিশ দাও। এই এলাকায় একেবারে প্যানিক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমার অবস্থা কাহিল। ওপরআলা চাপ দিচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করো। আরে বাবা, ইনভেস্টিগেশন কি পানির তলায় করবো? নদীর কোন জায়গায় ইনভেস্টিগেশন করা যায় বলেন তো, শহীদ সাহেব!'

এমন সময় কয়েকজন লোক একটা লাশ এনে দারোগা সাহেবের উঠানে ফেললো। লাশ দেখেই কামাল শহীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। শহীদ নির্বিকার ভাবে এগিয়ে গেল মড়ার কাছে।

একটা বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। মুখটা এমনভাবে কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটাকুটি করা যে সনাক্ত করা অসম্ভব।

তমিজ সাহেবের দিকে ফিরে শহীদ বললো, 'মি. তমিজউদ্দিন, আপনি পোস্ট মর্টেমের কোনো রিপোর্ট পেয়েছেন? আগের লোকগুলো কিভাবে খুন হয়েছে বলে

ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছে?'

'দুটো লোকই এক আশ্চর্য উপায়ে খুন হয়েছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, লাশ দুটোর হার্ট গলিয়ে ফেলা হয়েছে। শরীরের উপরে বুকের কাছে কোনও কাটাকুটির চিহ্ন নেই। শরীরের ভেতর থেকে আর কিছুই পাওয়া যায়নি। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? শরীরের ওপর কোনো ক্ষত নেই অথচ হার্টটা বেমালুম গলে গেল।'

'রিপোর্টটা পেলেন কবে?'

'আজই সকালে। আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি রিপোর্ট পড়ে। এগুলো কিন্তু টপ সিক্রেট ব্যাপার। আপনি দয়া করে এগুলো বাইরে প্রকাশ করবেন না। তাহলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হবে।'

'সত্যি কথা বলতে কি তমিজ সাহেব, আমি এই কেসটা নিয়েই ঢাকা থেকে এসেছি। আমার সঙ্গে আই. জি. সাহেবের চিঠি আছে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে রিপোর্টটা দেখতে দেন তো বড় ভালো হয়।'

'আচ্ছা!'—আশ্চর্য হয়ে যান তমিজ সাহেব।—আপনারা তা'হলে এই ব্যাপারেই এসেছেন! ওপরআলাদের নজর ভালো মতোই পড়েছে এই দিকে! এবার আমার চাকরিটা গেল বুঝি।'

'না মি. তমিজ, আমরা অন্য কেসে এসেছি—নানা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমাদের আসামী আর আপনার আসামী একই ব্যক্তি। আপনার ভয়ের কোনো কারণই নেই। ওপর-ওয়ালারা জানেই না যে এই দুই কেসের আসামী একই লোক।'

'তাদের জানবার আগেই কেসটার একটা সমাধান করে ফেলুন না?'

'তার জন্যে আপনার সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন।'

'আপনার সব রকম সাহায্যের জন্যেই আমি প্রস্তুত বলুন, কি সাহায্যের দরকার?'

'আপাততঃ পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটা দেখাতে হবে।'

তমিজ সাহেব একজন সেপাইকে ডেকে অফিস থেকে রিপোর্টের ফাইলটা আনতে হুকুম করলেন। শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'এ লাশ কখন পাঠাবেন রাজবাড়ী?'

'দেড়টার সময় একটা মিক্সড্ ট্রেন আছে। আর ঘন্টাখানেক বাকি।'

'আমি ছদ্মবেশে সাথে যাবো। আমাকে একটা পুলিশের ইউনিফরম দিতে হবে।'

ঘরে ফিরে এসে শহীদ কামালকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'আমি আপাততঃ রাজবাড়ী যাচ্ছি। আমি যেখান থেকেই চিঠি বা টেলিগ্রামে খবর দিই, সটান ছদ্মবেশে সেখানে চলে যাবি। আর আমি যে এখানে নেই তা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। গফুরকে আমার মতো করে সাজিয়ে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবি খুব চিন্তিত মুখে। মাঝে মাঝে নদীতে নৌকো করে যাবি। মাঝিদের জিজ্ঞেস করবি

কোথায় লাশ পাওয়া গিয়েছিল। খেয়াল রাখবি, আমি যে নেই তা যেন কেউ লক্ষ্য না করে। তোর চারপাশে অনেক ছায়া দেখবি—বুঝেও বুঝতে চাইবি না যে তুই ওদের স্পাইং টের পেয়েছিস।'

আধঘন্টা পর কয়েকজন পুলিশ লাশ নিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল।

সাত

কুষ্টিয়া কোর্ট।

লাল স্টেশন ঘরটার গায়ে বড় বড় সাদা হরফে লেখা। সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে এসেছে। ট্রেন এসে থামলো। কয়েকজন যাত্রী নামলো। এদিকটা নিরালা—এরই মধ্যে সব নিঝুম হয়ে এসেছে। ছোটো স্টেশন ঘরটার পাশেই একটা চায়ের স্টল। বাতি জ্বলছে। কয়েকজন লোক বসে আছে বেঞ্চির উপর। কেউ বেঞ্চির উপর পা তুলে চাদর মুড়ি দিয়ে একেবারে জমে বসেছে। দোকানদার ঠক্ ঠক্ করে তাদের সামনে চায়ের গেলাস রাখছে।

ইন্টার ক্লাস থেকে একজন বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক নামলো। একটা চামড়ার বাক্স কুলির মাথায় তুলে দিয়ে এগিয়ে গেল ভদ্রলোক টিকেট চেকারের দিকে।

প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় সৌখিন লোক। দামী আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতা কিছুটা গোটানো। বোতামগুলো সোনার, চক্‌চক্ করছে। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে ভদ্রলোক। কিন্তু হাতের পেশী দেখে বোঝা যায় কি অসাধারণ শক্তি ছিলো তার যৌবনে। এখনও দু'তিনজন ষণ্ডামার্কা লোক তার সাথে লাগতে গেলে যথেষ্ট চিন্তা করে নেবে। টিকেট দেখিয়ে ভদ্রলোক বাইরে এসে একটা রিক্সায় চাপলো। বললো, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল।'

'বাবু, তিনটে আছে হিন্দু হোটেল। কোনটায় যাবো?'

'গড়াই নদীর পাড়েরটায়।'

রিক্সাওয়ালা বুঝলো এ লোক নতুন নয়। সে সোজা রিক্সা টেনে চললো। সেখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। দোতলা হোটেল। একটা সাইনবোর্ড টাঙানো, তাতে লেখা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল ও রেস্টুরেন্ট'।

হোটেলের ম্যানেজার সাগ্রহে এগিয়ে এলো। দোতলায় নদীর ধারের বেশ বড় একটা ঘর ঠিক হলো। সাথে বাথরুমও আছে অ্যাটাচ্‌ড্। একটা ডবল বেড খাট ঘরটার প্রায় আধখান জুড়ে। আসবাবের মধ্যে একটা টেবিল, তার চারধারে চারটে চেয়ার পাতা। ঘরের কোণে একটা মাঝারি আকারের ড্রেসিং টেবিল। পুবদিকে একটা ছোটো ব্যালকনি। সেখানে দুটো ইজিচেয়ার পাতা নদীর দিকে মুখ করে। বেশ পছন্দ হয়েছে

এ ঘরটা বোঝা গেল ভদ্রলোকের মুখ দেখে। ম্যানেজার একটা খাতা খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'মশায়ের নাম কি লিখবো?'

'লিখুন অনাথ চক্রবর্তী।'

'পেশা?'

'জমিদারী।'

'আজ্ঞে কি কারণে আগমন!' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে ম্যানেজার।

'এখানে একটা জায়গা কেনার ইচ্ছে আছে।'

কি যেন লিখলো খাতায় ম্যানেজার। তারপর সই করিয়ে নিয়ে খাতা বন্ধ করে ভালো করে চাইলো অনাথ চক্রবর্তীর দিকে। বললো, 'আজ্ঞে, খাওয়া সম্বন্ধে চিন্তাও করবেন না। আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে এই হোটেলই সব চাইতে ভালো। বড় বড় লোক সবাই এখানেই পদধূলি দান করেন। আপনার কোনও কিছুর প্রয়োজন হলেই আমাকে খবর দেবেন। আমার নাম আজ্ঞে, দিবাকর শর্মা।'

'এ শহরে বছর দশেক আগে একবার এসেছিলাম। এখন দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

'আজ্ঞে হয়েছেই তো! আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগে তো ভয়ানক নির্জন ছিলো এসব জায়গা। লোকালয় ছিলো ঐ মোহিনী মিলের কাছটাতেই। এখন এদিকেও কতো নতুন বাড়ি উঠলো, আরও কতো হচ্ছে। আমি আজ্ঞে প্রায় বিশ বছর হলো এখানে এসেছি। আমার বাড়ি হলো গিয়ে কেশনগর।'

'ও। আচ্ছা আপনি আমার খাবার পাঠিয়ে দিন, আমি স্নান সেরে নিই। কলে জল আছে না?'

'আজ্ঞে আমাদের কলে সব সময়ই জল থাকে। আমরা পাম্প করে সাধারণ ব্যবহারের জল ট্যাঙ্কে তুলে রাখি। কিন্তু আজ্ঞে, নতুন জল, স্নান আজ অবেলায় না করলেই পারতেন।'

'দেখুন আমি খুব ক্লান্ত। স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। আপনি তাড়াতাড়ি আমার খাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার এমন স্নান করা অভ্যেস আছে, কোনও ক্ষতি হবে না।'

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসলো। ভদ্রলোক আর কেউ নয়, আমাদের শহীদ খান।

স্নান সেরে আবার অনাথ চক্রবর্তী সেজে সে বেরিয়ে এলো। টেবিলে তার খাবার সাজানো রয়েছে। তাই খেয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করছে, এমন সময়

দরজায় টোকা পড়লো। বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, 'এঁটো বাসন নিতে এয়েছি কত্তা।'

দরজা খুলে দিতেই একজন খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ছুঁচোমুখো কুঁজো বেঁটে লোক একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। পরিপাটি করে গুছিয়ে বাসন পেয়ালা তুলে সে অনাথ বাবুকে একটা নমস্কার করে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে শহীদ খাটে এসে শুয়ে পড়লো।

নানান কথা মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো। ট্রেনের সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে তার উপর নজর রাখতে হবে। নদীর উপর নজর রাখতে হবে। কুয়াশাকে খুঁজে বের করার সূত্র সে পেয়েছে, তাই ধরে সে এগিয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে তার এখানে। জেদ চেপে গেছে শহীদের, যে করে হোক ধরতেই হবে খুনীকে। যতো বড় ধুরন্ধরই সে হোক না কেন, অন্যায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বেই। শহীদ হাসলো। কুয়াশার অনুচর ভাববে শহীদ আর কামাল এখনও গোয়ালন্দেই আছে।—এই শেষের লাশটারও হার্ট পাওয়া যায়নি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার শহীদ আর কখনো শোনেনি। এক্স–রে দিয়ে ফটো তুলে ভেতরের খবর জানতে পারা আজ সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু উপরের চামড়ায় আঁচড়টুকু না দিয়ে হার্টটা কি করে গলিয়ে ফেলা যায়? অদ্ভুত বুদ্ধিমান এই খুনী। বুদ্ধির পরিচয় এর প্রতিটা কাজেই পাওয়া যাচ্ছে। দলবলও আছে লোকটার।

এসব নানান কথা এলোমেলো ভাবে তার মনে হতে লাগলো। সারারাত ভালো ঘুম হলো না। কানের কাছে মশার গুঞ্জন, মনে নানারকম চিন্তা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো শহীদ।

অনেক বেলা করে পারদিন ঘুম ভাঙলো তার। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। পোস্ট অফিস থেকে গোটাকতক খাম কিনলো। তারপর থানার দিকে হাঁটতে থাকলো।

কুষ্টিয়ার রাস্তাঘাট বেশ ভালো। চিনতে কষ্ট হয় না। সবগুলোই সোজা সোজা। মেইন রোড থেকে অনেকগুলো রাস্তা লম্বাভাবে বেরিয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছে। বাড়িগুলো রাস্তার পাশে সাজানো। মফঃস্বল টাউন। একটা গ্রাম্য পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া যায়। টাউনটা খুবই ছোটো, কিন্তু কিছুরই অভাব নেই। স্টেশন দুটো, একটা 'কুষ্টিয়া' অপরটা 'কুষ্টিয়া কোর্ট,' মাইল খানেকের তফাত। জজ কোর্ট কোর্ট স্টেশনের সাথেই লাগানো। তার উত্তরে পুলিশ ব্যারাক। স্টেশনের পশ্চিমে কুষ্টিয়া কলেজ। তার সাথে লাগা কলেজ ফুটবল গ্রাউণ্ড। হাসপাতালটা হচ্ছে গার্লস স্কুলের পাশেই, তার উত্তরে বয়েজ স্কুল। দুইটা সিনেমা হল রয়েছে এইটুকু শহরে।

থান্যার ঠিক উল্টো দিকেই তার এক বন্ধুর বাড়ি। জানা দরকার সে এখানেই আছে না ঢাকায় গেছে। সে থাকলে বড় উপকার হবে। সোজা গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লো

শহীদ। বেরিয়ে এলো একজন যুবক। দেখতে অত্যন্ত রোগা পটকা, তাই বয়স খুব কম বলে মনে হয়। চোখে চশমা, হাতে একটা বই। জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চান?'

'প্রফেসার আশরাফ চৌধুরী আছেন?'

'আমিই আশরাফ চৌধুরী। আপনার কি দরকার? ভিতরে আসুন না।'

'আমার নাম অনাথ চক্রবর্তী। রায়পুরার জমিদার। ঢাকার ইসলাম খান সাহেবের ছেলে শহীদ খান আমাকে আপনার সাথে আলাপ করতে উপদেশ দিয়েছেন।'

'আপনি বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? তা কেমন আছে শহীদ? প্রায় বছর খানেক হলো ওর সাথে আমার দেখা নেই। মাঝে শুনেছিলাম গোয়েন্দাগিরি করছে, এখনও তাই?'

'হ্যাঁ, এখনও তাই। গোয়েন্দাগিরি করতেই সে এখন কুষ্টিয়ায় এসেছে এবং তোমার সামনের চেয়ারে বসে আছে হাঁদারাম!'

'এ্যাঁ! আপনি? মানে তুমি? আমি চিনতেই পারিনি। ভালো ছদ্মবেশ ধরেছো তো হে, উঠেছো কোথায়?'

'আদর্শ হিন্দু হোটেল।'

'বাদ দাও তোমার হোটেল। চলো এখনই জিনিসপত্র নিয়ে আসি আমার এখানে। কুষ্টিয়ায় এলে অথচ আমার বাসায় উঠলে না, আমি ভীষণ অসন্তুষ্টি হয়েছি।'

'দেখো ভাই বিশেষ কাজে খুনী তাড়া করে এসেছি, তাই হোটেলে উঠতে বাধ্য হয়েছি। নইলে তোমার এখানেই উঠতাম। আপাততঃ আমাকে হিন্দু জমিদার হয়ে থাকতে হবে। তুমি কিছু মনে করো না।'

'বেশ তো, এখন থাকো। কিন্তু কাজ হয়ে গেলে আমার এখানে কদিন বেড়িয়ে না গেলে আমি অত্যন্ত রাগ করবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। আপাততঃ তুমি আমাকে কিছু খবর দাও দেখি। এখানে বিক্রি হবে এমন জমিটমি আছে?'

'খুব আছে। আমরাই তো কিছু জমি বিক্রি করবো। কেন, কিনবে নাকি?'

'না, কিনবার ভান করবো। আমি তো হিন্দু জমিদার। জমি কিনতে এসেছি। তোমাদের জমি থাকায় ভালোই হলো। তুমি মাঝে মাঝে জমির দলিল, নক্সা, পরচা ইত্যাদি নিয়ে আমার ওখানে যেতে পারবে, আমিও পারবো আসতে। তোমার কাছ থেকে অনেক খবর জানবার প্রয়োজন হবে। এখন চলি।'

'তুমি ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি যাবো।'

শহীদ একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে আশরাফ চৌধুরীর হাতে দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি কাল বিকেলের দিকে একবার যেও আমার ওখানে।'

'এখনি উঠছো নাকি? চা–টা খাবে না?'

'না ভাই, আর বসবো না। কতকগুলো কাজ পড়ে রয়েছে।'

হোটেলে ফিরে চিঠি লিখতে বসলো শহীদ। লীনাকে লিখলো যেন কিছুমাত্র চিন্তা না করে। সে, কামাল ভাই, গফুর সবাই খুব ফুর্তিতে রয়েছে। দিন পনেরোর মধ্যে ফিরবে।

কামালকে লিখলো, 'আমি যখনই টেলিগ্রাম করবো তখুনি তুই গফুরকে নিয়ে ছদ্মবেশে চলে আসবি কুষ্টিয়ায়। হিন্দু সেজে আসবি। আমি এখন রায়পুরার জমিদার অনাথ চক্রবর্তী, তুই আমার নায়েব অবিনাশ সেরেস্তাদার। আর গফুর পেয়াদা। ওকে সব বুঝিয়ে দিবি আগে ভালো করে। কুষ্টিয়া, আদর্শ হিন্দু হোটেল, গড়াই নদীর পাড়।...'

সেই বেঁটে চাকরটার হাতে চিঠি দুটো দিয়ে একটা আধুলী গুঁজে দিলো শহীদ। সে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু, লাল বাক্সে ফেলাবো, না নীল বাক্সে?'

'লাল বাক্সে ফেলে দাও। এখুনি যাও। জরুরী চিঠি।'

সে চলে গেল চিঠি নিয়ে। শহীদ ভাবতে লাগলো, আজকের মতো কাজ শেষ। বিকেল বেলা নদীর পাড় ধরে গিয়ে যতদূর সম্ভব দেখে আসতে হবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে অর্ধেক পড়া ইংরেজি উপন্যাসটা নিয়ে ব্যালকনির একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলো শহীদ। উত্তর দিক থেকে ফুর ফুরে একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বেশ ভালো লাগে। মনটা কিছুতেই বইয়ে বসতে চায় না। বই বন্ধ করে সে সামনের দিকে চেয়ে রইলো।

নদীর জল অনেক শুকিয়ে গেছে। পাড় খুব উঁচু—যেন চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই জলেও অনায়াসে স্টীমার চলতে পারে। ছোটো বড় হরেক রকম নৌকো চলছে। কারও পাল তোলা, কেউ বা দাঁড় টানছে। অনেক দূরের পাল তোলা গয়না নৌকো দেখলেই মনটা উদাস হয়ে যায়। দূরের টান—মাঝিদের অলস কথাবার্তা—জলের একটানা শব্দ—হালের বিলম্বিত ক্যাঁচ–কুঁচ শব্দ—খরা—আমেজ—দুপুর—সবটা মিলিয়ে স্বপ্ন মনে হয়।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো শহীদ। সেখান থেকে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো চুপচাপ। আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই। কয়েকটা চিল অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে একটা নিঝুমতা। দূরে কোনও একটা বাড়ির ছাত পেটানো হচ্ছে। সেই একটানা শব্দ দুপুরকে আরও গম্ভীর করে তোলে। হঠাৎ একটা কাক কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে। খান খান হয়ে যায় নিস্তব্ধতা। আবার জমে ওঠে আমেজ। ঝিমিয়ে আসে শহীদ। দুপুর এতো সুন্দর হতে পারে তার ধারণাই ছিলো না। একটা মধুর আমেজ তার বুদ্ধিকে

ছেয়ে ফেলে। এ দুপুরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়।

বিকেল বেলা একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। হরিদাস চা নিয়ে এসে রাখলো। চোখ কচ্‌লে উঠে বসলো শহীদ। ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাবতে তার লজ্জাই লাগছে। দুপুরে ঘুমোনো ওর অভ্যেস নেই। দিবা-নিদ্রাকে রীতিমত ঘৃণাই করে সে। আর আজ নিজেই পাক্কা তিনঘন্টা দিবা-নিদ্রা দিয়ে উঠলো। কিন্তু এ অপরাধের জন্য তার গ্লানি নেই। শরীর মন বড় চাঙা বোধ হচ্ছে।

চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়লো নদীর পাড়ে বেড়াতে। সরু একটা রাস্তা বরাবর নদীর পাশ দিয়ে চলে গেছে। বিকেলে আজকাল কেউ বড় একটা এদিকে আসে না। সবাই যায় পুলিশ গ্রাউণ্ড কিম্বা কলেজ গ্রাউণ্ডে হকি ক্রিকেট খেলা দেখতে। দু'চারজন অতি-বৃদ্ধকে দেখা গেল নদীর নির্মল বায়ু সেবন করছেন। কেউ কেউ কোনও পাথরের ওপর কি গাছের গুঁড়িতে বসে আছেন। পথ ধরে কিছু উত্তরে গিয়ে শহীদ দেখলো একজন যুবক একটা পাথরের উপর বসে ওপারের চড়ার দিকে চেয়ে রয়েছে। কাছে যেতেই তার দিকে ফিরে চাইলো। তারপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো ওপারে। শহীদ দেখলো, অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। চোখের দিকে চাইলে মনে হয় কতো গভীর যেন মানুষটি, যেন সাগর। কতো কি তার অতল তলে আছে লুকোনো। কবি হওয়া এরই সাজে। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। পরনে জিনসের সাদা প্যান্ট আর হালকা গোলাপী রঙের শার্ট। বড়ো মানিয়েছে এই পড়ন্ত বেলায় লোকটাকে এই কাপড়ে। বয়স ঠিক আঁচ করা যায় না—বোধ হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। লম্বা-চওড়া শরীরের গড়ন। চওড়া উঁচু বুক শার্টের উপর দিয়েও স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

শহীদ এগিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকলো, 'অনাথ বাবু।'

চমকে ফিরে তাকালো শহীদ। দেখলো ট্রেনের সেই লোকটা দ্রুতগতিতে তার দিকে আসছে। হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। লোকটা কাছে এসেই বললো, 'দেখুন তো, পেছন থেকেও ঠিক চিনতে পেরেছি কেমন! হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।' লোকটার নামটা কিছুতেই মনে আনতে পারছে না শহীদ। ট্রেনে কি যেন একটা নাম বললো? একটু থেমে শহীদ আবার বললো, 'তা আপনি এদিকে চললেন কোথায়? খুব তাড়া বুঝি?'

'এই তো, এই পথে আর একটু এগোলেই আমার বাসা। চাকরি করি সেই মোহিনী কটন মিলে। সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরতে হলে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয় বৈকি। বাসায় স্ত্রী আছেন কিনা, বুঝলেন না, তাঁর হুকুমেই, মানে সাঁঝের আগেই ফিরতে হয়। চলুন না আমার বাসায় একটু চা খাবেন। গল্প-সল্প করা যাবে।'

'সন্ধ্যা হয়ে এলো। এখন হোটেলে ফিরবো। আরেকদিন আপনার বাসায় চা

খাওয়া যাবে, আজ আসি।' শহীদ এক পা বাড়ালো।

'ও, ভালো কথা, আপনার জমি কিনবার কি হলো? খোঁজ খবর পেলেন কিছু?'

'এই একটু আধটু খোঁজ পেয়েছি। আশরাফ চৌধুরী আছেন না, এখানকার কলেজের প্রফেসার, তিনি নাকি কিছু জমি বিক্রি করছেন। দেখি কথাবার্তা দামদস্তুর করে কি দাঁড়ায়।'

'ইংরেজির প্রফেসার আশরাফ চৌধুরী তো? উনি লোক খুব ভালো। তাঁর সাথে কারবারে আপনি ঠকবেন না। আচ্ছা, আজ আসি, আবার দেখা হবে।'

দু'জন দুদিকে চলে যায়। সেই লোকটি তখনও পাথরের উপরে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওপারের দিকে। সন্ধ্যা নামছে। আবছা হয়ে আসছে ওদিকের পাড়টা। কুয়াশা পড়ছে। দূরে একটা মন্দিরে ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে। কয়েকটা বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। নৌকোগুলোর কোনও কোনোটাতে আলো জ্বলছে। জলে তার প্রতিবিম্ব। কোনো এক বাড়িতে মশা তাড়াবার জন্যে ধূপ পোড়াচ্ছে—তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। মন্দিরে ঘন্টা পড়ছে ঢং ঢং। হোটেলে ফিরে এলো শহীদ। এতোক্ষণে মনে পড়েছে। লোকটার নাম সিরাজুল হক।

আট

রাত দেড়টা। দুপুরে ঘুমিয়েছে তাই কিছুতেই শহীদের চোখে ঘুম আসছে না। ইংরেজি বইটা শেষ করে সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিলো। বিছানায় ঢুকে মশারীর চারিধারটা ভালো করে গুঁজে নিয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ তার অভ্যস্ত কান সজাগ হয়ে উঠলো। সরোদের আওয়াজ! এতো রাতে তো কোনও রেডিও-স্টেশন ধরবার কথা নয়। কোনও সঙ্গীত সম্মেলনও হতে পারে না। তার চোখ এড়িয়ে সম্মেলন হবার জো নেই। আর এতো রাতে সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়া আর কোনও কারণেই রেডিও খুলবে না কেউ। হাত ঘড়িটার দিকে তাকায় শহীদ— রেডিয়াম দেয়া ঘড়ি—দেড়টা বাজে।

ধীরে ধীরে আলাপ হচ্ছে। বড় ভালো বাজাচ্ছে তো! কি বোল্ড টোকা! কি মিষ্টি! এক আলী আকবর খান ছাড়া আর কারও হাত দিয়ে এ টোকা বেরোবার কথা নয়। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো শহীদ। জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। উঃ, অদ্ভুত সুন্দর! বাগেশ্রী বাজাচ্ছে। এক টান দিয়ে দামী আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের দরজা ভিড়িয়ে বেরিয়ে এলো সে হোটেল থেকে। দেখতেই হবে এই মফঃস্বল শহরে কে এতোবড় শিল্পী।

আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল শহীদ। নদীর পারের দোতলাটা থেকে শব্দ আসছে। সে গিয়ে দাঁড়ালো বাড়িটার কাছে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। লোহার একটা গেট আছে। সটান গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো শহীদ। দোতলায় বসে কে যেন বাজাচ্ছে। নিচে বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির উপর বসে পড়লো শহীদ।

বেজে চলেছে সরোদ। কি অদ্ভুত মিষ্টি! স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল শহীদ। বুঁদ হয়ে বসে রইলো সিঁড়ির উপর। তার মনে হলো বাগেশ্রী যেন হেমন্ত কালের রাগ। সেই যে তার কিশোর বয়সে বিকেল বেলা সে আর কামাল পুরানা পল্টনের এক বাসায় ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতো। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সরু একটা পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে বাড়ি ফিরতো তারা। আশে পাশে ছোটখাটো ঝোপ, মাঝে মাঝে ঘন। মস্ত বড় বড় শাল গাছগুলোর তলায় আঁধার হয়ে এসেছে। পথের একধারে ছিলো একটা পুকুর। অজস্র লাল শাপলা ফুটে থাকতো তাতে। কুয়াশা পড়তো। ডোম-পাড়া থেকে ঘুঁটে পোড়ানোর গন্ধ আসতো। শিউলীর গভীর ভারি গন্ধটা নেশা ধরাতো। একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠতো। সেই পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠলো শহীদের মনে। তাদের গায়ে থাকতো হাতে বোনা সোয়েটার—প্রথম বের করা হয়েছে ট্রাঙ্ক থেকে, তাতে ন্যাপথালিনের গন্ধ জড়ানো। শহীদের মনে হলো এখনও যেন সেই গন্ধ পাচ্ছে। সেই কিশোর বয়স। পৃথিবীটা কতো ছোটো তার কাছে তখন। মনটা তখন ঠিক কচি একটা গোলাপের কুঁড়ির মতো। বড় ভালো লাগে শহীদের। সাথে সাথে কষ্টও লাগে। ছোটকালের শহীদটাকে আদর করে দিতে ইচ্ছে করে তার।

তন্ময় হয়ে শোনে শহীদ। আলাপ ছেড়ে গৎ ধরলো বাদক। বড় সুন্দর অস্থায়ী অন্তরা। স্টাইল আছে, গায়কী আছে। খানদানী ঢং আছে।

কিন্তু তবলা নেই। কিছুক্ষণ বাজিয়ে বোধকরি বিরক্ত হয়েই থেমে গেল বাদক। শহীদও বিরক্ত হয়েছে। ফিরে যাচ্ছে সে। গেটের কাছে যেই এসেছে এমন সময় উপর থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ এলো, '*কে?*'

'চমকে উঠলো শহীদ। উঃ, কী ভারি গলা!'

'আমি অনাথ চক্রবর্তী, রায়পুরার জমিদার। আমি এই পাশের হোটেলে উঠেছি। আপনার বাজনা শুনে এসেছিলাম ভালো করে শুনতে। অনধিকার প্রবেশের জন্যে ক্ষমা চাইছি।'

'আপনি উপরে আসুন আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।'

বাইরের দিকে একটা বাতি জ্বলে উঠলো। শহীদ দাঁড়িয়ে রইলো। একবার ভাবলো চলে যাবে কিনা, কিন্তু আবার কৌতূহল হলো, দেখেই যাই লোকটাকে। এতোক্ষণে তার একটু শীত শীত বোধ হচ্ছে। রাত বোধহয় তিনটের কম না। দরজা

খুলে যে লোকটা বেরিয়ে এলো, তাকে দেখেই শহীদ চিনতে পারলো। একেই সে দেখেছে আজ বিকেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে থাকতে। লোকটা অত্যন্ত ভদ্র ভাবে বললো, 'আপনি আমার সাথে উপরে আসুন।' শহীদ তার পিছন পিছন দোতলায় উঠে এলো।

শহীদকে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে সে একটা ইলেকট্রিক স্টোভে এক কেটলি জল চড়িয়ে দিলো। তারপর ভালো করে শহীদের দিকে চেয়ে বললো, 'বাইরে শীতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে আপনার? আমাকে ডাকলেই পারতেন, মিছিমিছি এতো কষ্ট পেলেন অনাথ বাবু।'

'এখন মনে হচ্ছে কষ্ট লাগাই স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু তখন আপনার বাজনা শুনতে শুনতে ভুলেই গিয়েছিলাম কষ্টের কথা। বাগেশ্রীর ওপর এতো সুন্দর আলাপ জীবনে আর কখনও আমি শুনিনি। এর মধ্যে আপনাকে ডেকে বিরক্ত করি কি করে বলুন তো?'

প্রশংসা শুনে মিষ্টি করে হাসলো ভদ্রলোক। চমৎকার ঝক্ঝকে দাঁত দেখা গেল।

'আমার নাম রফিকুল ইসলাম। Businessman, ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না সাধবার। মাঝে মাঝে সারোদটা নিয়ে একটু বসি। কিন্তু তবলচি নেই এখানে ভালো—বড্ডো অসুবিধা হয়। কিছুই বাজানো যায় না।'

'আমি অল্প-সল্প তবলা জানি। তবে আপনার সাথে সঙ্গতের মতো নয়।'

'আপনি জানেন বাজাতে?' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো শিল্পীর মুখ। আলমারির উপর থেকে এক জোড়া বাঁয়াতবলা পেড়ে বিছানার উপর রাখলো। তারপর বললো, 'আগে কফি খেয়ে নিই এক কাপ, তারপর কিছু একটা চেষ্টা করা যাবে, কি বলেন?'

এক কাপ কফি এগিয়ে দিলো সে শহীদের দিকে, আরেক কাপ নিজে নিলো। কফি খেতে খেতে শহীদ তবলাটা বেঁধে নিলো। রফিকুল ইসলাম বললো, 'এই সময়টায় কোন্ রাগ শুনতে ইচ্ছে করছে আপনার বলুন তো?'

'ঝিঁঝিট ঠুমরী।' একটু ভেবে উত্তর দেয় শহীদ।

'ঠিক বলেছেন।'

মিনিট কুড়ি ঝিঁঝিট চললো। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শহীদ। বড় মিষ্টি হাত। অদ্ভুত সুরজ্ঞান রফিকুল ইসলামের বাজনা শেষ হতেই শহীদ বললো, 'উঃ! আপনাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। আপনি গুণী। কোথায় শিখেছেন এমন পাগল করা বাজনা?'

'আমি কারো কাছে শিখিনি। যেটুকু পেরেছি শুনে শুনে শিখেছি। ওস্তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবার সময় আমার ছিলো না। আপনি সত্যিকার সমঝদার, তাই আপনার কাছে ভালো লাগছে। আর কারো কাছে আমার বাজনা ভালো লাগবে না। আমি

ওদের গ্রামার অনুসরণ কার না।'

'আমি তা বুঝেছি। কিন্তু পাণ্ডিত্য আর শিল্প দুটো আলাদা জিনিস। যা ভালো লাগে যা মনকে মাতায় তাকে গ্রামার দিয়ে জবাই করা অন্যায়। আমার তো ধারণা ছিলো আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ঝিঁঝিটের পরে আর কিছু সৃষ্টি হবে না। এইমাত্র আমার সে ভুল আমি শুধরে নিলাম।'

রফিকুল ইসলাম দেরাজ টেনে একটা বোতল বের করলো। বললো, 'আপনার অভ্যেস নেই, তাই না?'

'না।'

'Then excuse me,' ছিপি খুলে ঢক ঢক করে কিছু বিলিতি raw gin গলায় ঢেলে বোতলের ছিপিটা বন্ধ করলো রফিকুল ইসলাম।

শহীদের সাথে তার আলাপ জমে উঠেছে। এরকম আলাপ আরও অনেকক্ষণ চলতে পারতো। শহীদের এতে ক্লান্তি নেই। আর অপর পক্ষেও যে নেই তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এমন সময় দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত চারটে বাজলো। উঠে দাঁড়ালো শহীদ, 'আবার আপনার বাজনা শুনতে আসবো রফিক সাহেব, আজ আসি। আমার আবার সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। এখানে একটা জমি কিনবার ইচ্ছেয় এসেছি। একজন প্রফেসার কিছু জমি বিক্রি করছে, তার সাথে দরদস্তুর করতে হবে। আচ্ছা, আজ আসি।'

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো রফিকুল ইসলাম। অনাথ চক্রবর্তী লোকটা বেশ। তবলায় বেশ হাত আছে লোকটার। লয়জ্ঞানও ভালো, ছোটো খাটো 'রেলা' বড় চমৎকার বাজায়। মনটাও বড় সুন্দর। তাছাড়া সমঝদার।

নয়

বিছানায় শুয়ে শহীদ ভাবতে লাগলো রফিকুল ইসলামের কথা। ভদ্রলোক যে রকম সরোদ বাজায় সে স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠতে হলে অন্ততঃ দশ বছরের কঠোর সাধনা চাই। একজন লোক, এতো যার সাধনা, সে আত্মপ্রকাশ করে না কেন? এতোবড় সাধক, মানুষের চোখে পড়লো না! কতো বড় প্রতিভাবান হলে কারো কাছে না শিখে এমন বাজানো সম্ভব! পৃথিবীতে কেউ জানবে না কতো বড় একজন শিল্পী অপ্রকাশিত রইলো।

বেলা প্রায় এগারোটায় শহীদের ঘুম ভাঙলো। মাঝে হরিদাস একবার দরজায় টোকা দিয়েছিল। ওকে বিরক্ত করতে মানা করে দিয়ে আবার ঘুমিয়েছে।

বিকেলে আশরাফ চৌধুরী এলো। সাথে সাথেই রফিকুল ইসলাম এসে ঢুকলো ঘরে। ওদের বসিয়ে সে চাকরকে ডেকে চা-বিস্কিট আনতে হুকুম দিলো।

আশরাফ চৌধুরী অতি সাবধানে দলিল, পরচা, নক্সা, ইত্যাদি বের করে টেবিলের উপর রাখলো। অতি বিচক্ষণের মতো শহীদ সে সব পরীক্ষা করে নানান রকম বৈষয়িক প্রশ্ন করলো। টুকে নিলো খাজনা কতো, টাকা বাকি আছে কিনা, জমি বরগা দিয়েছে কিনা, দাগ নম্বর কতো, ইত্যাদি আরও কতো কি তথ্য। রফিকুল ইসলাম টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো। শহীদ মনে মনে বললো, ভাগ্যিস বইটাতে নাম লিখিনি এখন পর্যন্ত!

আশরাফ সাহেবের দিকে ফিরে শহীদ বললো, 'আমার নায়েবকে চিঠি লিখে দেবো, সে টাকা নিয়ে আসবে তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করবো। আপনি এর মধ্যে চিন্তা করে দেখুন কিছু কমাতে পারেন কি না। আর আমিও এদিক ওদিক আরও কিছু খোঁজখবর করে দেখি কোথায় সুবিধা হয়।'

'তা তো বটেই। এখন পর্যন্ত জায়গাটা আপনি দেখেনইনি। এখনই আপনার কাছ থেকে কোনো মতামত আশা করা যায় না।'

এমন সময় রফিকুল ইসলাম বললো, 'কতখানি জমি কিনছেন আপনি? আমি কয়েকটা জমির খোঁজ দিতে পারি। ঐ তো মদনপুরের রহিমুদ্দিন ভূঁইয়া জমি বিক্রি করবে। এখানকার জমিদার নারাণ বাবু তাঁর এস্টেট গোটাই বিক্রি করে ইণ্ডিয়া চলে যাবেন। গড়াই নদীর ওপারে কয়েকজন…'

'আপনি নাম ঠিকানাগুলো আমাকে লিখে দিন দয়া করে, নইলে আমার মনে থাকবে না।' বাধা দিয়ে বলে শহীদ। ব'লে বাক্স থেকে একটা নোটবুক বের করে দিলো রফিক সাহেবের হাতে। নাম-ঠিকানা কয়টা লিখে নোট বইটা শহীদের হাতে দিয়ে বললো, 'এঁদের সবার কাছেই আমার নাম বললে এঁরা খুব খাতির করবেন, দামের দিক দিয়েও হয়তো সুবিধা হতে পারে।'

লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শহীদ বললো, 'আমি এঁদের সাথে দেখা করবো। সম্ভব হলে কালই।'

আশরাফ চৌধুরী চা খেয়েই উঠে গেলেন শহীদের একটা গোপন ইঙ্গিতে। শহীদ রফিক সাহেবকে বললো, 'চলুন না নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি? আমার পেটে আবার একটু গ্যাসটিক গোছের আছে কিনা, নদীর বাতাসটায় খুব উপকার হয়।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়ায় রফিকুল ইসলাম।

দুজনে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রফিকুল ইসলাম বললো, 'রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ এখান থেকে কতদূর জানেন?'

'না। কত দূর?'

'মাত্র চার পাঁচ মাইল।'

'তাই নাকি, চলুন না, একদিন দেখে আসি?'

'চলুন কাল পরশু কোনো একদিন। আমার একটা লঞ্চ আছে, তাতেই যাওয়া যাবে, কি বলেন?'

'আপনার লঞ্চ আছে নাকি? কোথায়?'

'এখন সেটা গোয়ালন্দে, কাল এসে পৌছবে। এই সামনেই সেটা নোঙ্গর করে রাখি। আমার বিজনেসের জন্যে খুবই কাজে লাগে।'

'কিসের ব্যবসা করেন আপনি?' জিজ্ঞেস করে শহীদ।

'কিছু জামি আছে, তাতে আখ চাষ করি। আখের কল আছে তাতে গুড় তৈরি করি। অনেক আখ বাইরে থেকেও কিনতে হয়। সে গুড় ঢাকায় চালান করি। এছাড়া আরো কতগুলো প্রাইভেট বিজনেসও আছে—পারমিটের ব্যাপার।'

'গুড়ের ব্যবসায়ে লাভ কি রকম?'

'প্রচুর লাভ। ইনভেস্টমেন্টের দ্বিগুণ। আপনাদের ওদিকে আখ কেমন হয় বলুন তো?'

'আমাদের ওদিকে আখের চাষ বিশেষ নেই, কিন্তু জমি আখের জন্যে খুব suitable. আর সস্তাও খুব, দু'শ করে বিঘা, আবাদী জমি। মাঝে মাঝে একশোও হয়, পঞ্চাশেও নামে।'

'বাঃ খুব সস্তা তো। ওদিকে ছেড়ে এদিকে জমি কিনতে চান কেন?'

একটু রহস্যময় হাসি হেসে শহীদ বললো, 'ব্যাপার কি জানেন, আমি আসলে নারাণ বাবুর এস্টেট বিক্রির খবর পেয়েই এসেছি। কাউকে বলিনি। জানেনই তো, আমাদের সাথে সাথেই টাকা থাকে, ব্যাঙ্কে কিছু রাখি না, এই বিদেশ বিভুঁইয়ে চোর ডাকাত পড়তে কতক্ষণ?'

'আপনি সাথে করে সব টাকা এনেছেন বুঝি?'

'আপনি খেপেছেন! তাই সম্ভব? একটা বন্দোবস্ত হলে নায়েবকে টেলিগ্রাম করবো। সে-ই নিয়ে আসবে সব টাকা।'

'আপনার স্ত্রী কি রায়পুরাতেই আছেন নাকি অন্য কোথাও?'

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল শহীদের। বললো, 'আমি আজ দশ বছর ধরে বিপত্নীক। আর বিয়ে-থা করিনি। একটা মেয়ে ছিলো, দুবছর হলো বিয়ে দিয়েছিলাম, সে-ও মাস ছয়েক হলো একটা বাচ্চা রেখে মারা গেছে।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। শহীদ বললো, 'আপনি বিয়ে করেননি বুঝি এখনও?'

'না। ইচ্ছেও নেই।'

'আপনি কি মনে করেন না জীবনটা ফুরিয়ে যাবার আগে ভোগ করে নেয়াই সমীচীন?'

'নিশ্চয়ই!' জোরের সাথেই বলে রফিকুল ইসলাম, 'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু সবার ভোগ তো সমান নয় অনাথ বাবু। আমিও ভোগ করছি জীবনটা। নইলে বাঁচি কি করে? তবে আমার ভোগে নারীর দরকার হয় না।'

শহীদ আর কথা বাড়ায় না। তার কেমন একটু শীত শীত করছে। সে বললো, 'এখন ওঠা যাক, রফিক সাহেব।'

'আপনি যান। আমি সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরবো। এই আমার নিয়ম। রোজ বিকেলে বসি, সন্ধ্যের পর উঠি।' পকেট থেকে একটা বোতল বের করে কিছু হুইস্কি গলায় ঢাললো সে। 'আসবেন আজ?'

'আসবো। আপনি বিরক্ত না হলে ঠিকই হাজিরা দেবো আপনার বাসায়।'

'বিরক্ত মানে? আমি আরও শোনাবার লোক পাই না। আসবেন আটটায়।'

'আচ্ছা।' শহীদ ফিরে এলো হোটেলে।

দশ

কামালের চিঠি এলো। সে তার কথামতো কাজ করছে।

রফিকুল ইসলাম সম্বন্ধে আশরাফ চৌধুরীর কাছে অনেক কিছু জানতে পারলো শহীদ। আশরাফ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে এই মানুষটার। বছর তিন হলো কুষ্টিয়ায় ব্যবসা করছে। অতি ভদ্রলোক। প্রচুর টাকা করেছে ব্যবসা করে।

রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ দেখে এসেছে শহীদ রফিকুলের সঙ্গে আজ দুদিন হলো। রোজ রাতে আসর বসে। রফিকুল ইসলামের বাড়ির উপরতলার একটা অংশ একেবারে তালা বন্ধ থাকে। শহীদ জিজ্ঞেস করায় রফিক হেসে বললো, 'একা মানুষ, কে থাকবে এতো বড় বাড়িতে? চাকর আছে একটা, সে একতলার সম্পূর্ণটা জুড়ে থাকে। আমি অনেক চেষ্টা করেও এই তিনখানা ঘরের বেশি জুড়তে পারিনি। ওদিকটা খালিই পড়ে থাকে, তাই বন্ধ করে দিয়েছি।'

'ভাড়া দিলেই পারো।' শহীদ বলে।

'মফঃস্বল শহর, কে ভাড়া নেবে? তাছাড়া আমার সঙ্গীতের ধাক্কায় দুদিনেই ভাড়াটে পালাবে।'

দু'জনে হাসে। এতো কম সময়ে তাদের এতো গভীর বন্ধুত্ব জমে উঠবে কে,

ভাবতে পেরেছিল? শহীদ কামালকে লিখেছে তার বন্ধুর কথা। লিখেছে, 'যেদিন শুনবি বাজনা, কেবল মাত্র সেদিনই বুঝবি, কী অদ্ভুত ভালো বাজায়।'

সেদিন রাত দশটায় হোটেলে ফিরে আসছে শহীদ। হোটেলের দরজার কাছে আসতেই একজন লোক ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে। একবার তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে শহীদ উপরে উঠে গেল। তার ঘরের দরজা খোলা। আশ্চর্য হয়ে গেল শহীদ ঘরে ঢুকে। সমস্ত ঘরে তার জিনিসপত্র ছড়ানো। কে যেন তার বাক্স ঘেঁটেছে লণ্ডভণ্ড করে। প্রায় সবকিছুই বের করে মাটিতে টাল দেয়া। এক জোড়া স্যুট, কয়েকটা শার্ট, পাজামা, ধুতি, পাঞ্জাবী, সব মাটিতে বের করা রয়েছে। মেকআপ করবার জন্যে যে সব পরচুলা, পেইন্ট তার বাক্সে ছিলো, সবগুলোই মাটিতে নামানো। শহীদ লক্ষ্য করে দেখলো কিছুই চুরি যায়নি। টাকা আর রিভলবার তার সাথেই ছিলো।

মহা ভাবনায় পড়লো শহীদ। তাহলে কি কুয়াশার দৃষ্টি পড়েছে তার উপর? নাকি বেটা ছিঁচকে চোর? কিন্তু তাহলে জিনিস কিছুই চুরি হলো না কেন? দেখা যাক কি হয়, শহীদ ভাবে। তবে সাবধানে থাকতে হবে। পুলিসে খবর দিয়ে লাভ নেই, শুধু শুধু হাঙ্গামা করবে পুলিস এসে। হয়তো হরিদাসকে ধরেই মারতে লেগে যাবে। একবার ভাবলো রফিকের বাসায় উঠে যাবে কিনা।

জিনিসপত্র তুলে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলো শহীদ। কাউকে কিছু জানালো না। কিছুক্ষণ পর হরিদাস এসে বললো, 'বাবু আপনাকে একজন খুঁজতে এসেছিল সোন্দের পর।'

'তার নাম বলে গেছে?'

'আজ্ঞে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছেলাম। বললো না। আমি বললাম আপনি রফিক সাহেবের বাসায় যেয়েছেন। সে লোক অনেকক্ষণ নিচের রেস্টুরেন্টে বইসেছেল আপনার জন্যি। তারপর কখন যে উইঠে চইলে গেল দেখিনি। আপনার সাথে দেখা হোইনি বাবু?'

'না হয়নি। আবার কখন আসবে লোকটা বলে গেছে?'

'না বাবু।'

'কি রকম দেখতে লোকটা?'

'বাঁইটে মতোন। মোটাসোটা। হাতে একটা ছোট বাক্স ছেলো। সাদা শার্ট আর পাজামা পইরে ছেলো।'

শহীদ খেয়াল করে দেখলো আজ হোটেলে ঢুকবার সময় পিছন থেকে যাকে দেখেছে তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে ওর বর্ণনা। একটা টাকা বের করে হরিদাসের হাতে দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও হরিদাস। এরপর কেউ আমাকে খোঁজ

করলে তাকে বসিয়ে রেখে আমাকে খবর দেবে।'

হরিদাস চলে যাচ্ছে, তাকে আবার ডেকে শহীদ বললো, 'এখন চা পাওয়া যাবে না হরিদাস?'

'আজ্ঞে রাত বারোটা পর্যন্ত পাবেন।'

'কফি নেই?'

'আজ্ঞে তাও আছে।'

'বাঃ।' শহীদ খুশি হয়—এক কাপ কফি ভালো করে বানিয়ে আনো তো।

ব্যাল্‌কনিতে বসে অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে কফিটুকু খেলো শহীদ। তার মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছে একসাথে বহু চিন্তা। সে এখানে এসেছে খুনীর অনুসন্ধানে আজ পাঁচ ছয় দিন। কিন্তু কতটুকু অগ্রসর হর্তে পেরেছে সে? আজ হয়তো সে কুয়াশার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে।

পর পর অনেকগুলো সিগারেট ধ্বংস করলো শহীদ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায়। তার মুখে একটা দুর্বোধ্য রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো ধীরে ধীরে।

পরদিন নারাণ বাবুর সাথে দেখা করলো শহীদ রফিকুল ইসলামের সাথে গিয়ে। আরও কয়েকখানে গেল। আশরাফ চৌধুরীর বাড়িতেও একবার গিয়ে ঢুঁ মেরে এলো। পথে ট্রেনের সেই সিরাজুল হকের সাথে দেখা। আদাব বিনিময় হলো। রফিক জিজ্ঞেস করলো,'এই ভদ্রলোক কে?'

'আমার সাথে ট্রেনে পরিচয়। বড্ডো গায়ে পড়ে আলাপ করছিল তাই প্রথমে আমার খারাপ লোক বলে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার নদীর ধারে দেখা। মোহিনী মিলে কি একটা কাজ করে যেন বললো।'

'মোহিনী মিলে? অসম্ভব। আমি নানান ব্যাপারে প্রায়ই যাই মোহিনী মিলে। ওখানকার সব লোক আমার চেনা। এ লোক নিশ্চয়ই নতুন এসেছে কুষ্টিয়ায়। ছোট্ট শহর এটা। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সবাই সবাইকে চেনে। তোমার কাছে মিছে কথা বলেছে লোকটা।'

গতরাতের ঘটনা মনে পড়লো শহীদের। রফিকুল ইসলামকে বললো ব্যাপারটা। রফিক চিন্তিত হয়ে বললো, 'তাই তো! তোমার পেছনে চোর ছ্যাঁচোর লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। Well planned বলেই বোধ হচ্ছে, সেই ট্রেন থেকে follow করেছে তোমাকে। তুমি একটু সাবধানে থেকো। আর আপাততঃ চলো সোজা মোহিনী মিলে যাই। ওদের attendance register দেখলেই বোঝা যাবে সিরাজুল হক বলে কেউ ওখানে কাজ করে কিনা সত্যি সত্যিই।'

রিক্সা ঘুরিয়ে ওরা মোহিনী মিলে গিয়ে উপস্থিত হলো। কর্মচারীদের অনেকেই রফিকুল ইসলামকে সসম্মানে সালাম দিলো। ম্যানেজার কি কাজে অফিস থেকে বাইরে এসে রফিককে দেখে হৈচৈ করে ডাকাডাকি শুরু করলেন। এ জায়গায় রফিকুল ইসলামের খুবই প্রতিপত্তি আছে বোঝা গেল। সেটা হয়েছে ম্যানেজারের সাথে বন্ধুত্বের পর থেকে।

খোঁজ করে দুজন সিরাজুল হক বেরোলো। ম্যানেজারের হুকুমে তারা সামনে এসে দাঁড়ালো। আর কোনও সিরাজুল হক নেই। শহীদ আর রফিক অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এলো। কেউ লক্ষ্য করলো না, একজন লোক ম্যানেজারের অফিসের অদূরেই একটা গাছের আড়াল থেকে সব দেখলো। তারপর ধীর পদে বাজারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এগারো

কামালকে টেলিগ্রাম করলো শহীদ। সেদিনই বিকেলে কামাল আর গফুর এসে পৌঁছলো। সুন্দর মেকআপ হয়েছে কামালের। গফুরকেও চেনা যায় না।

সন্ধ্যের দিকে রফিকুল ইসলাম এসে বসলো শহীদের ঘরে। অনেক রকম কথা হচ্ছিলো। গফুরের প্রকাণ্ড কাঠামোর দিকে চেয়ে সে বললো, 'বাঃ, অদ্ভুত জিনিস পেয়েছো তো, অনাথ বাবু। তোমার নাম কি হে?'

'আজ্ঞে আমার নাম পেল্লয় বাগদী।'

'কিল মেরে কটা মানুষের মাথা একসাথে ভাঙতে পারো?'

'ও গোটা দুই পাঠান খাঁ সাহেবকে চড় মেরে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারে।' শহীদ হেসে বললো।

গফুর সিধে রফিকের দিকে চেয়ে বললো, 'আজ্ঞে, দাদামণিকেও কিছু কম মনে করবেন না। আমার চাইতে তিনগুণ বেশি শক্তি আছে ওনার গায়ে। অনেকবার সে পরীক্ষা হয়ে গেছে।'

শহীদ দেখলো, গফুর স্থান–কাল–পাত্র ভুলে যাচ্ছে। দাদামণির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ও এখনি বেফাঁস কথা বলে বসবে। রফিককে এড়িয়ে কয়েকবার চোখ টিপলো সে। গফুর দেখেই না। সে বলেই চলেছে, 'ঢাকায় বছর খানেক আগে একবার আমাদের বাড়ির সামনে কয়েকজন গুণ্ডা ধরেছিল দাদামণিকে। সেই যে, প্রথম প্রথম দাদামণির মাথায়...'

বাথরুম থেকে আওয়াজ এলো, 'প্রলয়। আমার তোয়ালেটা দে তো বাক্স থেকে

বের করে, ফেলে এসেছি।'

গফুর সচেতন হয়ে গেল। সে বাক্স খুঁজে বললো, 'নেই তো বাবু আপনার তোয়ালে বাক্সের মধ্যে।'

'ওহ্-হো। এই তো কাপড়ের তলায় ছিলো। লাগবে না যা, পাওয়া গেছে।'

গফুর নিচে গেল। রফিকুল ইসলাম বললো, 'ঢাকায় তোমার বাড়ি আছে বুঝি?'

'ছিলো। এখন ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন রায়পুরাতেই থাকি।'

হঠাৎ রফিকুল ইসলাম উঠে দাঁড়ালো। 'আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে, অনাথ বাবু। আমার মনেই ছিলো না একখানে এনগেজমেন্ট আছে। তুমি এগারোটার সময় অবিনাশ বাবুকে নিয়ে আমার বাসায় এসো।

ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল রফিকুল ইসলাম। এইমাত্র কোথা থেকে যেন একটা টেলিগ্রাম এসেছে। সেটা পড়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভুলে টবিলের উপর ফেলে গেছে সে। সেটা খুলে একবার চোখ বুলালো শহীদ, তারপর আবার যথাস্থানে বন্ধ করে রেখে দিলো।

কিছুক্ষণ পরই রফিকুল ইসলাম ফিরে এলো। 'টেলিগ্রামটা ভুলে রেখে গেছিলাম, বলে সেটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।'

খাওয়া দাওয়ার পর কামাল বললো, 'কোনো সূত্র পেলি এতদিনে?'

'কিছু কিছু পেয়েছি, কিন্তু আরও বড় প্রমাণ চাই।'

'কাকে তোর সন্দেহ হয়?'

'সে পরে শুনিস। এখন তোকে আমি একটা কাজ দেবো। চটপট তৈরি হয়ে নে।'

'কি কাজ?'

'আমার পেছনে একজন লোক ঘুরছে কদিন ধরে। তার ওপর তোর নজর রাখতে হবে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ, ঐ যে লোকটা দেখা যাচ্ছে পান কিনছে মোড়ের দোকানে, ভালো করে চিনে রাখ ওকে। আজ রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমাকে বাইরে যেতে হবে তার জন্যে। আমার পেছনে এ লোকটা লেগে থাকবে। তুই শুধু খেয়াল রাখবি যেন লোকটা আমাকে বেকায়দায় না পায়। দরকার হলে রিভলবার ছুঁড়বি। মেরে ফেলিস নে আবার। জখম করবি শুধু।'

'কি ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, শহীদ। কোথায় দুর্ঘটনা ঘটবে? এই লোকটাই বা কে?'

'বোঝাবার সময় নেই! এখন নয়টা বাজে। আর সময় নেই। আমি তৈরি হয়ে নিই, তুইও একটা কিছু পরে নে। আমার পাঁচ মিনিট পর তুইও বেরিয়ে যাবি হোটেল থেকে। খবরদার, লোকটাকে চোখের আড়াল করবি না। তাহলে তুই আর মজমপুর

চিনবি না। আমি খুব বিপদে পড়তে পারি।'

'ঠিক হ্যায়। আমি ঠিক নজর রাখবো। ঐ ব্যাটা ঘোঁতকাকে আর আমার চোখ এড়াতে হচ্ছে না।'

কালো স্যুট পরা একজন দীর্ঘাকৃতি যুবক 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' থেকে বেরিয়ে গেল। ম্যানেজার একবার তাকালো তারপর নিজের কাজে মন দিলো। লোকটা বোধহয় জমিদার বাবুর কাছে এসেছিল।

তার মিনিট পাঁচেক পর একজন অতি বৃদ্ধ ভিক্ষুক লাঠি হাতে, একটা ছেঁড়া থলে গলায় ঝুলিয়ে হোটেলের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শীতে তার হাত পা কাঁপছে। অতি অপরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় দিয়ে যতোটা সম্ভব শীত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছে সে।

থানাপাড়ার রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যুবক। রাস্তার একপাশে সারি সারি বন্ধ দোকান। এদিকটা এমনিতেই নির্জন তার উপর আজ রবিবার—সারাদিনই দোকান-পাট বন্ধ। পথিকের জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দোকানগুলোর বন্ধ দরজায়। লাইট পোস্টের নিচে তার ছায়াটা ছোট হয়ে আসে, আবার বড় হতে হতে মিলিয়ে যায় আরেকটা পোস্টের কাছে এসে। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বরাবর হেঁটে এসে দাঁড়ালো সে একটা মোড়ের কাছে। ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা। মেইন রোডটা বাঁ দিকে ঘুরে রেল লাইন পেরিয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকে। কোনও দিকে না তাকিয়ে এই কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো সে। এক হাঁটু ধুলো রাস্তায়। বরাবর কিছুদূর এগিয়ে একটা একতলা বাড়ির ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো যুবক। একেবারে নির্জন এলাকায় বাড়িটা, আশে পাশে আর কোনো বাড়ি নেই। আর সিকি মাইলটাক পুবে এগোলেই গড়াই নদী। বাড়িটার উল্টো দিকে রাস্তার ওপাশে বেশ বড় একটা মাঠ। তারও দক্ষিণে কয়েকটা বাড়ির পিছন দিক। মাঠটা জঙ্গল হয়ে আছে আগাছায়। ছোট ছোট ঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও আছে। রাস্তাটার ডান ধারে লাইন করা কতকগুলো জিগে গাছ। লোকটা ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। বাড়িটার উপর ভালো নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

বাড়িটার দক্ষিণ দিকে একটা জানালা খোলা। একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে ঘরের ভিতর। আশে পাশে কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঘড়িটার দিকে চাইলো যুবক। দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। পকেট থেকে কি একটা শাঁখের মতো জিনিস বের করে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিলো। 'ঘেউ' করে একটা শব্দ হলো জোরে। ঠিক যেন অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাক। সাথে সাথেই ঘরের ভিতরের আলোটা নিভে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যুবক। মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নাড়ছে। বড্ডো

বেশি মশা।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শ পেলো সে। চমকে ঘুরে দাঁড়ায় যুবক। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা ছায়ামূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়।

'হ্যাণ্ডস্ আপ।' চাপা অথচ গম্ভীর গলায় আওয়াজ এলো।

যুবক দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়ায়।

'বাছাধন। ভেবেছো ছদ্মবেশ পরে খুব ফাঁকি দিলে। এইবার তোমার সব জারিজুরি বের করবো।' যুবকের পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারটা বের করতে গেল আগন্তুক। মুখে তার ক্রুর হাসি।

হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গেল। খট্ করে একটা শব্দ হলো। আগন্তুকের হাত থেকে ছিট্কে রিভলবার মাটিতে পড়লো। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে লোকটা। আরেকটা শব্দ, খট্। কিছু-মাত্র শব্দ না করে লোকটা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার যুবক কথা বললো, 'ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলি, কামাল! জব্বর মার মেরেছিস, এখন নে, রুমালটা ব্যাটার মুখে পুরে দে, আর এইটা দিয়ে ভালো করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল্। আমি মোটেই টের পাইনি ব্যাটা আমার এতো কাছে ছিলো!'

একটা রুমাল আর একগাছা সিল্কের দড়ি বের করে দিলো শহীদ। তারপর মাটি থেকে রিভলবারটা তুলে নিলো।

ঠিক সোয়া দশটার সময় দূর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শোনা গেল। কামাল বললো, 'গলির মুখে এসে শব্দটা থেমে গেল বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। থামবে। সময় উপস্থিত।' ফিস্ফিস্ করে বলে শহীদ। 'রিভলবার হাতে করে দাঁড়া। ওকি কাঁপছিস কেন? ভয় লাগছে?'

'গায়ে কাপড় নেই, শীত করছে।'

শহীদ তার গায়ের কোটটা খুলে কামালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। স্নেহের সুরে বললো, 'গাধা। ভিক্ষার থলেতে একটা আলোয়ান আনতে পারিসনি?'

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। তার মুখ চেপে ধরে শহীদ। ফিস্ফিস্ করে বলে, 'চুপ! ঐ দেখ আসছে! ওরই নাম কুয়াশা! সামান্যতম আওয়াজ হলেই ও টের পেয়ে যাবে। একদম চুপ।'

'কাছে এলে গুলি করবো?'

'খবরদার! আমার আদেশ ছাড়া কিছু করবি না।'

একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। পায়ের তালে তালে কেবল একটা হাত দুলছে। আরেকটা হাত স্থির। শহীদ একটু অবাক হয়। না, না,

আরেকটা হাতও আছে—সে হাতে একটা বাক্স মতো কি ঝোলানো।

সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে কুয়াশা। কামালের বুকটা হিম হয়ে আসে। এই লোকটাই অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। এই যে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা, সে একজন খুনী, ফাঁসির আসামী।

ওদের ঝোপের থেকে রাস্তা হাত পাঁচেক দূরে। ঠিক ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। চারদিকে সন্তর্পণে একবার চাইলো। তারপর বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর জানালার একটা শিকের ওপর ধরলো বাক্সটা।

শহীদ পকেট থেকে কি একটা বের করে তাতে ফুঁ দিলো দু'বার। ঘেউ! ঘেউ! রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দু'বার ডেকে উঠলো একটা কুকুর। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের প্রচণ্ড এক আওয়াজ। ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে অনেকক্ষণ ধরে শব্দটা এ বাড়ি ওবাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগলো। স্যাঁৎ করে সরে গেল কুয়াশা জানালার ধার থেকে। একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। উদভ্রান্তের মতো কামাল রিভলবার তুললো। শহীদ চেপে ধরলো তার হাত। কয়েক সেকেণ্ড একটা গাছের এপারে বাড়িটা থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কুয়াশা। তারপর দৌড় দিলো বড় রাস্তার দিকে। একটু পরেই আবার ঘোড়াগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

আবার শিঙাটা নিয়ে শহীদ তিনবার কুকুরের ডাক ডাকলো। ঘরের ভিতর একটা আলো দেখা গেল একটু পরেই। দরজা খুলে হ্যারিকেন হাতে একটা মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। 'আপনি কোথায়, শহীদ ভাই?' মেয়েটি জোরে ডাকে।

'এই তো এখানে। হ্যারিকেনটা নিয়ে এই দিকে আসুন।'

আলোটা এগিয়ে এলো। মেয়েটি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলো, 'সে এসেছিল শহীদ ভাই?' ওখানে কি পড়ে রয়েছে? আরে অনেক রক্ত যে!' মেয়েটির গলা কেঁপে ওঠে।

লোকটা তখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। শহীদ ওকে অনায়াসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো। তারপর মেয়েটিকে বললো, 'আপনি আলো ধরুন সামনে। হ্যাঁ, এখন চলুন বাসার দিকে। এর জ্ঞান আগে ফিরিয়ে আনি, তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। আপনার বাবা সুস্থ আছেন তো?'

'হ্যাঁ। বাবা মোটেও ভয় পাননি। বাব্বা, আমার কী ভয় যে করছিল!'

বৈঠকখানার দরজা খুলে দিলো মেয়েটি। ঘরের মধ্যেখানে লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে শহীদ বললো, 'আপনি একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে আনুন তো শিগ্‌গির।'

মেয়েটি বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। ফিরে এসে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে লোকটার মুখের

রক্ত মুছে দিলো। মাথার একটা জায়গা বেশ অনেকখানি কেটে গেছে, রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। লোকটার মুখে চোখে জল ছিটাতে লাগলো সে।

কামাল আর শহীদ বাইরে এসে জানালার সামনে দাঁড়ালো। এইখানেই দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা। একটা শিকের নিচের দিকটা গলে গেছে। কয়েক ফোঁটা গলা লোহা পড়ে রয়েছে। কামাল শহীদের দিকে চাইলো, শহীদও কামালের দিকে চাইলো। কেউ কোনও কথা বললো না। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে কামাল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'তোর জন্যে শহীদ, কেবল তোর জন্যে আজ কুয়াশা পালিয়ে যেতে পারলো। নইলে আমি ওর বুকের মধ্যে বুলেট ঢুকিয়ে টের পাইয়ে দিতাম খুন করবার মজা।'

'উত্তেজিত হোস না কামাল। মাথা ঠাণ্ডা কর। ওকে খুন করলে পুলিস তোকে ধরতো খুনের দায়ে। কিছুতেই তুই প্রমাণ করতে পারতিস না যে ও-ই কুয়াশা। ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।'

'অন্তত ওকে আহত করে বন্দী করা তো অসম্ভব ছিলো না।'

'অসম্ভবই ছিলো, কামাল। ওর হাতে একটা বাক্স দেখেছিস না? ওটা আমাদের দিকে ধরে একটা বোতাম টিপলে আমাদের ভবের লীলা সাঙ্গ হতে এক সেকেণ্ডও লাগতো না। ওকে আহত করবার অর্থ নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনা।'

শহীদের কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হলো না কামাল। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে শহীদ মেয়েটির কাছে কাগজ কলম চাইলো। খশ্ খশ্ করে কি কি সব লিখলো। তারপর ভাঁজ করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, 'আমাদের খুব জরুরী কাজ আছে। আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। লোকটার জ্ঞান হলে এ চিঠিটা ওকে দেবেন, আর এই যে ওর রিভলবার, এটাও।' বলে শহীদ চিঠি আর রিভলবার দিলো মেয়েটির হাতে।

কামালের মুখটা হাঁ হয়ে গেছিলো। সামলে নিয়ে অতি কষ্টে রাগ চেপে মেয়েটির দিকে চেয়ে বললো, 'আর আমাদের ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, ওকে বলবেন যদি কিছু মনে না করে তাহলে যেন দয়া করে গিয়ে কামাল আহমেদ আর শহীদ খানের বুকে দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে আসে।'

ওর এই চাপা রাগ দেখে শহীদ হেসে ফেললো। আরও রেগে গিয়ে কামাল বললো, 'তোমার তামাশা আমি বুঝি না শহীদ। লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়ার কি অর্থ হতে পারে? তুমি তো মরতে বসেছিলে ওর হাতে। এখন আবার অতো দয়া কেন?'

রেগে গেলে সে শহীদকে 'তুমি' ক'রে বলে। শহীদ ওর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আয় কামাল, পথে যেতে যেতে সব বুঝিয়ে দেবো। এখন আয়, দেরি করিস না, আমাদের জরুরী কাজ আছে।'

হোটেলে ফিরে এলো ওরা নিরাপদেই। গফুর মাটিতে একটা বিছানা পেতে কাঁথা জড়িয়ে বসে পুঁথি পড়ছিল, হরিদাস বসে শুনছিল। অপরিচিত লোক দেখে হরিদাস একটু আশ্চর্য হলো। এতো রাতে আবার কোনো ভদ্রলোক কারও সাথে দেখা করতে আসে? নিচে চলে গেল ও।

বেশ বদল করে ওরা রফিকুল ইসলামের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। খাটের উপর বসলো শহীদ, কামাল বসলো একটা চেয়ারে। যন্ত্রে ইতিমধ্যেই সুর মিলিয়ে রেখেছে রফিক। রাত প্রায় দেড়টায় আসর ভাঙলো। কামাল ঝিম হয়ে রয়েছে। দরবারী বাজালো আজ রফিক। এগিয়ে এসে কামাল হঠাৎ রফিকুল ইসলামের পায়ের ধুলো নিলো। সসব্যস্ত হয়ে উঠলো রফিকুল ইসলাম। লজ্জা পেয়ে বললো, 'ওকি করেন। আপনি আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়। ছি, ছি!'

যখন কামাল উঠে দাঁড়ালো তখন তার চোখে জল। রফিকের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর মৃদুস্বরে বললো, 'গুণী! শিল্পী! আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নাও।'

কামালকে জড়িয়ে ধরলো রফিক। বললো, 'আমায় যে বোঝে সে আমার চাইতে কোনো দিক দিয়ে ছোটো নয় অবিনাশ বাবু। আপনারা আমার বিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছেন দু'জন মিলে। আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে কেউ আমার গান বুঝবে, অনুভব করবে। সঙ্গীত বুঝতে হলে চাই উদার মন। আপনাকে কি করে যে আমার ভালোবাসা জানাবো বুঝতেই পারছি না, অবিনাশ বাবু।'

কামাল রফিকের বাহুপাশ থেকে ছুটে বললো, 'কাল আবার আসতে পারবো তো?'

'নিশ্চয়ই। কাল এগারোটার সময় আসবেন। আজ কিন্তু আপনারা বেশ দেরি করে এসেছিলেন।'

'কাল ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছোবো, রফিক সাহেব।' শহীদ বলে। 'আর এখন আমরা আসি।'

'চাকরটাকে কফি আনতে বলেছিলাম। ও বোধহয় আমাদের disturb হবে ভেবে এতক্ষণ আনেনি। একটু বসো, কফি খেয়ে যাও।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রফিকের মিশমিশে কালো চাকরটা এসে ঢুকলো ঘরে। একটা ট্রেতে করে কফি আর কয়েকটা বিস্কিট এনেছে।

একটা বোতল খুলে কিছু raw gin গলায় ঢেলে দিলো রফিক। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ রফিককে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটোতে আজ যেন একটা স্বপ্নের আবেশ। বড় ভালো লাগছে ওকে। একটা গাঢ় চকোলেট রঙের আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বসেছে ও। মিষ্টি হেসে বললো, 'জানো, আজ আমার জন্মদিন।'

'তাই নাকি? আগে বলোনি কেন?' শহীদ বললো।

'কেন, কিছু প্রেজেন্ট করতে বুঝি? আমি প্রেজেন্টেশন নিতে ভালবাসি না।'

'ভালো কথা।'

'আচ্ছা, আপনি বিটোফেনের সুর ভালবাসেন, অবিনাশ বাবু?'

'হ্যাঁ। অবশ্য ভালো বুঝি না। কিন্তু মন্দ লাগে না।'

'কাল এসো, তোমাদের কয়েকটা জার্মান সুর বাজিয়ে শোনাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরোদেই, আর কিছু আমি জানি না বাজাতে।' শহীদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে হেসে বলে রফিকুল ইসলাম।

'আপনি ওদেশের সঙ্গীতও জানেন?" জিজ্ঞেস করে কামাল।

'এই সামান্য কিছু। আমি পনেরো বছর জার্মানীতে ছিলাম।'

'জার্মানীতে?' বিস্মিত হয় শহীদ, কামাল।

'হ্যাঁ। সে অনেক কথা। আরেকদিন শুনবেন। আজ না, কেমন?' কয়েক ঢোক মদ খায় রফিকুল ইসলাম।

পরদিন সকালে শহীদ আর কামাল চা খাচ্ছে, এমন সময় চিঠি হাতে একটা বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। বললো, 'আপা চিঠিটা দিলেন, বললেন খুব জরুরী।'

চিঠিটা পড়ে শহীদের ভ্রূ কুঁচকে গেল। কামালের হাতে দিলো চিঠিটা। কালকের সেই মেয়েটির লেখা। লিখেছেঃ

'শহীদ ভাই,

কাল মাঝরাত থেকে বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত তিনটের দিকে গরম জল নিয়ে দেখি গিয়ে বাবা বিছানায় নেই—জানালার সব কটা গরাদ বাঁকানো। এখনো পুলিসে খবর দিইনি। বড় বিপদে পড়েছি। আপনি শিগ্‌গির একবার আসুন।

ইতি—মহুয়া।

এক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো। রিক্সায় কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটা হিন্দু নাকি রে?'

'না। মুসলমান। ওর বাবার নাম হেকমত আলী। কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। বছর পাঁচেক থাইসিসে ভুগছেন—বিছানায় পড়ে আছেন। মেয়েটি বি. এ. পড়ছে। গার্লস্ স্কুলে মাস্টারি করে আর পড়ে। সংসারও সেই চালায়।'

রিক্সা এসে থামলো বাড়িটার সামনে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। বাইরে থেকেই দেখা গেল জানালার সব কটা গরাদ বাঁকানো। মহুয়া বেরিয়ে এলো।

মুখটা শুকিয়ে গেছে সারারাত্রির চিন্তায়। কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কামাল লক্ষ্য করলো মেয়েটি অদ্ভুত সুন্দরী। বয়স আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে। চমৎকার গড়ন, রঙটা উজ্জ্বল গৌর। মুখ দেখে কেউ বুঝবে না ঐ মেয়ে কঠোর সংগ্রাম করছে বেঁচে থাকবার জন্যে। টানাটানা চোখগুলো বড় গভীর। সমস্ত মুখটায় একটা নিষ্পাপ সারল্য আছে।

'আপনি বাবাকে ফিরিয়ে এনে দেন, শহীদ ভাই।'

'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আজ এখানে আমার আসবার কোনও প্রয়োজন ছিলো না, কেবল আপনাকে বলতে এলাম, ভয় পাবেন না, আজই আপনার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দেবো। এখন যাই, একটু থানায় যেতে হবে।'

'আমি আসবো সঙ্গে?'

'না, দরকার হবে না। পুলিস আসবে না আপনার এখানে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করুন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোবেন না আজ।'

শহীদ আর কামাল বেরিয়ে গেল। শহীদের কপালে চিন্তার রেখা। থানার দিকে এগোলো ওরা।

বার

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটা। জ্ঞান ফিরে পেলেন হেকমত আলী। কেমন যেন ঘোলা লাগছে সব কিছু। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়লো তাঁর। একটা খশ্ খশ্ শব্দ শুনে জেগে যান তিনি। প্রায় সারারাত জেগে থেকে কাশেন, তাই ঘুম অত্যন্ত পাতলা তাঁর। জেগে গিয়ে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

একটা রুমাল দিয়ে তার নাক মুখ চেপে ধরলো যেন কে। একটু ধস্তাধস্তি করেন হেকমত আলী। তাঁর দুর্বল শরীর নির্জীব হয়ে আসে। একটা মিষ্টি গন্ধ, কেমন আবেশ মাখানো। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে গেল তাঁর। আর কিছুই মনে পড়ছে না।

ঐতো! সেই কালো মূর্তিটা—রাতে যার সাথে ধস্তাধস্তি করেছেন হেকমত আলী। উঠে বসবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। খাটের সাথে তাঁকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। একটা ভেন্টিলেটার দিয়ে সামান্য আলো আসছে সেই ঘরে—সেদিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এখন দিন। একটা অন্ধকার ঘরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।

ততক্ষণে মূর্তিটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমাকে কেন আটকে রেখেছো? আমার টাকা পয়সা নেই, রুগী মানুষ, ছেড়ে দাও

আমাকে।'

'টাকা পয়সা আমার অনেক আছে, হেকমত সাহেব। আপনার কাছে চাই না।'

'তবে? আর কি চাও আমার কাছে?'

ঘরের মধ্যে বাতি জ্বলে উঠলো। কালো আলখেল্লা পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। কেমন যেন চেনা ঠেকছে চেহারাটা। লোকটা বললো, 'আপাততঃ আপনার জ্ঞান ফিরে আসাটা চাইছিলাম।'

ঘরের এক কোণে আর একজন লোককে দেখা গেল। নিকষ কালো তার গায়ের রঙ। একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরনে। খুব রোগা লোকটা। একটা টেবিলের ওপর নানান আকারের কতগুলো যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখছিল সে। আলখেল্লা পরা লোকটার দিকে ফিরে বললো, 'সব ঠিক আছে, হুজুর। মাইক্রোস্কোপটা আমি পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসছি।'

পাশের ঘরে চলে গেল সে। আলখেল্লা পরা লোকটা এবার ঠেলা দিয়ে খাটটা টেবিলের কাছে নিয়ে গেল। খাটের পায়াতে রবারের চাকা লাগানো। নিঃশব্দে সেটা গড়িয়ে চলে এলো। একটা যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো লোকটা।

'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?' হেকমত আলী সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'করতে চাই?' যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো লোকটা টেবিলের উপর। 'অনেক কিছুই করতে চাই, হেকমত সাহেব। আজ আমার সারা জীবনের সাধনার হয় ফল লাভ করবো, নয়তো চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যাবো। আজ ছয় ঘন্টার মধ্যে আপনি হয় যক্ষ্মার হাত থেকে বেঁচে যাবেন, নয়তো মৃত্যুবরণ করবেন। ও কি, চমকে উঠবেন না। মরতে তো আপনাকে হবেই, আজ যদি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে আপনি মারা যান তাহলে কি আপনার মৃত্যু মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠবে না? আর যদি successful হই, তবে পৃথিবী থেকে ক্ষয় রোগ চিরকালের জন্যে দূর হয়ে যাবে।'

'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আরোগ্য চাই না। যে ক'টা দিন পারি, সে ক'টা দিন আমি বাঁচতে চাই।'

'আপনি চাইলেও আপনাকে ছাড়া হবে না। আমার পরীক্ষা আমি করবোই। কারও সাধ্য নেই তা ঠেকাবার! আমাকে বাধা দেবার জন্যে গুলিও ছুঁড়েছিলেন, পেরেছেন আটকাতে? এই গবেষণার জন্যে আমি কতো মানুষ খুন করেছি—ডাকাতি করে টাকা যোগাড় করেছি। এখন আপনার অনিচ্ছায় সবকিছু আমি ভেস্তে দেবো বলতে চান, হেকমত সাহেব?'

মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কালো লোকটা ফিরে এলো। সাবধানে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো যন্ত্রটা। প্যান্টের দু'পকেট থেকে দু'বোতল স্কচ হুইস্কি বের করে টেবিলের ওপর

সাজিয়ে রাখলো। আলখেল্লাধারী বললো, 'হেকমত সাহেবের গায়ের জামা সব খুলে ফেলো তো। আরে, ও কি করছো? কেবল শার্ট আর গেঞ্জি, পাজামা থাক।'

হেকমত সাহেবের গা থেকে শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেললো কালো লোকটা। সব কটা হাড় দেখা যায়। ভয়ে তাঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। টেবিলের উপর যন্ত্রটা বসিয়ে তার মুখটা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে ঠিক হেকমত আলীর বুকের দিকে ফিরিয়ে আলখেল্লাধারী একটা সুইচ টিপে দিলো। তারপর বললো, 'এখন থেকে ছ'ঘন্টা পর আমার গবেষণার ফল জানতে পারবো। আপনার শরীর খুব দুর্বল তাই খুব কম পরিমাণে sound পাঠাতে হচ্ছে। আরও তাড়াতাড়ি কাজ সারা যেতো যদি পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিলোসাইকলসে সেটা পাঠাতে পারতাম।'

হেকমত সাহেব কিছুই বুঝলেন না। কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আলখেল্লাধারী একটা বোতল তুলে নিয়ে ছিপি খুলে বেশ অনেকখানি তরল পদার্থ গলায় ঢাললো। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললো, 'বুঝতে পারছেন না? আপনি আল্ট্রা সোনিক্স সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

'নাম শুনেছি। অতি শব্দ। যে শব্দ শোনা যায় না।'

'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু হয়তো জানেন না, এই আল্ট্রা সোনিক্স দিয়ে কতো বড় বড় কাজ করা যায়। আমি এটা নিয়ে গবেষণা করেছি সুদীর্ঘ পনেরো বছর। এই যে যন্ত্রটা দেখছেন আপনার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, এটা অনবরত অতি সূক্ষ্ম শব্দ তরঙ্গ পাঠাচ্ছে আপনার বুকের দিকে। ফলে ক্ষয় রোগের যতো বীজাণু আসছে হার্টে, আর যতো বীজানু বহুদিন থেকে বাসা বেঁধেছে লাংসে, সব মারা পড়ছে। ছ'ঘন্টার মধ্যে সব মরে ভূত হয়ে যাবে, যদি আমার হিসেব ঠিক হয়ে থাকে। তারপর আপনি ভালো খাওয়া দাওয়া করলে তিন মাসের মধ্যে আবার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।'

হেকমত আলীর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ঠিকমত কিছুই চিন্তা করতে পারছেন না। বললেন, 'বুঝেছি, আপনি বৈজ্ঞানিক। আমিও সাইন্স্ পড়েছি। আমি বিজ্ঞানের মর্যাদা বুঝি। আপনার গবেষণার ফলে আমার যদি প্রাণ যায় তবু আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ থাকবে না।'

'এই তো চাই, হেকমত সাহেব।'

'বলা তো যায় না—আমি হয়তো যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। আপনি নিরাপদ হবার জন্যে আমার স্বীকারোক্তি লিখে নেন।'

'তার দরকার হবে না। প্রথম কথা, আপনি মারা যাবেন না। দ্বিতীয় কথা, যদি আপনি মারাও যান, কাল গোয়ালন্দে নদীর মধ্যে আপনার লাশ পাওয়া যাবে। এ রকম

আরও বহু লোককে আমি খুন করেছি। আমারই নাম কুয়াশা।'

কালো লোকটাকে কুয়াশা বললো, 'তুমি এখানে থাকো। উনি পানি খেতে চাইলে দিও। এখন বেলা বাজে চারটা, আমি সাড়ে নয়টায় আসবো আবার। তার মধ্যে কিছু ঘটলে তক্ষুণি আমাকে জানাবে।'

একটা বোতল টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো কুয়াশা, হেকমত আলী বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনার পরীক্ষা শেষ হবে ছ'ঘন্টা পর, তার মধ্যেই আপনি পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যাবেন।'

পুলিসের নামে চমকিত হলো কুয়াশা। বললো, 'পুলিস?'

'আপনি জানেন না, আপনাকে ধরবার জন্যে ঢাকার প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ শহীদ খান কুষ্টিয়ায় এসেছেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেল কুয়াশা। সামলে নিয়ে বললো, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'সে তো আমাদের বাসায় গিয়েছিল। সে-ই তো আমার মেয়ের কাছে একটা বন্দুক রেখে গেছিলো। আমাদের তো বন্দুক নেই। তার বন্দুক দিয়েই কাল রাতে প্রথমবার আপনাকে তাড়ানো হয়েছিল।'

'আচ্ছা! বন্দুকের রহস্য তবে এই! ভেবেই পাচ্ছিলাম না আপনাদের কাছে বন্দুক এলো কি করে। তাহলে আপনি বলতে চান শহীদ খান আমাকে চেনে? সে জানলো কি করে যে কাল আপনার বাড়িতে হানা দেবো? ব্যাপারটা ঘোরালো ঠেকছে। তবে কি ধরা পড়ে গেলাম!' স্বগতোক্তির মতো বলে কুয়াশা।

'সে এখনো আদর্শ হিন্দু হোটেলে অনাথ চক্রবর্তী নাম নিয়ে রয়েছে।'

'এ্যাঁ! কি বললেন? অনাথ চক্রবর্তী?' চমকে উঠলো কুয়াশা। কপালে অনেকগুলো কুঞ্চন রেখা পড়লো।

হেকমত আলীর চিন্তা ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে আসছে। কি বলছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না ভালো করে। একবার তাঁর মনে হলো, যা বলছেন হয়তো ঠিক হচ্ছে না বলা। আবার ভাবছেন, বলেই ফেলি, কি আর হবে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কুয়াশা এগিয়ে এলো। আপনার কষ্ট হচ্ছে? মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কেন?

'কি জানি। কেমন যেন লাগছে। কিছুই ভাবতে পারছি না। একটু পানি!'

লোকটাকে ইশারা করতেই সে এক গ্লাস পানি আনতে গেল। যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলো কুয়াশা। পানি খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে চিৎকার করে উঠলেন হেকমত আলী, 'ছেড়ে দাও আমাকে। আর কষ্ট দিয়ো না।'

কুয়াশা মুচকে হাসলো, 'তারপর যন্ত্রটা আবার চালু করে দিলো।'

'আপনি পালিয়ে যান বৈজ্ঞানিক। শহীদ খান আপনাকে ধরবে।'

'সে চেনে আমাকে? আমিই যে কুয়াশা তা সে জানে?'

'হ্যাঁ, বলেছিল তো চেনে, কেবল প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছে না।' শান্ত গলা হেকমত আলীর।

'তার সাধ্য নেই এইখানে আসবার। কালু তুই এই যন্ত্রটা নিয়ে ছাতে চলে যা। কেউ বাড়ির ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করলেই এই বোতাম টিপবি। আজ দরকার হলে আমি হাজার হাজার মানুষ খুন করবো, তবু আমার গবেষণা রেখে পালিয়ে যাবো না।'

হেকমত সাহেব ঝিমিয়ে এসেছেন। তাঁকে দিয়ে এখন যা খুশি বলিয়ে নেয়া যায়। কুয়াশা হাসে। ভাবে, আর কিছু না হোক, এ যন্ত্র দিয়ে আসামীর স্বীকারোক্তি বের করা যাবে। পৃথিবীকে সে কতো বড় একটা জিনিস দান করছে, অথচ পৃথিবীর মানুষই তাকে বাধা দেয়ার জন্যে কেমন আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

'শহীদের সাথে আর কে আছে, হেকমত সাহেব?' কুয়াশা জিজ্ঞেস করে।

'তার বন্ধু কামাল আহমেদ। সে অবিনাশ সেরেস্তাদার নাম নিয়ে ওর সাথে আছে।'

কুয়াশা বুঝলো হেকমত আলী ভুল বকছেন না। প্রকৃতিস্থ তিনি সত্যিই নেই—কিন্তু যা বলছেন তা সত্য। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সত্যি কথা বলছেন তিনি।

একটা রাইটিং প্যাড নিয়ে এসে টেবিলে বসে কি সব লিখতে আরম্ভ করলো কুয়াশা। হেকমত আলী চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। কয়েক ঢোক মদ খেয়ে নেয় কুয়াশা।

দু'ঘন্টা পর চোখ খুলে পানি চাইলেন হেকমত আলী। যন্ত্র বন্ধ করে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলো কুয়াশা তাঁর গলায়।

'আমাকে মেরে ফেলো। আর পারি না। আমাকে মেরে ফেলো।'

আবার শুরু হলো শব্দ-তরঙ্গ। ঝিমিয়ে এলেন হেকমত আলী। কুয়াশা লিখে চলেছে একমনে। মাঝে মাঝে কলম উঁচু করে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবছে।

তেরো

রাত সাড়ে নয়টা। দোতলা একটা বাড়ির চারদিকে অনেকগুলো একশো পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। ছাতের উপর একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার হাতে কিসের একটা বাক্স। ছাতের কার্নিশ ধরে অনবরত ঘুরে চলেছে লোকটা বাড়িটার চারদিকে দেয়ালের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে। চারজন কনেস্টবল, একজন দারোগা, শহীদ আর কামাল এগিয়ে আসছে বাড়িটার দিকে। দূর থেকেই শহীদের নজর গেল ছাতের ওপর। থেমে গেল সে।

'ঐ দেখুন, ছাতের ওপর যন্ত্র হাতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে একজন লোক।'

'এখান থেকে গুলি করি,' বললেন দারোগা সাহেব।

'না, ও এখনও টের পায়নি। গুলি মিস করলে এক সেকেণ্ডে আল্লার কাছে চলে যাবো আমরা।'

'আমার গুলি কোনদিন মিস হয় না।' দারোগা রিভলবার তুললেন।

'আহ! পাগলামি করবেন না, দারোগা সাহেব। আরও যন্ত্র এবং আরও লোক নেই তা কে বললো আপনাকে? আপনার দোষে কুয়াশাকে তো হারাবই, প্রাণটাও যাবে। আমার কথা শুনুন। যতক্ষণ না বাড়ির ভেতর ঢুকবার চেষ্টা করছি আমরা ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। আমরা কেউ তো ইউনিফর্ম্ পরে নেই। আমি আর কামাল বাড়িটার পেছন দিকে চলে যাই। আপনারা সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকুন। লোকটার দৃষ্টি যখন আপনাদের দিকে যাবে তখন ও সেদিকেই নজর রাখবে বেশি। আমরা সেই সুযোগে পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকবো।'

দু'দলে ভাগ হয়ে গেল তারা। শহীদ আর কামাল অনেকটা ঘুরে জঙ্গল আর আবর্জনা পেরিয়ে বাড়িটার পিছনে গিয়ে উপস্থিত হলো। পাঁচিলটা বেশ উঁচু। একজনের পক্ষে খালি হাতে বেয়ে ওঠা অসম্ভব। কামালের কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালের উপরটা ধরলো শহীদ, তারপর এক হাত দিয়ে কামালকে টেনে তুললো। দু'জনে হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ঝুলে রয়েছে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দেখে শহীদ লোকটা ঘুরেই চলছে অনবরত। এক জায়গায় গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার আধ মিনিট পর সম্পূর্ণ ছাতটা ঘুরে আসে। কিন্তু এই আধ মিনিটের মধ্যে দেয়াল টপ্‌কে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়ানো অসম্ভব—মাঝের জায়গাটা বেশ বড়, ধরা পড়ে যাবে।

হাতটা ব্যথা হয়ে আসে কামালের। এবার আধ মিনিট পার হয়ে গেল, লোকটা আসছে না। প্রায় মিনিট দুয়েক পর এসে ঘুরে গেল। অমনি শহীদ দেয়াল টপ্‌কে ওপাশে লাফিয়ে পড়লো। কামালও এলো। শহীদ বললো, 'আমার পেছন পেছন দৌড় দে।' প্রাণপণে ছুটলো দু'জন বাড়িটার দিকে। বেশ বড় কম্পাউণ্ড। মাঠ পার হয়ে বাড়িটার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ওরা। ফিস্‌ফিস্ করে শহীদ বললো, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। ব্যাটা এখন পুলিসদের ওপর খুব কড়া নজর রাখছে।'

বাড়িটার মধ্যে কোনও প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল না। অতি সন্তর্পণে নিঝুম বাড়ির ছাতের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। সিঁড়িটা অন্ধকার। পা টিপে টিপে শহীদ আর কামাল উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। লোকটাকে দেখা গেল। ব্যস্ত পদে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাতের উপর বাক্স হাতে। বাড়ির সামনের দিকটায় তার নজর বেশি। সামনের দিকে ঝুঁকে

মাঝে মাঝে কি যেন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখছে ও। এই যে, চারদিকটা একবার ঘুরে এসে আবার ঝুঁকলো লোকটা। কামালের গা টিপে তাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে ইশারা করে শহীদ বাঘের মতো দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে গেল তার দিকে। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেই ঘুরেছে অমনি প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত এসে পড়লো তার নাকের উপর। চারদিকে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো লোকটা। এবার একটু পিছিয়ে এসে স্টেপ নিয়ে একটা পুরো নক্-আউট পাঞ্চ কষালো শহীদ। ঘুরে পড়ে গেল লোকটা। ঠক্ করে যন্ত্রটা তার হাত থেকে ছিটকে নিচে পড়লো।

কামাল এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। একটা রুমাল লোকটার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সিল্কের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো তাকে কামাল। লোকটাকে সেইখানেই ফেলে রেখে কামাল আর শহীদ সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো আবার।

দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। কুয়াশা কলম বন্ধ করে ঘড়ির দিকে চাইলো। হেকমত আলীর পাশে এসে দাঁড়ালো সে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গবেষণার ফল জানতে পারা যাবে। দীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম। হয় আজ সাফল্য, নয় পরাজয়।

ঠিক দশটার সময়ে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলো সে। অল্প অল্প করে বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ালো হেকমত আলীকে। তারপর বাঁধন খুলে দিলো তাঁর। খুব সাবধানে উঠিয়ে বসালো তাঁকে। বললো, 'একটু কেশে খানিকটা কফ বের করুন তো হেকমত সাহেব। হ্যাঁ, এই কাঁচটার ওপর ফেলুন। এবার শুয়ে পড়ুন।'

মাইক্রোস্কোপের কাছে সরে এলো কুয়াশা। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'ইউরেকা, ইউরেকা! Successful!'

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কুয়াশার মুখ। হেকমত আলীর দিকে ফিরে বললো, 'আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হেকমত সাহেব। এখনও আপনার লাংসে কিছু ক্ষত আছে, তবে সেটা সেরে যেতে পনেরো দিনের বেশি লাগবে না। আপনি বাড়ি ফিরে আপনার সব পুরনো জামা কাপড় পুড়িয়ে ফেলবেন। নইলে আবার ধরবার সম্ভাবনা আছে। একটু ভালো diet খেলে তিনমাসের মধ্যে আপনি আপনার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। আপনার শরীরে এখন একটিও জীবিত যক্ষ্মা বীজাণু নেই, হেকমত সাহেব।'

ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন হেকমত সাহেব। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'মেরে ফেলো আমাকে। আর কষ্ট দিও না! মেরে ফেলো, তোমার পায়ে পড়ি মেরে ফেলো!'

চমকে ফিরে তাকায় কুয়াশা। হেকমত আলীর চোখ দু'টো রক্ত জবার মতো লাল

টক্‌টকে। পাগল হয়ে গিয়েছেন হেকমত আলী। চিৎকার করে বললেন, 'পানি, পানি দাও।'

কয়েক চামচ ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলো কুয়াশা তাঁর গলায়।

'মেরে ফেলো! উঃ! তোমার পায়ে পড়ি মেরে ফেলো।' আবার চিৎকার।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে কুয়াশা। টেবিলের উপর কনুই রেখে কপালের দু'ধার টিপে ধরে সে। আর অপেক্ষা করা চলে না। শহীদ খান এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টায় ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে গেছে। এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। কিন্তু, একী, এতো বড় পাষণ্ড, তার চোখে জল! হেকমত সাহেবের দিকে ফিরে কুয়াশা বললো, 'আমি চললাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি নিজ হাতে আপনার এই দশা করলাম। উঃ!' তার গলা ভেঙে আসে।

'যাওয়ার আগে আমাকে খুন করে যাও! আর পারি না! পায়ে পড়ি তোমার!'

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে কুয়াশা। তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।

ঠিক এমনি সময় শহীদ আর কামাল এসে ঢুকলো ঘরে। দু'জনের হাতেই উদ্যত রিভলবার।

'মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও, কুয়াশা।'

চমকে উঠলো কুয়াশা। তারপর বিদ্যুৎগতিতে টেবিলের উপর থেকে যন্ত্রটা তুলে নিলো হাতে। সাথে সাথেই গর্জে উঠলো শহীদের রিভলবার। ক্যামেরার চোখের মতো একটা চোখ ছিলো যন্ত্রটার। সেই কাঁচের চোখটা গুঁড়ো ক'রে দিয়ে শহীদের অব্যর্থ বুলেট প্রবেশ করলো যন্ত্রটার মধ্যে। ঝন্‌ ঝন্‌ করে একটা শব্দ হলো। বিকল হয়ে গেল যন্ত্র!

'করলে কি শহীদ! আমার সারা জীবনের সাধনা নষ্ট করে দিলে!' বিকৃত হয়ে গেল কুয়াশার মুখ। গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো তাতে। আরো কি যেন বলতে চেষ্টা করলো কুয়াশা; তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কেবল ঠোঁট নড়লো, কথা বেরোলো না।

এমন সময় পিছন থেকে বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ এলো, 'হ্যাণ্ডস আপ্‌!'

ঘুরে দাঁড়ালো ওরা দুজন। সামনে কেউ নেই। আবার আওয়াজ এলো, 'হাত থেকে রিভলব্যর ফেলে দাও, নইলে খুলি ফুটো করে দেবো। আমি দরজার আড়ালেই রয়েছি!'

দু'জনেই ফেলে দিলো রিভলবার।

'এবার মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

শহীদ, কামাল মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ালো। একমিনিট, দুইমিনিট। চুপচাপ

দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কেউ আসে না আর সামনে। কোনো কথাও নেই। ওরা পরস্পরের দিকে ফিরে তাকালো। শহীদ পিছন ফিরে দেখলো কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেছে পিছন থেকে। মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল শহীদের কাছে। মাটি থেকে রিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়ে শহীদ ছুটে গেল পাশের ঘরে। সেখানেও নেই কুয়াশা। ঘরের এক কোণে একটা গর্ত মতো জায়গা পাওয়া গেল। সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। একটা চৌকোণা পাথর চাপা ছিলো গর্তের মুখে। পাথরটা এখন সরানো।

নেমে গেল শহীদ সিঁড়ি বেয়ে। কামালও নামলো পিছন পিছন। ঘন অন্ধকার ভিতরে। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। সাবধানে যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে শহীদ হোঁচট খেলো। সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে সে টের পায়নি। সামলে নিয়ে চারদিকে হাত বাড়ালো শহীদ। একটা দিক ছাড়া সব দিকই বন্ধ। এগিয়ে গেল শহীদ খোলা পথটা ধরে। পুরো পাঁচ মিনিট চলার পর পথটা শেষ হলো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা পাথর ঠেকলো হাতে। বেশ ভারি পাথর। প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলা দিয়ে পাথরটা সরিয়ে ফেললো শহীদ। লাফিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। খোলা আকাশ, তারা মিটমিট করছে। সামনে গড়াই নদী। একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে ঘাট থেকে বেশ অনেকটা দূরে। হঠাৎ শহীদের খুব কাছে থেকে শব্দ এলো, 'শহীদ খান, আমার সারা জীবনের সাধনা তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। প্রস্তুত থেকো, আমি নির্মম প্রতিশোধ নেবো।'

কামাল চারদিকে তাকাচ্ছে, কে কথা বলে? শহীদ বললো, 'কাকে খুঁজছিস কামাল? কুয়াশা এখন লঞ্চের মধ্যে।'

বলতে না বলতেই মৃদু গর্জন করে লঞ্চ স্টার্ট দিলো। চলতে আরম্ভ করেছে লঞ্চটা। কামাল রিভলবার ছুঁড়লো লঞ্চ লক্ষ্য করে। দূর থেকে একটা অট্টহাসি শোনা গেল। অনেকক্ষণ ধরে সে হাসি নদীর পারের বাড়িগুলোতে প্রতিধ্বনি তুললো। শহীদ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। পাশ থেকে কে বলে উঠলো, 'পালিয়ে গেল, না?'

শহীদ চেয়ে দেখলো দারোগা সাহেব কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আবার তারা তিনজন সুড়ঙ্গ দিয়ে ফিরে এলো কুয়াশার পরিত্যক্ত বাড়িতে। হেকমত আলী তেমনি শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়ে থাকেন, তারপর হঠাৎ চমকে ওঠেন আতঙ্কিত হয়ে। চিৎকার করে ওঠেন, 'মেরে ফেলো! পায়ে পড়ি, মেরে ফেলো!'

ঘরের মধ্যে কুয়াশার যন্ত্রটা পড়ে আছে। আরও কয়েকটা অদ্ভুত আকারের যন্ত্র টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের উপর একটা প্যাডের দিকে শহীদের নজর গেল। একটা চিঠি লেখা রয়েছে। সম্বোধনটা পড়ে আশ্চর্য হোলো শহীদ, তাকেই লেখা। দারোগা সাহেবের দিকে তাকিয়ে শহীদ বললো, 'তিনতলার উপর একজন লোক হাত পা বাঁধা

অবস্থায় পড়ে আছে। তাকে হাজতে পাঠিয়ে দিন। আর হেকমত আলী সাহেবকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে শহীদঃ

'শহীদ খান,

তুমি যখন এ ঘরে উপস্থিত হবে তখন আমি বহুদূরে। আজ আমার শেষ পরীক্ষা। যদি সফল হই, পৃথিবী আমায় পুজো করবে। আর যদি সফল হতে না পারি, চিরকালের জন্যে আমার প্রতিভার পরিসমাপ্তি ঘটবে। সে ক্ষেত্রেও আমায় চলে যেতে হবে এখান থেকে। কারণ, তুমি আমায় চিনে ফেলেছো।

তোমায় আমি বন্ধু হিসেবে নিয়েছিলাম—সত্যিই তুমি তার যোগ্য। পৃথিবীতে কেউ যদি আমায় বুঝে থাকে, সে হচ্ছো তুমি। কার্ল ব্র্যাণ্ডেনবার্গও আমাকে বোঝেননি। আমি তাঁরই হাতে মানুষ, তিনিই আমাকে সবরকম শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যেদিন তিনি আমায় জোর করে জার্মানীতে আটকে রেখে আমার গবেষণার ফল ভোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেদিন তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করতে আমার কিছুমাত্র বাধেনি। আমি বাঙালী। আমি বাঙলা থেকে আমার পরীক্ষার ফল পৃথিবীকে জানাবো। জার্মানী থেকে পালিয়ে আসতে হয় আমাকে পুলিসের ভয়ে। কিন্তু এ দেশে এসে কি পেলাম? পুলিসের তাড়া। কিন্তু তোমার কাছ থেকেও কি আমি সহানুভূতি আশা করতে পারি না? পারি না একটু মায়া, একটু ভালবাসার দাবি করতে?

আরও আগে থেকে বলি, নইলে ভালো করে বুঝতে পারবে না।

আমার academic qualification-এর কথা শুনলে আশ্চর্য হবে। আমি ম্যাট্রিক পাস। ছোটকাল থেকেই আমার সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিলো। একটা সারোদ কিনেছিলাম। বাবাই কিনে দিয়েছিলেন। পড়াশোনাতে আমি খুবই ভালো ছিলাম। কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করবার পর আমি সরোদ নিয়েই অতিরিক্ত মেতে উঠি। ফলে I. S. C.-তে ফেল করলাম। বাবা খুবই আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই বলেননি আমায়। আমি তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। একটা তারে টোকা দিলে একটা সুর বাজে, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। আমার চিন্তা হলো, মিলিয়ে যায় কোথায়? জানতাম সেকেণ্ডে কতবার থেকে কতবার কাঁপলে তারের শব্দ মানুষ শুনতে পায়। কিন্তু তার বেশি বা কম যদি কাঁপে? তাহলে? শোনা না গেলেও তো সে কাঁপন বাতাসে থেকে যায়। জানবার খুব আগ্রহ হলো। ঠিক এই সময়ে একটা বই পেয়ে গেলাম আলট্রা সোনিক্স সম্বন্ধে। সেটা পড়ে আগ্রহ আরও বাড়লো। আরও কতগুলো কিনলাম। এদিকে বাবা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছেন। শেষে যখন পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে আলট্রা

সোনিক্সের experiment শুরু করলাম, তখন একদিন ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাবা। আমি বাবার দোষ দিই না। তিনি অনেক সহ্য করেছিলেন।

আমি কলকাতায় চলে গেলাম। খেয়ে না খেয়ে দু'বছর সেখানে কাটালাম। কার্ল ব্যাণ্ডেনবার্গ নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক তখন কলকাতায় এসেছিলেন ইউনিভারসিটির আমন্ত্রণে। আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি বৈজ্ঞানিক, আপনি আমার ব্যাকুলতা বুঝবেন, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" আমি তাঁকে impress করতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে জার্মানীতে নিয়ে গেলেন সাথে করে। সেখানে পনেরো বছর কাটিয়েছি আমি।

সতেরো আঠারো বছর বয়সে আমি বাঙলা ছেড়েছিলাম। এই কুষ্টিয়ায় আমার বাড়ি। ছোট দু'বছরের বোনটিকে খুব মনে পড়তো। ওকে দেখবার জন্য সুদূর জার্মানীতে বসে অনেক ছট্‌ফট্‌ করেছি। কতো বিনিদ্র রাত আমার কেটেছে মায়ের জন্যে বুক ভাসিয়ে কেঁদে।

যখন দেশে ফিরে এলাম তখন সকলের আগে ছুটে এলাম কুষ্টিয়ায়। মা অনেকদিন হলো মারা গেছেন। বাবা যক্ষ্মা হয়ে বিছানা ধরেছেন। ছোটো বোনটা কতবড় হয়েছে! সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে তখন মাস্টারি করছে স্কুলে, আর সেই সঙ্গে কলেজেও ভর্তি হয়েছে। তুমি ঠিকই সন্দেহ করছো শহীদ, হেকমত আলী সাহেবই আমার বাবা, মহুয়া আমার ছোটো বোন। আমিই শখ করে তার নাম রেখেছিলাম মহুয়া। আমার নাম মনসুর আলী।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম না। ঢাকায় গিয়ে আমি আমার গবেষণার জন্যে সরকারের সাহায্য চাইলাম। আমার কোনও qualification নেই। কেউ আমার কথা কানেই তুললো না। অনেক তদবির করলাম, ইউনিভারসিটিতে চেষ্টা করলাম, কোথাও কিছু হলো না। কয়েকজন ধনী লোকের কাছে গেলাম। তারা হাঁকিয়ে দিলো। তখন আমি কপর্দকশূন্য। সেই সময়ই আমি প্রথম ডাকাতি করি। তোমার হয়তো খেয়াল থাকতে পারে, আজ থেকে তিন বৎসর আগে ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকা চুরি গিয়েছিল। কি ভাবে চুরি হলো তা অনেক চেষ্টা করেও পুলিসের Intelligence Branch ধরতে পারেনি। সে টাকা আমিই চুরি করি। তারপর সে টাকা দিয়ে এখানে established হই। ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে ব্যবসায় উন্নতি করে টাকা পয়সা করে নিজের গবেষণা চালিয়ে যাবো। কিন্তু তা আর হলো না। অনেক চেষ্টা করেও আমি মহুয়াকে অর্থ সাহায্য করতে পারিনি। বড় একরোখা মেয়ে। এদিকে চিকিৎসার অভাবে বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমি দেরি করলে হয়তো তিনি আর বাঁচবেন না। তাই আমাকে যতো শিগ্‌গির সম্ভব টাকা জোগাড় করতে হয়, experiment

করবার জন্যে মানুষ খুন করতে হয়।

আজ আমার সামনে একটা খাটের উপর শুয়ে আছেন আমার বাবা। আর কিছুক্ষণ পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। তারপর আমি চলে যাবো অনেক দূরে। কোনদিন বাবার কাছে নিজের পরিচয় দেবো না—তাঁর যে ছেলেকে তিনি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন একদিন, সে মরে গেছে, কোনও দিন আর ফিরে আসবে না। আমার বুঝি অভিমান নেই?

কিন্তু বলিহারী তোমার বুদ্ধিকে। তোমায় এক ফোঁটাও সন্দেহ করতে পারিনি আমি। অথচ তুমি দিনের পর দিন আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছো। এখন মনে পড়ছে, আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে কতকগুলো ঠিকানা লিখে দিয়েছি। উহ্, কি বোকা আমি! আমি প্রত্যেকদিন টেলিগ্রাম পেয়েছি আমার লোক মারফত গোয়ালন্দ থেকে, **they are here.**

আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। যে ক'দিন তুমি আমাকে তোমার বন্ধুত্ব উপহার দিয়েছিলে তার জন্যে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমায় বন্ধু বলে স্বীকার করেছি বলেই অনাথ চক্রবর্তী আমার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আমি বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছি। তুমি না হয়ে যদি আর কেউ হতো, তার কাছে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে নায়েব এসেছে জানতে পারলে আমি সে টাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে কসুর করতাম না। আমি তোমায় চিরকাল বন্ধু বলেই জানবো। আমার পেছনে অনেক ঘুরেও শেষ পর্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তুমি।

বিদায় বন্ধু! আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না কোনও দিন। আমার বাজনাও আর শুনতে পাবে না তুমি। আমার ছন্নছাড়া জীবনে একজনই পেয়েছিলাম, তাকেও বাধ্য হয়ে হারাতে হচ্ছে আজ।

কুয়াশা।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো শহীদ। দারোগা সাহেব এসে ঢুকলেন ঘরে। বললেন, 'ব্যাটাকে হাতকড়া পরিয়ে দু'জন পুলিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম হাজতে। এখন ঘোড়াগাড়ির জন্যে লোক পাঠিয়েছি। গাড়ি এলে হেকমত সাহেবকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি।'

'আমরাও যাবো আপনার সাথে। পথে একজন ভালো ডাক্তারকে তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

চোদ্দ

হেকমত আলীর বাসা। রাত প্রায় এগারোটা। হেকমত আলীকে কিছুক্ষণ হলো নিয়ে এসেছে শহীদরা। তাঁর ঘরে ডাক্তার বসে রয়েছেন। কামাল, শহীদ, আর দারোগা সাহেব বৈঠকখানায় বসে আছে। ঘরটায় আসবাবপত্র একেবারেই নেই। শুধু একটা কাঠের খট্‌খটে চারকোণা টেবিল আর তার চারধারে কতগুলো চেয়ার।

'আপনি চললেন, দারোগা সাহেব?' শহীদ জিজ্ঞেস করলো।

'না। ডাক্তার যখন বলছে অবস্থা খারাপ, তখন দেখেই যাই কি হয়। সারাদিন ধকল গেছে—আর একটু না হয় সহ্য করি।'

মহুয়া এসে দাঁড়ালো। সে একবার বাবার পাশে যাচ্ছে। আবার বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াচ্ছে। সে বললো, 'আপনারা কেউ এখন যাবেন না কিন্তু, পানি চড়িয়ে দিয়েছি, চা খেয়ে তারপর যাবেন।'

'তুমি এতো রাতে আবার কষ্ট করতে গেলে কেন মহুয়া।' শহীদ বলে।

'আপনারা কতো বিপদ মাথায় নিয়ে, কতো কষ্ট করে বাবাকে উদ্ধার করে আনলেন, আর আমাকে সামান্য চা করবার কষ্টও সহ্য করতে দেবেন না?' মিষ্টি গলায় বলে মহুয়া।

এমন সময় একজন বেঁটে, গাঁট্টা গোঁট্টা লোক এসে ঢুকলো ঘরে। পরনে কালো স্যুট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, হাতে একটা বর্মা চুরুট। ঘরে ঢুকেই সে বললো, 'আমার জন্যেও এক কাপ, মিস মহুয়া।'

সবাই তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো। সে হঠাৎ মাথার টুপি খুলে মাথাটা সামনে ঝুঁকালো। মুহূর্তে শহীদ, কামাল আর মহুয়া তাকে চিনতে পারলো। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কালকের সেই লোকটা।

'বসুন, মি. জাকারিয়া।' শহীদ সহাস্যে বলে। জাকারিয়াও একটু হেসে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

'আমি আপনাদের খোঁজে হোটেলে গিয়েছিলাম। আপনার চাকর বললো আপনারা এ বাড়িতে। তাই সটান চলে এলাম। আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে, সেগুলোর উত্তর আপনার কাছ থেকে জেনে না নিলে কিছুতেই শান্তি হচ্ছে না।'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'মেরে ফেলো, পায়ে পড়ি, আমায় মেরে ফেলো।...'

চমকে উঠে জাকারিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কে, কে চিৎকার করে?'

দারোগা সাহেব তার কানে কানে বললো, 'হেকমত আলী পাগল হয়ে গেছেন, বোধহয় বাঁচবেন না।'

'কেন? হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

দারোগা সাহেব সংক্ষেপে বললো ওকে সেদিনকার সব ঘটনা। শহীদ সব শেষে বললো হেকমত আলীর পাগল হওয়ার কথা।

'So sad!' চুরুটে টান দেয় জাকারিয়া। তাহলে আসল culprit পালিয়েছে। আপনিও পেলেন না শহীদ সাহেব, আমিও পেলাম না,' মুচকে হাসে সে।

'আচ্ছা, মিঃ জাকারিয়া, আপনি কেন মিছিমিছি আমার পেছনে লেগেছিলেন বলুন তো?'

'আমি রাজবাড়ীর সরকারী গোয়েন্দা। এই কেসটার investigation আমিই করছিলাম।'

বাধা দিয়ে শহীদ বললো, 'সে সব জানি। আপনি বলুন পৃথিবীতে এতো মন্দ লোক থাকতে আমাকে আপনার সন্দেহ হলো কেন?'

চুরুটে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়ে জাকারিয়া বললো, 'গোয়ালন্দ থেকে একটা বাক্সর লাশ এলো রাজবাড়ীতে। কিন্তু পাহারাদার পুলিসের একজন চুপিচুপি একটা বাক্স স্টেশন মাস্টারের ঘরে রেখে এলো তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তারপর দেখলাম, হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে সে পুলিসের কি গল্প। একবার লাশটা ওজন করে, একবার পাথরটা ওজন করে! খুব সন্দেহ হলো আমার। পরে যখন পুলিসটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করলো তখন আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে পুলিসটার পরিচয় জানবার দাবি করলাম। তিনি সোজা আমাকে খেদিয়ে দিলেন। বললেন যে তিনি চেনেন না পুলিসটাকে, তার সাথে একটা কথাও বলেননি তিনি। আমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিসে ফোন করবেন।

'অগত্যা আমি স্টেশনে গেলাম। দেখি বাক্সটা নিয়ে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকলো পুলিসটা। কিছুক্ষণ পর দেখি একজন প্রৌঢ় হিন্দু ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো ওয়েটিং রুম থেকে। তারপর কুলি ডেকে সেই বাক্সটা গাড়িতে ওঠালো। আমি চট্ করে ওয়েটিং রুমের ভেতরটা এক চক্কর দেখে এলাম, কোনও পুলিসের পাত্তা নেই। অতএব সন্দেহ দৃঢ়তর হলো। বুঝলাম হয় এই ব্যাটাই খুনী। নয় খুনীর নিযুক্ত কর্মচারী। ডাক্তারের সঙ্গে এদের সায় আছে।

'ব্যস্ পিছুন ধরলাম। তারপর কুষ্টিয়ায় এসে সন্দেহ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছি না। একদিন হোটেলে হানা দিয়ে পরচুলা, পেইন্ট সব

দেখে এলাম। বুঝতে পারছেন না, আমি over sure, এই ব্যাটা খুনী না হয়ে যায় না।'

খুব একচোট হাসলো জাকারিয়া। তারপর নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলো।

মহুয়া চা নিয়ে এলো। চায়ে এক চুমুক দিয়ে কামাল শহীদকে বললো, 'আমার কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে খট্‌কা আছে। এখন একটু পরিষ্কার করে দে তো ভাই। তুই জানলি কি করে কুষ্টিয়াতেই কুয়াশা রয়েছে? রফিক সাহেবকে তোর সন্দেহ হলো কি করে? এই বাড়িতে কাল কুয়াশা আসবে কি করে বুঝলি?'

মহুয়া শুনবার জন্যে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। শহীদ একটা সিগারেট ধরালো, দারোগা সাহেবের দিকে প্যাকেট বাড়ালো। তিনি খান না। কামাল একটা তুলে নিলো।

'রাজবাড়ীতে সত্যিই আমি পাথর ও লাশ ওজন করেছিলাম। ছেলেটির স্বাস্থ্য যে রকম, তাতে তার স্বাভাবিক ওজন কতো ছিলো তা ডাক্তার আন্দাজ করে বলেছিলেন। আমি অঙ্ক কষে বের করলাম পাথরটা নিয়ে ভেসে উঠতে লাশের কতখানি ফুলতে হয়েছিল, অর্থাৎ ছেলেটির ভাসবার ক্ষমতা কতখানি হয়েছিল। নদীর কারেন্ট ঘন্টায় কয় মাইল, স্টীমারে জেনে নিয়েছিলাম। খুব সহজেই বেরিয়ে পড়লো গোয়ালন্দের কতখানি উজানে লাশ জলে ফেলা হয়েছিল। একটু অঙ্ক জানলেই তা বের করা যায়। তারপর হাসপাতাল থেকে গোয়ালন্দ স্টীমার ঘাটে ফোন করে জানলাম সেখান থেকে উত্তরে নদীপথে বিশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে কেবল একটাই শহর আছে। সেটা কুষ্টিয়া। অতএব আমি সোজা কুষ্টিয়ার টিকিট কাটলাম।

'আমি হাসপাতাল থেকে স্টেশনে যাবার পথেই ভেবে নিয়েছিলাম। খুনী নিশ্চয়ই নদীর পারে থাকে। তার কারণ সেখান থেকে লাশ নদীতে ভাসানোর সুবিধা। তাছাড় আমি জানতাম হয় খুনীর একটা লঞ্চ আছে, নয় সে আর কারও লঞ্চ ব্যবহার করে। কারণ মানুষ চুরির তিনদিন পর খবরের কাগজে গোয়ালন্দে লাশ প্রাপ্তির খবর বেরোয়। কিন্তু ঢাকা থেকে রাতের বেলা মানুষ চুরি যায়; রাতে স্টীমার নেই। বেলা দু'টোর সময় রওনা হয়ে কুষ্টিয়া পৌঁছে বেলা দশটার দিকে; দিনের বেলা লাশ জলে ফেলা সম্ভব না রাতের বেলা ফেলতে হয়। তারপর ধরো ছ'সাত ঘন্টা মানুষের উপর experiment করা হলো; লাশ গোয়ালন্দে পৌঁছতে একদিন লাগে। খবরের কাগজে খবর ছাপাতে একদিন লাগে, কারণ কাগজে সবসময় একদিন আগের ঘটনা বেরোয়। সেদিনের ঘটনা বেরোয় না। সুতরাং খেয়াল করে দেখো, দিন অনেক বেশি লেগে যাচ্ছে। তাছাড়া স্টীমারে আনতে অনেক অসুবিধাও আছে। অতএব সে একটা লঞ্চে করে এসে মানুষ আর টাকা পয়সা চুরি করে সেই রাতেই রওনা হয়ে যায় কুষ্টিয়ার দিকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। লঞ্চে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া আসতে দশ বারো ঘন্টার বেশি লাগে না।

আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম—কুয়াশাকে আমি খুঁজে বের করতে পারবই। মফঃস্বল টাউনে শতো শতো লঞ্চের মালিক থাকতে পারে না। তাই আমি নদীর পাড়ের আদর্শ হিন্দু হোটেলে হিন্দু সেজে উঠলাম। আমি কেবল চাইছিলাম, আমাকে যেন কুয়াশা খুঁজে বের করতে না পারে। তাই আমি তোকে নির্দেশ দিয়েছিলাম গফুরকে আমার মতো করে সাজিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে। আমি জানতাম তোরা একটু সাবধান হলেই কুয়াশার স্পাই বুঝতে পারবে না গফুরের ছদ্মবেশ। কারণ ও লোকটা সত্যিই ছিলো কিছু বোকা; আমি ওকে গোয়ালন্দে যে কোনো মুহূর্তে ধরতে পারতাম। তোরাও খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলি। আমি এদিক দিয়ে নিরাপদ রইলাম।

'আমাকে কিন্তু বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। রফিকুল ইসলামের সাথে পরিচয় হয়ে গেল বাজনার ব্যাপার নিয়ে। তার একটা লঞ্চ আছে শুনে চমকে উঠলাম। কেমন সন্দেহ হলো।

'একদিন নদীর পারে বসে অনেক তত্ত্বালোচনা হচ্ছিলো। আমি হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কুয়াশা"। তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। আমার যা দেখবার দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গলায় অত্যন্ত ভাব এনে বললাম, "কুয়াশায় আমার চারিটা পাশ ঘন হয়ে আসছে, রফিক সাহেব। আমি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাই। যতো বয়স বাড়ছে ততোই আচ্ছন্ন হয়ে আসছি। বড় ভয় করে মাঝে মাঝে।"

'কুয়াশা ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে, কিন্তু সেদিন আর বেশি জমলো না। আমি হোটেলে ফিরে এসে কুয়াশার চিঠি বের করলাম; তারপর আগের দিন রফিক সাহেব আমাকে কতগুলো ঠিকানা লিখে দিয়েছিল একটা নোট বইতে, সেটা বের করলাম। মিলিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ এক। আগে আমি লক্ষ্যই করিনি রফিক সাহেবের লেখা।

'তার পরদিন gastric pain-এর অজুহাতে রাতে আর তার বাসায় যাবো না বলে দিলাম। রফিক সাহেব একমনে সরোদ বাজাচ্ছে, তখন আমি চুপি চুপি তার বাসায় ঢুকলাম। আমি বাড়ির সবকিছুই চিনতাম। সোজা দোতলায় উঠে যে অংশটা বন্ধ ছিলো তার তালায় একগোছা চাবি try করা শুরু করলাম। একটা চাবি লেগে গেল ভাগ্যক্রমে। আমার কোনও সন্দেহ নেই তখন, রফিকুল ইসলামই কুয়াশা। কিন্তু প্রমাণ কই? কোনও প্রমাণ ছিলো না আমার হাতে। যে সব যন্ত্রপাতি সেই ঘরে ছিলো তাতে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। একটা দেরাজের মধ্যে অনেকগুলো টেলিগ্রাম পেলাম। সবগুলোতে লেখা THEY ARE HERE. সব ক'টা গোয়ালন্দ থেকে করা। দেরাজের মধ্যে ডায়রী পেলাম একটা। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। তার থেকেই জানতে পারি কুয়াশার পরবর্তী শিকার কে।

'আর দিনক্ষণ বুঝতে পারি গতকাল। সন্ধ্যায় টেলিগ্রামটা কিছুক্ষণের জন্যে ফেলে

গেছিলো রফিকুল ইসলাম আমার ঘরে টেবিলের উপর। আমি চুরি করে সেটা পড়লাম। তাতে লেখা THEY ARE LOST.

'আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কুয়াশার লোক গফুর আর তোর ওপর কড়া নজর রেখেছিল। সে গফুরের ছদ্মবেশ ধরতে না পেরে, মনে করেছিল আমি আর তুই গোয়ালন্দে আছি। বেচারার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যখন তোরা চলে এলি তখন সে মনিবের কাছে টেলিগ্রাম করলো THEY ARE LOST.

'আমি বুঝলাম, নিশ্চয় কুয়াশা চিন্তায় পড়ে গেছে। সে শহীদ খানকে ভয় করতো দস্তুর মতো। সে যতো তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায় তারই চেষ্টা করবে। আর তাই হয়েছিল দেখতে পেয়েছিস।'

শহীদ থামলো। দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলে সে হাঁপিয়ে গেছে।

কামাল শহীদের দিকে ফিরে বললো ,'কিন্তু আজ আমরা যখন কুয়াশাকে নিরস্ত্র অবস্থায় পেলাম, তখন আমাদের হাত তুলে দাঁড়াতে বললো কে?'

'ও নিজেই বলেছিল।'

'কিন্তু শব্দটা তো আমাদের পেছন থেকে এলো?'

শহীদ হেসে বললো, 'ওটা Ventriloquism. আমিও প্রথম বুঝতে পারিনি। আমরা ওর Ventriloquism-এর মায়াজালে পড়লাম বলেই তো ও পালাতে পারলো অমন ধোঁকা দিয়ে। Ventriloquism যে জানে সে ইচ্ছা করলে কাছ থেকেও এমন করে কথা বলতে পারে, মনে হবে যেন বহুদূর থেকে কেউ বলছে। আবার দূর থেকে বললে মনে হবে একদম কানের পাশ থেকে বলছে।'

'বড় অদ্ভুত জিনিস তো!'

জাকারিয়া চলে গেল বিদায় নিয়ে। রাত দুটো বেজে গেছে।

'জানেন শহীদ ভাই, আমার একজন বড় ভাই ছিলেন,' মহুয়া বললো।

'তাই নাকি? কোথায় তিনি?'

'আমি তাঁর কথা আর কোনদিন শুনিনি। বাবা কখনও বলেননি। বোধকরি তাঁর ওপর বাবার খুব রাগ ছিলো। আপনি যেদিন আমাদের বাসায় প্রথম এলেন কি কি সব ভৌতিক খবর নিয়ে সেদিন বাবা প্রথম বলেন তাঁর কথা। আপনার চেহারার কোথায় বলে তাঁর সাথে খুব মিল আছে। তিনি যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাহলে নাকি আপনারই মতো লম্বা চওড়া হয়েছেন।'

'তার সাথে আমার চেহারার কি মিল আছে জানি না। কিন্তু মনের মিল খুবই আছে।'

'আপনি চেনেন আমার দাদাকে?'

'হাঁ চিনি। তার নাম মনসুর আলী, ওরফে রফিকুল ইসলাম, ওরফে কুয়াশা।'

বিস্মিত মহুয়ার মুখ থেকে কেবল বেরোলো, 'কী বললেন? কুয়াশা! অবাক চোখে চেয়ে রইলো সে শহীদের মুখের পানে।

শহীদ কুয়াশার চিঠিটা মহুয়ার হাতে তুলে দিলো।

চিঠিটা পড়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো মহুয়ার চোখ থেকে।

'দাদা বললেই পারতো! পরিচয় দিলেই পারতো!' মহুয়ার চোখের জল আর বাধা মানে না। বড় সুন্দর লাগছে ওকে। শহীদ চেয়ে দেখে। এতো শক্ত মেয়েটার চোখে জল। কেমন যেন লাগে। কামাল কারও চোখের জল সহ্য করতে পারে না। তারও চোখে জল টলমল করতে লাগলো। দারোগা সাহেব খুঁটির মতো বসে আছেন শক্ত হয়ে। তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই।

হঠাৎ একজন লোক বাইরে থেকে ছুটে এসে দারোগা সাহেবের পায়ে পড়লো। সবাই চমকে তার দিকে ফিরে তাকলো। একজন পুলিশ। মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'হাজুর! ডাকু ভাগ্ গিয়া। ঠাণ্ডা মিয়া খুন হো গিয়া। হাসপিটাল মে হ্যায়। মেরা ইয়ে হালাত। নৌকরী তো নেহী যায়গী হাজুর! আপ বাঁচাইয়ে হাজুর!'

'তার কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেল তা সংক্ষেপে হচ্ছে— সে আর ঠাণ্ডা মিয়া হাতকড়া পরানো লোকটাকে নিয়ে নদীর পার ধরে থানার দিকে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একজন কালো কাপড় পরা ভীষণাকৃতি মানুষ পিছন থেকে ঠাণ্ডা মিয়ার মাথায় ডাণ্ডা মারে। ঠাণ্ডা মিয়া মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু সে লোক তাকেও প্রহার করে। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন একটা নৌকায় বন্দী লোকটাকে উঠিয়ে নিয়ে সেই 'দেও' চলে যায়। সে আরও লোকের সাহায্যে ঠাণ্ডা মিয়াকে হসপিটালে নিয়ে যায়। ঠাণ্ডা মিয়া সেখানেই মারা যায়। অনেক খুঁজে সে এখানে এসেছে সব খবর বড় সাবকে জানাতে।'

কামাল বললো, 'উঃ! কী ferocious!'

পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এলো, 'মেরে ফেলো!…'

গলাটা অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মহুয়া ছুটে গেল সে ঘরে।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শহীদ, কামাল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'Dead।'

দারোগা সাহেব চলে গেল ডাক্তারের সাথে। মৃতদেহ আগলে বসে রইলো শহীদ, কামাল আর মহুয়া।

অঝোরে কাঁদছে মহুয়া। 'আপন বলতে আমার আর কেউ রইলো না, শহীদ ভাই!' শহীদ কোনও ভাষা পায় না সান্ত্বনা দেবার। ধীরে ধীরে মহুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সে।

কুয়াশা ২

এক

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে আজ ছ' সাতদিন ধরে। শ্রাবণের মাঝামাঝি। একবার শুরু হলে আর থামতেই চায় না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। Dienfa Workshop-এ অস্টিন এইট ফিফ্‌টি গাড়িটা অয়েলিং করবার জন্যে রেখে শহীদ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। ওয়াটারপ্রুফ পরা, পায়ে গাম-বুট, মাথায় টুপি। ভিজবার কোনও ভয় নেই। বৃষ্টিটা বেশ একটু চেপে এলো। শান্তিনগরের বিরাট পিচ্ ঢালা রাস্তাটা এমনিতেই খুব নির্জন থাকে। বৃষ্টির দিন, তাই লম্বা রাস্তাটা ধরে যতদূর দেখা যায়, জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

বেশ দূরে একজন লোককে হেঁটে আসতে দেখা গেল। ভিজে আসছে লোকটা। অনেকটা কাছে আসতেই শহীদ দেখলো, নিগ্রো একজন। ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুকের ভিতরটা। গত কয়েকদিন ধরে জনকতক নিগ্রো তার ওপর নজর রাখছে। সে যেখানেই যায় ছায়ার মতো পিছু নেয় তাদের কেউ না কেউ। এ লোক তাদেরই দলের একজন।

কাছে এসে শহীদকে চিনতে পেরে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল লোকটার। একটা মিষ্টি হাসি দিলো সে। শহীদের কাছে কিন্তু হাসিটা মোটেই মিষ্টি লাগলো না। নিকষ কালো মুখে চকচকে সাদা দাঁতগুলো ওকে যেন ভেংচি কাটলো। কী বীভৎস চেহারা!

শহীদ গম্ভীর মুখে এগিয়ে যায়। পকেটের মধ্যে রিভলবারটা শক্ত করে চেপে ধরেছে সে। শহীদ ভাবে, কেন এই লোকগুলো তার পিছন ধরেছে? কী এদের উদ্দেশ্য? এমন বিকট হাসিরই বা অর্থ কি? ঢাকার বুকে হঠাৎ এতগুলো নিগ্রো কোথা থেকে এসে হাজির হলো?

দ্রুত হাঁটছে শহীদ। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চায়। না, কেউ নেই আশেপাশে। প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। সামনে একটা মাঠ আর একটা বড় দীঘি বাঁ পাশে রেখে একটা কাঁকরের সরু পথ শহীদের সুন্দর একতলা বাড়িটার গেট পর্যন্ত চলে গেছে। বৈঠকখানার কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে মহুয়া, কামাল আর লীনা বসে গল্প করছে। ওদের দেখে শহীদের বুকের ওপর থেকে একটা ভারি পাথর যেন

সরে গেল। মনটা হালকা হয়ে গেল। ডান পাশে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। জায়গাটা অন্ধকার মতো। তারপরেই কাঁকরের রাস্তায় পড়বে সে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন সাপটে ধরলো তাকে। শহীদ ছাড়াবার চেষ্টা করছে এমন সময় বাঁ পাশ থেকে প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত এসে পড়লো তার গালে। বোঁ করে ঘুরে উঠলো তার মাথাটা। কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে। সামলে নেয়ার আগেই তার পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিলো আক্রমণকারী। শহীদ ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে অনেকটা। চেয়ে দেখলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চার–পাঁচজন নিগ্রো! তাদের মধ্যে সবচাইতে লম্বা লোকটা এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো, 'Don't shout. Otherwise you dead. Comes with me.'

শহীদ চিন্তা করে দেখলো ওয়াটারপ্রুফ পরে, গাম-বুট পায়ে চার-পাঁচজন ষণ্ডামার্কা নিগ্রোর সাথে লাগতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তারা অর্ধেক তৈরি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল।

শহীদ শেষ বারের মতো তার বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলো কামাল, মহুয়া, লীনা তেমনি গল্প করছে। গফুর চা নিয়ে এসে রাখছে টেবিলের ওপর। এতো কাছে রয়েছে ওরা তবু কেউ জানছে না শহীদের এখন কতো বড় বিপদ। ক্ষোভে দুঃখে শহীদের হাসি পেলো। ইশ্! গফুর যদি একটু জানতে পারতো তার দাদামণি এখন কতো বড় বিপদে পড়েছে! গফুর আর শহীদ একসাথে থাকলে এই নিগ্রো ক'জন টের পেতো কার সাথে লাগতে গেছে ওরা।

ঘরের মধ্যে এনে শহীদকে একটা রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো ওরা। তারপর হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে নিজেদের ভাষায় কি যেন বিড়বিড় করে বলতে লাগলো। শহীদ তার একবর্ণও বুঝলো না। মিনিট কয়েক ওরা সেইভাবে অনবরত বলেই গেল। তারপর একজন উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা একটা লম্বা বাক্সের ডালা খুলে ফেললো। সেই লম্বা লোকটা এবার তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাক্সের দিকে চললো। শহীদের বুঝতে বাকি রইলো না, এবারে তাকে বাক্সে পোরা হবে।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঝড়ের মতো একটা মূর্তি ঢুকলো ঘরে। কালো আলখাল্লা পরা, মুখে মুখোশ। কেউ ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই সে পটাপট কয়েকটা ঘুসি চালিয়ে দিলো তিনজন কাফ্রির নাকের ওপর। কী প্রচণ্ড ঘুসি! যেমন বিরাট লম্বা চওড়া মূর্তি, তেমনি তার ঘুসির ওজন। নাকে হাত দিয়ে বসে পড়লো তিনজনই। সবচাইতে জোয়ান নিগ্রোটা শহীদকে ফেলে দিলো মাটিতে। তারপর ঘুসি বাগিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল মূর্তিটার দিকে। সামান্য সরে গিয়ে কি যেন একটু করলো আগন্তুক। ছিট্‌কে ওপাশের দেয়ালে অত্যন্ত জোরে ধাক্কা খেলো জোয়ান নিগ্রোটা।

মাথাটা ভীষণভাবে ঠুকে গেছে দেয়ালের গায়ে। টুঁ শব্দটি না করে সে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে। এদিকে বাকি তিনজনের একজন টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়িয়েছে। তলপেটে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে সে আবার মাটিতে ঘুরে পড়লো।

সর্দারের পকেট থেকে শহীদের রিভলভারটা বের করে নিলো আগন্তুক। এবার সে শহীদের দিকে এগিয়ে আসছে। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে শহীদের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলো। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'চলো, তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।'

শহীদ আগে আগে চলেছে, পিছনে আলখাল্লাধারী। বাড়ির কাছাকাছি এসে শহীদ বললো, 'এসো বন্ধু, আজ মহুয়ার হাতের তৈরি চা খেয়ে যাও। তোমার এই উপকারের জন্যে কী বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো ভেবেই পাচ্ছি না।'

কোনো উত্তর নেই। শহীদ পিছন ফিরে দেখলো কেউ নেই। তার অজান্তেই আগন্তুক কখন সরে পড়েছে।

শহীদের বুঝতে বাকি নেই, আলখাল্লাধারী কুয়াশা ছাড়া আর কেউ নয়। আর কারও এতো বড় বুকের বল নেই যে চারজন ষণ্ডামার্কা নিগ্রোর সাথে খালি হাতে একা লড়তে যাবে।

কিন্তু কুয়াশার তো তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার কথা। সে তাকে এমন অযাচিত ভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে কেন? সে তার বোনকে বিয়ে করেছে বলে? কিংবা ভালবাসা? শহীদ ঠিক বোঝে না। কুয়াশার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসে।

কিন্তু এই নিগ্রোগুলো তাকে বন্দী করেছিল কেন? ওই বাক্সেতে পুরে ওকে কি পাচার করবার মতলবে ছিলো ওরা? কিন্তু কেন? কোথায়?

নানা প্রশ্ন তার মাথায় জট পাকায়। কোনটারই সমাধান পায় না সে।

দুই

পরদিন বিকেল বেলা। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে দুই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকছে শহীদের ড্রইংরুমের খোলা জানালা দিয়ে। বৃষ্টির কণাও কিছু কিছু এসে দামী পুরু কার্পেটের খানিকটা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাতাসের ঝাপটার সাথে সাথে খুব সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণা এসে লাগছে চোখে মুখে।

লম্বা সোফাটায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে শহীদ 'সঞ্চয়িতা' পড়ছে আর মাঝে মাঝে বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে। শহীদ দেখছে ভিজছে কার্পেটটা। ভিজুক, উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছে করে না।

বাইরে রহস্যময় বিরাট বট গাছটা যেন তার মনের মধ্যে কতো কী গোপন করে

নীরবে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। যেন একটা বক। এক পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাছের অপেক্ষা করছে। না, না, বক না, একটা মস্তবড় হিংস্র জংলী হাতী। কী এক যাদুমন্ত্রে শান্ত হয়ে কেবল চেয়ে রয়েছে, আর ভিজছে।

আরও দূরে দৃষ্টি যায় শহীদের। দূরে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। একটা লম্বা বাঁশের আগায় একটা ঝাড়ু আর টুকরি বাঁধা। বৃষ্টির দিন, তাই কাজ বন্ধ। আরেকটা বাঁশের মাথায় একটা কাক বসে বসে ভিজছে।

'কি ভাবছো চুপচাপ?' মহুয়া এসে ঢুকেছে কখন ঘরে, 'আরে বেশ তো তুমি, কার্পেটটা ভিজে যাচ্ছে আর নিশ্চিন্ত শুয়ে আছো।' কাঁচের জানালা বন্ধ করে দিলো সে। তারপর কাছে এসে মাথার কাছে একটা সোফায় বসে শহীদের চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিলো।

'কামাল কই?'

'লীনাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছে।'

ওরা দুজনেই হাসলো। কামাল চিরকাল অঙ্কে লাড্ডু পেতো। লীনার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আর মাত্র একমাস বাকি। তাই কামালকে আবার শহীদের কাছ থেকে অঙ্ক শিখে নিয়ে ওকে শেখাতে হচ্ছে। কামালের সদা চিন্তিত মুখ দেখলে মনে হয় পরীক্ষা যেন ওরই।

'মুহু, কী যেন খেতে ইচ্ছে করছে!, শহীদ আবদারের সুরে বলে।

'গফুরকে বড়া ভাজতে দিয়ে এসেছি। হয়ে গেছে প্রায়।'

'না, বড়া না, কী যেন আরেকটা জিনিস!' হাত বাড়ায় শহীদ।

'ধেৎ, কেউ দেখে ফেলবে যে! এই, না, সত্যি...'

গফুর একটু কাশি দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলো। এক থালা ভর্তি বড়া। শহীদ সুবোধ বালকের মতো মিটমিট করে চেয়ে রইলো। টেবিলের ওপর থালাটা রেখে গফুর বললো, 'কামাল ভাই আর ছোটো আপাকে ডেকে দেবো দিদিমণি?'

'দাও।'

গফুর চলে গেল। একটু পরে কামাল আর লীনা এসে ঢুকলো ঘরে। বড়া দেখেই কামাল পুলকিত হয়ে উঠলো। একটা বড়া মুখে পুরে এক কামড় দিয়েই আর্তনাদ করে আবার হাতে নিলো। বড্ডো গরম!

শহীদের মাথার কাছে বন্ধ করে রাখা 'সঞ্চয়িতা' তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকলো লীনা। বোধকরি একটা কবিতা আবৃত্তি করবার ইচ্ছা আছে, ভালো কবিতা খুঁজছে। হঠাৎ একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বই থেকে বের করে শহীদকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কী দাদামণি? এটা তো এ বইয়ের মধ্যে ছিলো না?'

'ওটা বাবার একটা চিঠি। মার কাছে লেখা। আজ সকালে মার হাতবাক্স ঘাঁটতে

ঘাঁটতে পেয়ে গেলাম।' কামালের দিকে ফিরে বললো, 'এই চিঠির দু'একটা জায়গা পড়ছি। শুনে রাখ্, পরে তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে।'

শহীদ হাত বাড়িয়ে লীনার কাছ থেকে চিঠিটা নিলো। অনেক দিনের পুরনো চিঠি, কাগজটা হলদে হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় কালি চুপসে গেছে, পড়া যায় না। কিছুক্ষণ চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে শহীদ পড়তে শুরু করলোঃ

'আমাদের স্টীমার এখন তেলাগোয়া উপসাগরের মধ্য দিয়া লরেঞ্জো মারকুইসের দিকে চলিয়াছে। আগামীকাল আমরা সেখানে পৌঁছাইব।

'কতকগুলি সামুদ্রিক পাখি আজ দুপুর হইতে স্টীমারের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। এখন সূর্য অস্ত যাইতেছে। কেবল ইঞ্জিনের ধিকি ধিকি শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নাই। এই নিস্তব্ধতা বড় ভালো লাগিতেছে। ডেকের ওপর আমার পাশের চেয়ারে বসিয়া ইকবাল—সেও মুগ্ধ হইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিয়াছে। মেঘগুলি সিঁদুরের মতো লাল হইয়া গিয়াছে। তাহার ছায়া আবার জলে পড়িয়াছে; ফলে চতুর্দিকে কেবল লাল আর লাল।

'ডারব্যান হইতে কতকগুলি নিগ্রো আমাদের স্টীমারে উঠিয়াছে। আমার সহিত অত্যন্ত ভাব জমিয়া গিয়াছে। ইহারাও লিম্পোপো নদী দিয়া দক্ষিণ রোডেশিয়ায় যাইবে। ইহাদের ভাষা আমরা একেবারেই বুঝি না, তবু ইহাদের ভাবে ভঙ্গিতে বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। বিশেষ করিয়া আমাকে ইহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। রোজ সন্ধ্যায় ইহারা আসিয়া আমার সামনে হাঁটু গাড়িয়া উহাদের নিজেদের ভাষায় কি কি সব উচ্চারণ করে। আমি একবর্ণও বুঝি না, কেবল মাথা নাড়ি।

'এই নিগ্রোগুলি 'বান্টু' শাখাভুক্ত। ইহারা যেমন সাহসী ও বলিষ্ঠ তেমনি হিংস্র। আমার সহিত স্টীমারের একজন খালাসী সামান্য দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। আজ দুইদিন যাবৎ তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। আমার যতদূর বিশ্বাস এই নিগ্রোগুলি তাহাকে খুন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে। কারণ আমার সহিত খালাসীর ঝগড়ার সময় তাহাদিগকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম।

'এহেন হিংস্র, বলিষ্ঠ ও সাহসী পথপ্রদর্শক লইয়া আমাদের লিম্পোপোর কুমীর নিধনে বিশেষ সুবিধা হইবে। জার্মান গভর্নমেন্ট ইদানীং ঘোষণা করিয়াছে প্রতিটি কুমীরের জন্য এক পাউণ্ড করিয়া পুরস্কার দিবে···'

'তোমার নিকট হইতে আমি এখন সাড়ে চার হাজার মাইল দূরে কিন্তু বিশ্বাস করো রানী, এক মুহূর্ত তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি না। অনেক রাতে যখন একফালি চাঁদ ওঠে আকাশে, ভৌতিক চাঁদ—আবছা আলো, আবছা অন্ধকার—তখন জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা ভাবি। তুমি যদি কাছে থাকিতে!···ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'চাচাজান আর বাবা কি তাহলে কেবল শিকার করতে যাননি, টাকা পয়সার ব্যাপারও ছিলো?' কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'টাকার কথা একটা আছে অবশ্যই, কিন্তু টাকা তাঁদের কম ছিলো না। আসলে গেছিলেন শিকার করতেই, সেই সাথে যদি কিছু টাকাও আসে তো মন্দ কি?'

'টাকা দেবে কে?'

'জার্মানী যখন গত মহাযুদ্ধে টাঙ্গাইনিকা দখল করে তখন ঘোষণা করে লিম্পোপো নদীর কুমীর শেষ করতে হবে। প্রতিটি মৃত কুমীরের জন্যে এক পাউণ্ড পুরস্কার। আমার বাবা আর তোমার বাবা গেছিলেন আসলে শিকার করতে। ওখানে গিয়ে যতদূর সম্ভব তাঁরা পুরস্কারের কথা জানতে পারেন।'

'আচ্ছা, তোমরা ওদের মৃত্যু সংবাদ পেলে কি করে?' মহুয়া প্রশ্ন করে।

'লরেঞ্জো মারকুইস থেকে অ্যাণ্ডারসন বলে এক সাহেব দয়া করে জানিয়েছিল।'

শহীদ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো। বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। গফুর কফি নিয়ে এলো চার কাপ।

কফিতে এক চুমুক দিয়ে কামাল বললো, 'একটা গান গাও তো মহুয়াদি, শ্রাবণের গান।'

'এই বিকেল বেলা কি ভালো লাগবে?'

'খুব ভালো লাগবে, গাও তো তুমি। আমি সাথে পিয়ানো বাজাবো।'

কামাল উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলো। একটু কেশে নিয়ে শুরু করলো মহুয়া।

আমি শ্রাবণ আকাশে ওই, দিয়াছি পাতি
মম জল ছল ছল আঁখি মেঘে মেঘে···

যেমন সুন্দর সুর, তেমনি গলা। কলির শেষে এতো সুন্দর করে মীড় টানে মহুয়া! সাথে কামালের পাকা হাতে পিয়ানো, সমস্ত আবহাওয়া একেবারে গম্ভীর করে দিয়েছিল। আজকের এই বাদলা দিন যেন সম্পূর্ণ সুন্দর হলো গানটা শুনে। সবাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। মহুয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'লীনা, ভুনিখিচুড়ি তৈরি করা শিখবে বলে, চলো আজ খিচুড়ি রাঁধবো।'

মহুয়া আর লীনা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। কামাল কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলো। তারপর শহীদকে বললো, 'কি কথা বলবি বলে?'

'হ্যাঁ, কাছে আয়।'

কামাল কাছের একটা সোফায় এসে বসলো। শহীদ বললো, 'শোন, তোকে গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলি। এই যে চিঠিটা দেখছিস—পকেট থেকে একটা খাম বের করলো শহীদ, 'এটা আজ সকালের ডাকে আফ্রিকা থেকে এসেছে। না, না. বাবা বা কাকা

কারও লেখা নয়; কুফুয়া নামে একজন আফ্রিকান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এসেছে।

'বাবা আর কাকা গেছিলেন লিম্পোপো নদীতে কুমীর শিকার করতে। জার্মেনী তখন ঘোষণা করেছে প্রতিটি কুমীরের জন্যে এক পাউণ্ড করে পুরস্কার দেবে। বাবা আর কাকা এই ব্যবসায়ী কুফুয়ার সাথে যোগ দিয়ে কয়েকশো লোক জোগাড় করে কেবল মাত্র নদীর এক মাইল ঘেরাও করেই সাড়ে নয় হাজার কুমীর একদিনে মারেন। পরে আরও অনেক কুমীর এঁদের হাতে মারা পড়ে। ঠিক ঠিক টাকা দেয় জার্মান গভর্নমেন্ট। কিন্তু তাদের কুমীর নির্বংশ করার plan বাতিল করে দেয়। তোর বাবা হঠাৎ একদিন বেকায়দায় কুমীরের পাল্লায় পড়ে বাবা আর কুফুয়ার চোখের সামনে তলিয়ে গেলেন লিম্পোপোর মধ্যে। বাবা নাকি ভীষণ আঘাত পেয়ে পাগলের মতো হয়ে যান। রাইফেল কাঁধে লিম্পোপোর ধারে ধারে দিন নেই রাত নেই পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন তিনি। কয়েকদিনের মধ্যে বহু কুমীর মারেন বাবা। তারপর একদিন তিনিও আর ফিরে এলেন না।

'আমাদের ঠিকানা কুফুয়ার কাছে ছিলো। সে জানতো আমাদের পরিবারে বড় আর কেউ নাই। তাই আজ সতেরো বছর পর আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি মনে করে চিঠি লিখেছে। আমার আর তোর সাত হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় নব্বই হাজার টাকা কুফুয়ার কাছে জমা আছে। আমরা যেন সেখানে গিয়ে সে টাকার একটা ব্যবস্থা করে আসি, তার জন্যে সে আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। লিখেছে, 'বাবারা, আমার প্রচুর টাকা আছে, বন্ধুর ছেলেদের টাকা আত্মসাৎ করে আমি স্বর্গে যেতে পারবো না। তোমাদের টাকা পয়সা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে আমি শান্তিতে মরতে চাই। তোমরা যতো শিগগির পারো রওনা হয়ে যাও। নইলে এই বুড়ো বয়সে আমাকে আবার যেতে হবে তোমাদের দেশে।'

'অদ্ভুত ভালো বুড়ো তো! কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। কিছু Conspiracy-ও থাকতে পারে। কয়েকদিন ধরে কয়েকজন নিগ্রোকে এই বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখছি কেন বল্‌তো? ঢাকায় নিগ্রো, আফ্রিকা থেকে চিঠি, কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

'তোরও নজর পড়েছে দেখছি!' শহীদ হাসলো। তারপর গত সন্ধ্যার ঘটনা সবিস্তারে বললো কামালকে। সবটুকু মন দিয়ে শুনে কামাল বললো, 'খুবই Serious বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কিছু আঁচ করেছিস?'

'কিছু মাত্র না। আমি সকালে মার হাতবাক্স খুল্‌লাম। বাবার কোনও চিঠিপত্র থেকে কিছু বোঝা যায় কিনা দেখতে। একটা জায়গা একটু মিলেছে। চিঠিতে একখানে বাবা লিখেছেন কয়েকজন নিগ্রো স্টীমারে রোজ সাঁঝে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড় বিড় করে কি মন্ত্র আওড়াত। কাল সাঁঝে আমাকে হাত পা বেঁধে ওরা আমার সামনেও

হাঁটু গেড়ে বসে মন্ত্র আওড়েছিল। মনে হয় এই নিগ্রোগুলো সেই একই দলের লোক, অথবা একই উপজাতি বা শাখার লোক।'

'সে যাক। এখন কি ঠিক করলি? যাবি লিম্পোপো নদীতে?'

'তাই জিজ্ঞেস করতেই তো তোকে ডাকলাম। আমার তো পুরোপুরি যাবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তোর মা ভীষণ কান্নাকাটি করবেন তুই যেতে চাইলে।'

'কিছু না। তুই গিয়ে খালি একবার মাকে বলবি, ব্যাস আর কিছু লাগবে না। তোর সাথে মা আমাকে দোজখেও পাঠাতে রাজি হবে।'

'এদিকে আবার মহুয়াও কান্নাকাটি করবে। ও কিছুতেই যেতে দিতে চাইবে না।'

'মহুয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবি।'

'বাঃ! Good idea! আমার মাথায় এ কথা একেবারেই আসেনি! পাটিগণিত করে তোর বুদ্ধি খুলে গেছে।' শহীদ খুশি হয়ে উঠলো।

'কিন্তু আমি যে কামাল আহমেদ আর তুই যে শহীদ খান, তা প্রমাণ করবি কি করে? আফ্রিকায় গেলাম, তখন যদি কুকুয়া বলে তোমাদের পরিচয় প্রমাণ করো, তখন?'

'বারে! আমাদের পাসপোর্ট থাকবে না সাথে? পাসপোর্টেই তো ছবি থাকবে।'

'পাসপোর্ট করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে তোমাদের?' মহুয়া এসে ঢুকলো ঘরে। ঠোঁটের একটু ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মিষ্টি মুখটা আরও মিষ্টি লাগছে।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে শহীদ বললো, 'আফ্রিকা।'

মহুয়া ভাবলো শহীদ ঠাট্টা করছে। হেসে কামালের দিকে চাইলো। কামালের গম্ভীর মুখ দেখে ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

'আফ্রিকা? আফ্রিকা কেন?'

'লিম্পোপো নদীতে কুমীর শিকার করতে।'

'ধ্যাৎ, ঠাট্টা করছো।'

'না মুহু, ঠাট্টা না। সত্যিই যাচ্ছি।'

'কিছুতেই তোমাদের যাওয়া হতে পারে না।'

'যে কোনও অবস্থায় আমাদের যাওয়া চাই-ই,' গম্ভীরভাবে বলে শহীদ।

'আমার কথা শুনবে না?' মহুয়ার চোখ ছল ছল করে।

'দেখ, কামাল, মেয়ে মানুষের একমাত্র অস্ত্র তুলে নিয়েছে মহুয়া, আর একটু হলেই প্রয়োগ করবে।'

মহুয়া হেসে ফেলে বললো, 'তাহলে বলো সত্যি সত্যিই আর যাচ্ছো না। বিয়ে করে, একটা মেয়ের ইহকাল পরকাল নষ্ট করে ওসব দেশে যাবার কথা ভাবতে হয় বুঝি?'

'সত্যি সত্যিই আমরা যাচ্ছি মহুয়াদি। তবে তুমি যদি কান্নাকাটি করো, সেই ভয়ে

তোমাকেও সাথে নেয়ার প্রস্তাব করেছি শহীদের কাছে। তাহলে রাজি আছো তো যেতে দিতে?'

'নাই বা গেলে অমন দেশে কামাল ভাই।'

'অনেক কারণ আছে যে যাবার।'

'কি কারণ?'

শহীদ বললো, 'তোমাকে পরে সব বলবো মহুয়া। আমরা চার–পাঁচ দিনের মধ্যেই চিটাগাং থেকে রওনা হবো। গফুরকে বললেই হবে, ওই সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে ঠিক করে ফেলবে।'

লীনা এসে ঢুকলো। 'কোথায় যাবে তোমরা দাদামণি?'

'আফ্রিকা।'

'সত্যি?'

'মহুয়াদিও?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও যাবো।' আবদার ধরে লীনা।

'তুই কি করে যাবি। তোর তো সামনে পরীক্ষা। তুই ততোদিন চাচী–আম্মার কাছে থাকবি, আমরা যতো শিগ্‌গির পারি ফিরে আসবো।'

তিন

'আমাদের জাহাজ কি কলম্বো ঘুরে যাবে?' কামাল জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ। মধ্যেখানে মাত্র দুইটা হল্‌টেজ। কলম্বো আর মরিশাস। কালকে আমরা চিটাগাং রওনা হচ্ছি। ঢাকায় আজই আমরা শেষ রাত কাটাবো। হয়তো আর কোনও দিন ফিরে আসবো না। চাচী আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিস তো? তুই রাতে আমাদের এখানে থাকবি, কাল খুব ভোরে প্লেন ধরতে হবে।'

'আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। রাত দশটার দিকে জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসবো।'

'কামাল চলে গেল। রাত তখন আটটা। গফুর এসে ঢুকলো ঘরে।'

লীনাকে চাচী আম্মার ওখানে দিয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ। ছোটো আপা খুব কাঁদছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শহীদ বললো, 'তোর দিদিমণিকে ডেকে দে তো।'

গফুর দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

'কিছু বলবি?' শহীদ জিজ্ঞেস করে।

'দাদামণি, আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের একলা বিদেশে যাওয়া হবে না।'

'তুই গেলে আমাদের কি সুবিধা হবে? আরও বাজে হাঙ্গামা বাধাবি।'

শহীদ জানতো গফুর যাবেই যাবে। সে হয়তো তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা যেতে দিতেও পারতো। কিন্তু তার দিদিমণিকে সে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। তাকে সে কিছুতেই একা বিদেশে যেতে দিবে না। তার ধারণা, তাকে ছাড়া হাজার লোকের সাথে গেলেও শহীদরা একা একা যাচ্ছে। ওকে রেখে গেলে ও যে ভীষণ কষ্ট পাবে দিনরাত ভেবে ভেবে, বুঝতে পেরে শহীদ ওরও টিকেট কেটেছে।

'তাহলে আমি দিদিমণির জিনিসপত্র খুলে রাখি। তোমরা যা খুশি করো গে যাও, দিদিমণিকে আমি যেতে দেবো না।'

'আমার বউ নিয়ে আমি যেখানে খুশি যাবো, তাতে তোর কি?' শহীদ হাসে।

গফুর কোনও উত্তর পায় না এই কথার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে। শহীদকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারে না কতো ভয়ের জায়গা আফ্রিকা। সে দেশে একলা দিদিমণির যাওয়া হতেই পারে না। বললো, 'তোমরা তো কুমীর শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন দিদিমণিকে দেখবে কে?'

ওর অবস্থা দেখে শহীদ তাড়াতাড়ি বললো, 'নারে গাধা। তোরও টিকিট করেছি। তোকে ছাড়া গিয়ে কি বিপদে পড়ি না পড়ি তার ঠিক আছে?'

গফুরের ঠিক বিশ্বাস হয় না। যাবার সময় ঠিক দাদামণি একটা ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। ঠিক হ্যায়। সেও পিছন পিছন যাবে। তখন না নিয়ে পারবে না। তাছাড়া সেদিন তার 'ফটোক' তুলে কয়েকটা কাগজে লাগিয়েছে দাদামণি, তার ওপর আবার সে আঙুলের টিপও দিয়েছে—সেজন্যে আবার অল্প অল্প বিশ্বাসও হয় তার। আর কোনো কথা না বলে চলে গেল গফুর।

একটু পরেই মহুয়া এসে ঢুকলো। 'কামাল ভাই কই?'

'চলে গেল। দশটার সময় আসবে।'

'বারে! ভাত খাবে না এখানে? আমাকে চিংড়ীর কাটলেট করতে বলে না খেয়েই চম্পট দিয়েছে? আমি কতো কষ্ট করে তৈরি করলাম।'

'ওর জন্যে তুলে রাখলেই হবে।'

'গরম গরম তো আর খেতে পারলো না। যাকগে। তুমি চলো ভাত খাবে।'

মহুয়া আর শহীদ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো। কাল আবার খুব ভোরে উঠতে হবে। কামালের জন্যে একটা ঘরে বিছানা করে দিয়েছে মহুয়া। টেবিলের ওপর গোটা চারেক কাটলেট ঢাকা দিয়ে রেখেছে। গফুর ওকে ঘর দেখিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে।

অনেক রাতে মহুয়ার চিৎকার আর ধাক্কায় শহীদের ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলো শহীদ, 'কি, কি হয়েছে মহুয়া?'

মহুয়ার বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে কাঁচের জানালার দিকে দেখালো।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। এ কয়দিন আকাশ পরিষ্কার ছিলো। রাতের মধ্যে মেঘ জমে বাইরেটা নিকষ কালো করে দিয়েছে। বিজলী চমকে উঠলো। সাথে সাথে শহীদও চমকে উঠে বালিশের তলায় হাত দিলো। দুইটা কালো মূর্তি জানালার গরাদ ধরে ঘরের মধ্যে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। গুড়ুম গুড়ুম করে মূর্তিগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উপর্যুপরি দুইবার গুলি ছুঁড়লো শহীদ। ঝন্ ঝন্ করে জানালার ওপরের দিকটার কাঁচ ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লো মূর্তি দুটো। তিন চার সেকেণ্ড পর হঠাৎ আরেকটা গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই আর্তকণ্ঠে একজন মানুষের চিৎকার।

মহুয়া এলিয়ে পড়লো বিছানার উপর। শহীদ ব্যস্ত হয়ে ডাকে, 'মহুয়া! মহুয়া! অমন করছো কেন? কিছু হয়নি, ভয় পেয়ো না। ও মুহু। মুহু?'

এমন সময় দমাদম দরজায় ধাক্কা পড়লো। শহীদ, দরজা খোল্।

দরজা খুলতেই ছুটে ভেতরে ঢুকলো কামাল। 'টর্চ নিয়ে শিগ্‌গির বাইরে চল। আমি একটা লোককে জখম করেছি।'

'তুই-ই তাহলে আমার পরে গুলি ছুঁড়েছিলি?'

সাত ব্যাটারীর একটা দীর্ঘ টর্চ নিয়ে ও বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে!

'গেটের কাছে চল।' কামাল আগে আগে যায়।

'কই? নেই তো কেউ!'

'এইখানটায় পড়েছিল লোকটা। এই দেখ, রক্তের দাগ।'

শহীদ চেয়ে দেখলো, সত্যি-সত্যিই এক জায়গায় খানিকটা রক্তের দাগ। চারি-ধারে টর্চ ঘুরিয়ে দেখা গেল কোথাও কেউ নেই।

'এই যে রক্তের দাগ। এই পথ ধরে সোজা চলে গেছে। খুব জখম হয়েছে ব্যাটা, অনেক রক্ত, চল্ দাগ ধরে এগোলে ব্যাটাদের পাবো।' কামাল সামনে এগোয়।

'এখন আর যাওয়ার দরকার নেই। হাঙ্গামা না বাড়ানোই ভালো। ভোর রাতে তো আমরা কেটেই পড়বো।'

শহীদ আর কামাল ফিরে এলো জানালার ধারে। দুই জোড়া পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল বলে এই দাগগুলো মাটির মধ্যে গভীর হয়ে বসেছে।

'তুই গুলি ছুঁড়লি কেন? কখন জাগলি ঘুম থেকে?' শহীদ জিজ্ঞেস করে।

'আমি একটা গুলির আওয়াজ শুনে জেগে গেছিলাম। জানালার ধারে আসতেই

বিজলীর আলোয় দেখলাম দুইটা মূর্তি দৌড়ে গেটের বাইরে চলে যাচ্ছে। অমনি গুলি ছুঁড়লাম। একজন চিৎকার করে বসে পড়লো দেখে ছুটে তোর ঘরে গেছিলাম।'

শহীদ ঘরে এসে দেয়াল ঘড়িতে দেখলো সাড়ে তিনটা বাজে। হঠাৎ মহুয়ার কথা মনে পড়তেই ছুটে নিজের ঘরে ঢুকলো। মহুয়া তখন উঠে বসেছে। কামালও পিছন পিছন এসে ঢুকলো ঘরে। মহুয়া বললো, 'পেলে ওদের?' অনেক স্বাভাবিক গলা।

'না। রক্তের দাগ ধরে গেলেই পেতাম, কিন্তু দরকার নেই, তাই গেলাম না।'

'উঃ। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমি তো প্রথম ভূত মনে করেছিলাম। এখন কয়টা বাজে কামাল ভাই?'

'সাড়ে তিন,' শহীদ বললো, 'বড্ডো সাহসের পরিচয় দিয়েছো মহুয়া। Bravo, আফ্রিকা জঙ্গলে যাবারই উপযুক্ত!'

লজ্জা পেয়ে মহুয়া বললো, 'না, এই, ঠিক আশা করতে পারিনি কিনা, তাই অতো ভয় পেয়েছিলাম। আর আমার দোষ কি। লোক দুটোর চোখগুলো যে কি সাঙ্ঘাতিক রকম জ্বলছিল, দেখলে তুমিও ভয় পেতে।'

'হ্যাঁ। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে চিৎপটাং হয়ে বিছানায় পড়ে যেতাম।'

'মিছে কথা বলো না, আমি মোটেও গোঁ গোঁ করিনি।'

'তা করোনি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আফ্রিকা যাওয়া সম্ভব না। তোমার জিনিসপত্র বের করে রাখো, এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে কামালদের বাড়িতে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো। আপাততঃ আমাদের একটু কফি খাওয়াবে? আর কোনোদিন হয়তো তোমার হাতে কফি খেতে পাবো না।'

মহুয়া নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। স্টোভ জ্বালিয়ে জল বসিয়ে দিয়ে জানালা খুলে শহীদ আর কামালের দিকে পিছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শহীদ বললো, 'কই মহুয়া, তোমার জিনিসপত্র খুলে রাখলে না? শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট দিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে আমরা কি করবো? তাড়াতাড়ি করো, আমরা ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে রওনা হবো।'

মহুয়া কোনো কথা বললো না, ওদের দিকে ফিরলোও না। ও রাগ করেছে বুঝতে পেরে শহীদ উঠে গেল ওর কাছে। 'এই বোকা মেয়ে ঠাট্টা বুঝতে পারো না? ঘোরো তো এদিকে, দেখি; ও কি কাঁদছো কেন? ছিঃ, ছিঃ আমি ঠাট্টা করলাম, এদিকে তুমি কেঁদে অস্থির।'

মহুয়া হাসবার চেষ্টা করলো। ধরা গলায় বললো, 'আর ভয় পাবো না। হঠাৎ ওদের দেখে ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

'মনে থাকে যেন। আফ্রিকায় কতো কি বিপদ আসতে পারে। মনে মনে তৈরি না

থাকলে ঘাবড়ে গিয়ে বিপদে পড়বে। এখন তাড়াতাড়ি আমাদের দু'কাপ কফি খাওয়াও তো লক্ষ্মী।'

চার

'Flemingo' জাহাজ ছাড়লো চিটাগাং থেকে। মস্তবড় জাহাজ। কলম্বো আর মরিশাস হয়ে সোজা দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ডারব্যান বন্দরে যাবে।

পাশাপাশি দুটো কেবিন পেয়ে গেছে শহীদরা। বড় কেবিনটায় শহীদ আর মহুয়া, আর মাঝারি কেবিনে কামাল। গফুর 'ডেকে' ভালো ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ফরিদপুরের মানুষ। যাত্রী হিসেবে নোয়াখালির পরেই ফরিদপুরের নাম। সব সময় এরাই ভালো ব্যবস্থা করতে পারে।

কামাল প্রচুর পরিমাণে বমি করেছে। জাহাজের ডাক্তার একটা মিকচার খেতে দিয়েছে তাকে। এখন সন্ধ্যার দিকে কিছুটা সুস্থ বোধ করছে সে।

মহুয়ার কিছুই হয়নি—ওর নৌকা চড়ে অভ্যাস আছে। আর গফুরের তো কথাই নেই। পদ্মা পারের মানুষ। সমুদ্র দেখে জিজ্ঞেস করবে, 'এ খালের নাম কি?'

সন্ধ্যের পর সবাই কেবিনের সামনে ডেক চেয়ারে গিয়ে বসেছে। কয়টা চেয়ার আর মধ্যেখানে একটা টেবিল। ফুরফুর করে হাওয়া আসছে। জাহাজের খাবার ঘর থেকে অনেক মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ তালগোল পাকিয়ে একটা গোলমাল হয়ে এখানে এসে পৌছোচ্ছে। তবু ভাগ্য ভালো, তাদের কেবিন জাহাজের একেবারে সামনের দিকে। অনেকটা নিরালা। জাহাজের পেটের কাছের কেবিন হলে চিৎকার আর এঞ্জিনের শব্দ মিলে পাগল করে দিতো। এখানেও যে শব্দ কম, তা নয়। একঘেয়ে জল-কল্লোল। এ তবু সহ্য করা যায়।

অনেকক্ষণ বসে আছে তারা। দু'বার কফি খেয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেছিলেন dinner-টা সবার সাথে খাবার ঘরে খাওয়ার জন্যে। কিন্তু মহুয়া কিছুতেই রাজি হয়নি। কাঁটা চামচ দিয়ে খেয়ে সুখ আছে। কাজেই তাদের খাবার সন্ধ্যার পর দিয়ে গিয়েছিল—অনেক আগে ওরা খেয়ে নিয়েছে।

তিনদিন আগে ছিলো পূর্ণিমা। চাঁদ আজ অনেক দেরি করে উঠছে। পুবের আকাশটা ফর্সা করে দিয়ে চাঁদ উঠলো। ছোটো ছোটো টুকরো মেঘ রয়েছে আকাশে। ঢেউয়ের মাথাগুলো চিক-চিক করছে চাঁদের আলো পড়ে। বড় সুন্দর লাগছে শহীদের। পরিবেশটা বড় মিষ্টি। শহীদ বললো, 'জানিস কামাল, আমার মনে হয় 'পাহাড়ী' ঠিক

এই সময়কার রাগ। পাহাড়ী ঠুমরী শুনলে আমার মনে হয় একটা সুন্দর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি, সামনে বিরাট সমুদ্র! ঠিক এমনি করে চাঁদ উঠেছে। পাঞ্জাবী পাজামা পরে আছি, ফুরফুর করে মিষ্টি বাতাস আমার কাপড় নিশানের মতো ওড়াচ্ছে। মনটা কেমন জানি হয়ে গেছে। গাম্ভীর্য আবার সেই সাথে একটা আনন্দের পুলক। এমন মহান বিস্তারের সামনে এলে মনটা কিছুতেই ছোটো বা হাল্কা থাকতে পারে না। ঠিক এই সময় প্রিয়াকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে—তাকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে ইচ্ছে করে পৃথিবী কতো সুন্দর।'

ঠিক এমনি সময় গজ পনেরো দূর থেকে একটা মিষ্টি আওয়াজ এলো। সরোদের আওয়াজ! চমকে উঠে শহীদ, কামাল। স্বপ্ন না সত্যি? না ভুল শোনেনি তারা, বেজে উঠলো সরোদ। রাগ পাহাড়ী। 'উঃ, কি অদ্ভুত মিষ্টি! কুয়াশা, কুয়াশা ছাড়া এ আর কেউ না,' ফিসফিস করে বলে কামাল।

'চুপ করে শোন।' শহীদ ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখে।

অদ্ভুত বাজাচ্ছে কুয়াশা। চোখের সামনে স্পষ্ট ছবি যেন দেখতে পাচ্ছে শহীদ। এমন আর পাক-ভারতের কারও বাজানো সম্ভব না। এতো দরদ পাবে কোথায় অন্য লোকে? যেমন মিষ্টি তেমনি বোল্ড্। যখন মিনতি তখন সুরটা কতো ইনিয়ে বিনিয়ে যায়; আর যখন পৌরুষ, তখন কী ভীষণ টোকা। যেন সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। সরোদটা পুরুষের বাজনা। পুরুষের ঠিক মনের কথাটা সরোদে যতখানি প্রকাশ করা যায়। অন্য কোনো যন্ত্রে তা যায় না।

আধঘন্টাখানেক বেজে থেমে গেল বাজনা।

'সত্যিই। এমন বাজনা আর শুনিনি।' মহুয়া অনেকক্ষণ পর কথা বলে।

'শুনতে 'পারো' না মহুয়াদি। পৃথিবীতে আর কেউ এতো ভালো বাজায় না।'

'কে বাজালো?'

মহুয়া মাথা নিচু করে বসে রইলো। শহীদ বললো, 'কিন্তু কুয়াশা চলেছে কোথায়? আমাদের সাথে আফ্রিকা, না আর কোথাও? আমি কল্পনাও করতে পারিনি এই জাহাজেই রয়েছে সে।'

'কিন্তু কুয়াশা কেন আমাদের পিছন পিছন চলেছে?' কামাল বলে।

'আল্লা মালুম!'

আর দুদিন পর স্টীমার লরেঞ্জো মারকুইসে পৌছবে। ডারব্যানে নেমে এই স্টীমার ধরেছে শহীদরা। ডারব্যানে তাদের সাথে সাথে জন কতক নিগ্রো আর জন দশেক সাহেব জাহাজ থেকে নেমে স্টীমারে উঠেছে। এতদিন জাহাজে কিন্তু কোনও নিগ্রোকে

দেখেনি শহীদ। খুব লক্ষ্য রেখেছিল শহীদ যাত্রীদের ওপর। তার সন্দেহ সত্য হয়েছে। একজন ফুলপ্যান্ট পরা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে নামলো জাহাজ থেকে। এই দলটার মধ্যে লম্বা সর্দার, আর সেই সেদিন যে পথে তাকে দেখে বিটকেল হাসি দিয়েছিল, সেই লোকটাকে শহীদ দেখেই চিনতে পারলো। কিন্তু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে যেন চিনতে পারেনি এমনি ভাবে স্টীমারে গিয়ে উঠলো সে। ডারব্যান থেকে আরও বহু নিগ্রো যাত্রী উঠলো স্টীমারে। কিন্তু কুয়াশাকে দেখা গেল না।

শহীদ তাকে চিনতে পারেনি মনে করে গতকাল সর্দারটা তাদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল। তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কতো কথা বলে গেল সে, কতো মিষ্টি করে হাসি দিলো, কিন্তু মহুয়া কিছুতেই তার সামনে গেল না, কোনো কথাই বললো না।

তার কাছ থেকে জানা গেল যে তারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিবাসী। অতো interior-এ কেউ যায় না, তাই ওদের দেশ এখনও ভালো করে সভ্যতার ছোঁয়া পায়নি। দু'একজন যারা একটু আধটু বাইরে গেছে তারা অল্পস্বল্প ইংরেজি ও পুর্তুগীজ ভাষা জানে। লিম্পোপোর ধারেই বোঙ্কারা অঞ্চলে ওদের বাড়ি। শহীদের সেদিকে শিকারে যাওয়ার ইচ্ছে আছে জেনে ভারি খুশি হয়ে নিমন্ত্রণ করলো সে। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হবে না বলে ভরসা দিলো। শহীদ মনে মনে ভাবলো, তার নমুনা পেয়েছি দোস্ত।

অনেক চেষ্টা করেও এদের কি উদ্দেশ্য জানতে পারলো না শহীদ। কেন এরা এতদূর গেল? কেনই বা ফিরে এলো আবার ওদের সাথে? সবই শহীদের কাছে ঝাপসা লাগে।

দেখা যাক কি হয়, শহীদ ভাবে।

Gungunyana's Ford-এ পৌঁছলো শহীদরা খুব ভোরে। লিম্পোপোর স্রোতের উল্টো দিকে একশো মাইল লঞ্চে করে এসেছে তারা। লঞ্চ ঠিক বলা যায় না। মস্ত বড় একটা ক্যানো নৌকোয় এঞ্জিন বসানো। প্রচুর পরিমাণে তেল নিয়েছে তারা সাথে করে।

সেই নিগ্রোগুলো তাদের সাথে এক লঞ্চে আসতে চেয়েছিল। লঞ্চে জায়গা প্রচুর, শহীদের আপত্তি ছিলো না, বরং সুবিধাই হবে বলে মনে করেছিল। কিন্তু মহুয়া কিছুতেই রাজি হলো না। বাব্বা, সেদিন রাতের সেই নিগ্রোর মুখ তার স্পষ্ট মনে আছে, সেই ভয়ঙ্কর লোককে নিয়ে আবার একই লঞ্চে এতদূর যাওয়া? অসম্ভব।

শহীদ তাদের মানা করে দিয়েছে। ওরা একটা সাধারণ 'ক্যানো' নিয়ে পিছন পিছন আসছে। Gungunyana's Ford-এ ওরা শহীদের সাথে দেখা করবে।

পথে অজস্র কুমীর দেখেছে তারা। কুমীরের ভয় অনেকটা কেটে গেছে মহুয়ার। জলে তো আছেই, ডাঙার ওপরও কিলবিল করেছে প্রচুর কুমীর। এতো বেশি যে মারতে ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে এঞ্জিনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে পথে থেমেছে ওরা। হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠলো লঞ্চ। মহুয়া শহীদকে জড়িয়ে ধরলো। ড্রাইভার বললো কুমীর লেজের ঝাপটা মেরে লঞ্চ উল্‌টিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

কামাল লঞ্চের কিনারায় ছিলো। আরেকটু হলেই ছিটকে নদীতে পড়তো। এই নদীতে নাকি তিন সেকেণ্ড জলে পা ডুবিয়ে রাখলেই পায়ে টান পড়ে। আর সেখানে একটা জলজ্যান্ত মানুষ জলে পড়ে যাওয়া! চিন্তাও করা যায় না এরই নাম লিম্পোপো, Crocodile River.

লঞ্চের হালের নিচের দিকটা লোহার। কারণ জিজ্ঞেস করায় ড্রাইভার বললো, কুমীরগুলো অনেক রকম বুদ্ধি খাটায়। যখন বড় বড় ক্যানো উল্‌টিয়ে ফেলতে পারে না, তখন হাল ভেঙে ফেলে লেজের বাড়ি মেরে। ফলে স্রোতের মুখে নৌকা যেদিক খুশি সেদিকে চলে। পাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে হয় নৌকা ভাঙে এবং লোকগুলো কুমীরের পেটে যায়, নয় তো কোথাও গিয়ে আটকে থাকে। দিনের পর দিন কুমীরেরা অপেক্ষা করে থাকে। কোনো নৌকা যদি ভাগ্যক্রমে এসে পড়ে তো বেঁচে গেল, নইলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যখন লোকগুলো ডাঙায় নামার চেষ্টা করে তখন ধরে নিয়ে যায় নিজ নিজ গর্তের মধ্যে।

নদীর দুপাশে ঘন বন। দেখলে মনটা দমে যায়। কেমন যেন ভয় ভয় করে। কয়েকজন জংলী লোকও দেখেছে ওরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। দূরে একটা হরিণ নেমেছিল জল খেতে, এঞ্জিনের শব্দ শুনে হকচকিয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর অরণ্যে।

লঞ্চটা একজনই চালায়। ইংরেজ। যুবক। নাম জন ব্লাইদ। লঞ্চটা ওর নিজেরই। জন্ম এদেশেই। বাবা হয়তো এসেছিল ভাগ্য অন্বেষণে, সুবিধা পেয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় শরীর মি. ব্লাইদের। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। দেখলে খুব সাহসী বলে মনে হয় তাকে। তেমনই আবার ভদ্রও খুব। Gungunyana's Ford-এ পৌঁছে কুফুয়াকে সেই খবর দিতে গেছে।

আধঘন্টা খানেক পর মি. ব্লাইদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ নিগ্রোকে আসতে দেখা গেল। খুব লম্বা ছিলো লোকটা। এখন কিছুটা নুয়ে পড়েছে বয়সের ভারে। কাছে এলে হাতের পেশীর দিকে নজর গেল শহীদের। এখনও সতেজ। এই বয়সেও তার শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে।

শহীদ হ্যাণ্ডশেক করতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কুফুয়া জড়িয়ে ধরলো তাকে। একটু দূরে সরিয়ে আবার ভালো করে মুখ দেখলো। আবার জড়িয়ে ধরলো। **Warm** অভ্যর্থনার চোটে গরম হয়ে উঠলো শহীদ। মনে মনে ভাবছে সে, 'ম্যালা বিপদ রে বাবা!'

এই রকম অবস্থায় কি করতে হয় বা বলতে হয় শহীদ বুঝতে পারলো না। এদের দেশের রীতিই বোধহয় এমন। আন্তরিকতার চাপে বুকের পাঁজর ভাঙার উপক্রম।

এতক্ষণে কথা বললো কুফুয়া, '**Shahid I suppose? Exactly like your father eh!** ' (শহীদ না? একেবারে বাপের চেহারা পেয়েছো দেখছি!)

শহীদ একটা বিনয়ের হাসি দেবার চেষ্টা করলো। এদিকে তাকে ছেড়ে দিয়ে কুফুয়া এখন কামালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।–'**You're Kamal, I guess.**' (আর তুমি বোধ হয় কামাল?)

'**Glad to meet you, Mr. Kufua,**' (আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম মি. কুফুয়া।)

'**What? Glad? I am simply overwhelmed. Any way, how have you enjoyed the journey?** (আমি খুব খুশি হয়েছি। যাকগে, কেমন লাগলো যাত্রাটা।)

'**Oh, it was fine**'. (চমৎকার)

প্রচুর পরিমাণে বকর বকর করলো কুফুয়া। তার সাথে ইসলাম খাঁ ও ইকবাল আহমেদের কি করে পরিচয় হলো, কি করে তারা কুমীর শিকার করেছিল, কেমন ভাবে হঠাৎ ইকবাল আহমেদ কুমীরের খপ্পরে পড়লো (তা আবার অভিনয় করে দেখালো), সে কিসের কিসের ব্যবসা করে, মাসিক আয় কতো, তার আত্মীয়স্বজন কোথায় কে আছে, তাদের মধ্যে আবার কে কে মারা গেছে, কারা বেঁচে আছে, কারা শিগ্‌গিরই মারা যাবে, সব খবর শহীদদের জানতে আধঘন্টার বেশি লাগলো না। পনেরো ষোল বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত কি কি ঘটনা ঘটেছে সবই সবিস্তারে গড় গড় করে বললো সে। অন্য কাউকে কিছুই বলতে দিলো না।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একটা চেক বই বের করে সাত হাজার পাউণ্ডের একটা চেক লিখে দিলো। বললো , 'লরেঞ্জো মারকুইসের লয়েডস ব্যাঙ্কে তোমরা এই চেক ভাঙিয়ে নিতে পারবে। কিংবা সেখানে জমা দিয়ে ঢাকা থেকেও টাকা তুলতে পারো তোমরা। আমি এখন আর ব্যবসা দেখাশোনা করি না। বাড়িতে থাকি, ধর্ম কর্ম করি। আমার চার ছেলেই সব দেখাশোনা করে। আমি আর কতদিন, হয়তো আর একটা

বছরও কাটবে না। আমার ছেলেরা অবশ্য অত্যন্ত সৎ, কিন্তু বলা তো যায় না, টাকা পয়সার ব্যাপার, যদি তোমাদের ঠকাতে চায়। তাই আমি নিজ হাতেই সব দেনা শোধ করে যাচ্ছি। মরবার সময় অশান্তি নিয়ে মরতে চাই না।'

'আপনার চার ছেলে এখন কোথায়?' শহীদ জিজ্ঞেস করে।

'ওরা লরেঞ্জো মারকুইসেই থাকে। এখানে কালে ভদ্রে আসে। এখন সবাই ওখানে আছে। এই সময়টা ব্যবসার season কিনা।'

মহুয়া ওর নিজের হাতে তৈরি পরোটা আর হালুয়া দিলো কুফুয়াকে খেতে। খেয়ে অজস্র প্রশংসা করলো কুফুয়া। শহীদকে জিজ্ঞেস করলো, 'Who is she?' (কে মেয়েটা?)

'My wife'. (আমার স্ত্রী)

'Oh good God! Why didn't you tell it before? Then you are my daughter-in-law, eh? Come, darling, Come forward.' (তাই নাকি? আগে বলোনি কেন? তাহলে তো তুমি আমার পুত্রবধূ গো! এদিকে এসো তো লক্ষ্মী।)

কুফুয়ার অভ্যর্থনার রীতি মহুয়া নিজ চোখে দেখেছে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক পা এক পা করে পিছনে সরছে সে। 'Dont be afraid darling.' কুফুয়া এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলো। তারপর নিজের গলা থেকে একটা হার খুলে বললো, 'You see the big stone? A solitaire diamond from our mine,.Would you like to have it?' বহুমূল্য হীরের হারটা মহুয়ার গলায় পরিয়ে দিলো সে। আপত্তি করবারও সাহস পেলো না মহুয়া।

তারপর সে শুরু করলো তাদের নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি। নিয়ে সে যাবেই। কয়েকদিন ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে তারপর দেশে ফিরতে পারে শহীদেরা। কুফুয়ার লোক তাদের নিয়ে একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে। লঞ্চ ছেড়ে দিতে বললো কুফুয়া।

কিন্তু শহীদ বললো যে দু'একদিন সে কুফুয়ার বাড়িতে থাকতে পারে, কিন্তু তারপর সে যাবে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বোঙ্কারা অঞ্চলে শিকার করতে। কাজেই লঞ্চ ছেড়ে দেয়া চলে না।

বোঙ্কারার নাম শুনেই চমকে উঠলো কুফুয়া। সামলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো, 'ওখানে কেন শহীদ? আরও তো অনেক জায়গা আছে। Better go anywhere else.'

'কেন, ওখানে যাওয়ায় আপনার আপত্তি কিসের? বোঙ্কারা...'

Sh···h···h···বাধা দিয়ে মুখের ওপর হাত রাখলো কুফুয়া, 'এখানে ওই জায়গাটার নাম জোরে বলো না। ওদেশের বহুলোক এখানে আছে। বড় সাঙ্ঘাতিক তারা।'

শহীদ বুঝলো ভেতরে আরও কথা আছে, সবটা বললো না কুফুয়া। ব্যাপারটা সেখানেই চেপে গেল শহীদ। বিকেল বেলায় কামাল, মহুয়া, গফুর সবাই বেড়াতে গেছে, সন্ধ্যার দিকে কুফুয়াকে একা পেয়ে শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'বোঙ্কারা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?'

'কি শুনতে চাও?'

প্রথমে বলুন ওখানকার লোক কেমন প্রকৃতির।

'অত্যন্ত হিংস্র। ওরা প্রতিবছর কুমীরের কাছে নরবলি দেয়। আর সেজন্যে বাইরে থেকে মানুষ ধরে নিয়ে যায়। আমাদের এখান থেকেও বছর বছর লোক ধরে নিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারিনি আমরা।'

'ওরা কি একেবারেই জংলী?'

'পুরোপুরি। ওদের দেশে দুই চারজন লোক আছে, যারা স্পাইয়ের কাজ করে। তারা মাঝে মাঝে বাইরে এসে সব রকম খবর নিয়ে যায়। তারা কিছু কিছু ইংরেজি বা পর্তুগীজ ভাষা বলতে পারে। শিক্ষা দীক্ষা বলতে কিছু নেই। ধর্ম হলো কুমীর দেবতার পূজা করা আর তাদের উদ্দেশে নরবলি দেয়া। ওদের দেশের শিশু থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত অস্বাভাবিক গোঁড়া।'

'আচ্ছা ওরা কি সুদূর ভারতবর্ষেও যায় মানুষ ধরবার জন্যে।'

'না। অতদূর যাওয়ার দরকার পড়ে না, এখানেই ওরা প্রচুর মানুষ পায়।'

'ওদের জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?'

'প্রচুর পরিমাণে ফলের গাছ এমনিতেই ওদের অঞ্চলে আছে। তাছাড়া নানা রকমের ফলের চাষ করে ওরা। হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, বন্যষাঁড়, হাতি, হিপোপটেমাস, এসব জন্তু শিকার করে তার মাংস খায়। কেউ কেউ গম ভূট্টার খেতও করে, তবে খুব কম।'

'আপনি এসব জানলেন কি করে?'

'আমার যুবক বয়সে, তা প্রায় আঠারো উনিশ বছর হবে, একবার ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে বলি দেবে বলে। অনেক কষ্ট করে ছুটে আসতে পেরেছিলাম। তখনই ওদের সব কিছু দেখে এসেছিলাম। আমার এখনও মনে আছে কতো বন জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আমি। এখন সেসব কল্পনা করলেও গায়ে কাঁটা দেয়। গভীর রাতে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে নিচে বাঘ-সিংহের

লড়াই দেখেছি। হাতির দল দাপাদাপি...'

শহীদ দেখলো বুড়ো এখন মস্ত বড় গল্প ফেঁদে বসবে। তাড়াতাড়ি বললো, 'আমার কাছে কতগুলো ব্যাপার বড় অদ্ভুত লেগেছে। আপনাকে বললে আপনি হয়তো তার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।'

দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে কয়েকজন নিগ্রোর ঢাকায় যাওয়ার এবং তাদের সাথে ফিরে আসবার কথা সবিস্তারে বললো শহীদ। বাবার চিঠি, শহীদের ওপর আক্রমণ, সেদিন রাতে ঘরে উঁকি দেয়া—কিছুই বাদ দিলো না সে। কুফুয়া চুপ করে শুনলো সবটা। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে তার মুখ।

ঠিক এমনি সময় বাড়ির বাইরে দশ–বারো জন লোকের হট্টগোল শোনা গেল। কারা যেন এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। শহীদ ও কুফুয়া বেরিয়ে এলো বাইরে। কয়েকজন নিগ্রো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুফুয়া ওদের ভাষায় বোধকরি জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাও তোমরা?'

ওরাও কি যেন বললো। আবার কুফুয়া কথা বলে। কি কথা হচ্ছে শহীদ তার বর্ণও বোঝে না। কিন্তু কুফুয়া যে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তা সে বেশ বুঝতে পারলো। শহীদকে ঘরের ভিতর যেতে বললো কুফুয়া। শহীদ ভিতরে চলে এলো। এসেই দেখলো কুফুয়ার স্ত্রী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিছুই বুঝলো না শহীদ। কুফুয়া আর পেণ্ডা ছাড়া কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই। আর কেউই ইংরেজি জানে না।

মিনিট পনেরো তর্কাতর্কি করে কুফুয়া ঘরের ভিতর এলো। একটা থ্রি নট্ থ্রি রাইফেল তুলে নিলো হাতে। শহীদকে বললো, 'আমি এই দরজার আড়ালে রইলাম, তুমি গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে দাঁড়াও। ভয় পেয়ো না, আমি রয়েছি পিছনে।'

শহীদ তার কথামতো বাইরে এসে দাঁড়ালো। কি ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কুফুয়া এতো উত্তেজিত হয়েছে কেন?

জন দশ–বারো লোক এগিয়ে এলো শহীদের দিকে। তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো ওরা। বিড়বিড় করে মিনিট দুয়েক তাদের নিজেদের ভাষায় কি মন্ত্র পড়লো। তারপর নিঃশব্দে ফিরে চললো তারা।

শহীদ বোকার মতো চেয়ে রইলো তাদের দিকে। কুফুয়া রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলো বাইরে, তারপর আচমকা গুলি ছুঁড়লো লোকগুলোর ওপর। একটা, দুইটা, তিনটা এমনি করে ছ'টা গুলিতে ছ'জন লোককে মাটিতে ফেললো সে। ভীষণ চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তারা। কুফুয়া এদিকে রাইফেলের ম্যাগাজিন খুলে ফেলেছে। শহীদকে বললো, 'রিভলভার ছোঁড়, আমি ততক্ষণে গুলি ভরে নিই।'

ব্যাপারটা এতো আচমকা ঘটে গেল যে শহীদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। এটুকু সে বুঝেছে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর, নইলে কুফুয়ার মতো স্থিরমস্তিষ্ক মানুষ শুধু শুধু খুন খারাপি করতে পারে না। শহীদ দ্রুত চিন্তা করছে। এই বিদেশে এসে মানুষ খুন করে জেল খাটবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

কিন্তু চিন্তা করবার আর সময় নেই। শহীদ দেখলো বাকি চার-পাঁচজন নিগ্রোর একজন সংবিত ফিরে পেয়ে পিস্তল বের করেছে। ব্যাপারটা প্রথম তারা বুঝতে পারেনি। চোখের সামনে ছ'জন সাথীর লাশ দেখে হঠাৎ ওরা রুখে দাঁড়ালো। কুফুয়ার দিকে নিশানা করেছে পিস্তলধারী। গুলি করলো শহীদ। তার গুলি পিস্তলধারীর কপাল ফুটো করে ঢুকে গেল মগজের মধ্যে। অদ্ভুত একটু গোঙানি তুলে লুটিয়ে পড়লো লোকটা। কুফুয়ার ততক্ষণে গুলি ভরা হয়ে গেছে। চোখের নিমেষে বাকি চারজন চিৎকার করে ধরাশায়ী হলো। শহীদ আর কুফুয়া এগিয়ে গেল লাশগুলোর দিকে। একজন তখনও একটু একটু নড়ছিল। রাইফেলের আগাটা তার কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিলো কুফুয়া, ব্যাস খতম। রক্তে মাটিটা লাল হয়ে গেছে।

চোখের সামনে এগারোটা মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকগুলোকে তারাই খুন করেছে। অথচ কারণ জানে না শহীদ এই নির্মম হত্যার। গা-টা গুলিয়ে আসে শহীদের, কেমন একটু বমি বমি লাগে অতো রক্ত দেখে।

হঠাৎ দূরে অনেকগুলো আলো দেখা গেল। অনেক লোক যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। বোধকরি গুলির আওয়াজ আর লোকগুলোর আর্তনাদ শুনতে পেয়ে লোকজন আসছে খবর নিতে। কুফুয়া রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এদিকে লোকগুলো ক্রমে এগিয়ে আসছে। শহীদ গিয়ে কুফুয়ার কাছে দাঁড়ালো। কুফুয়া গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে। তার জামার আস্তিন ধরে একটু টান দিলো শহীদ। বললো, 'মানুষ এসে পড়ছে। কোনরকম অসুবিধা হবে না?'

'না।' কুফুয়া তার দিকে কেমন অদ্ভুত করে তাকায়। শহীদ ভাবে, পাগল হয়ে গেল না তো ব্যাটা?

না, পাগল হয়নি। লোকগুলো এসে লাশ দেখেই খানিকটা পিছু হটে গেল। তারপর কুফুয়াকে দেখে অত্যন্ত নম্রভাবে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। কুফুয়া এগিয়ে গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে তাদেরকে কিছু একটা বোঝালো। ওরা অদ্ভুত চোখে শহীদের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার, তারপর পটাপট লাশগুলো তুলে নিয়ে কুফুয়ার পিছন পিছন চলতে শুরু করলো। শহীদও চললো ওদের সাথে সাথে। একটা কূপের মধ্যে লাশগুলো ফেলে কুফুয়ার বাড়ি থেকে কোদাল এনে মাটি কাটা শুরু করলো তারা। মাটি চাপা দিয়ে কবর দিলো তারা লোকগুলোকে। রক্তের দাগ চেঁছে ফেলা হলো। তারপর সবাই

কুফুয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এতো বড় পৈশাচিক ব্যাপার অত্যন্ত অবলীলাক্রমে যেন ঘটে গেল। এতগুলো খুন হলো, তার জন্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই এদের মধ্যে। যেন হরদমই এমন ব্যাপার দেখে আসছে তারা। এদেশে পুলিস নেই নাকি? আইন নেই কোনও? এতোই সোজা এখানে খুন করে গুম্ করে ফেলা? নাকি এই লোকগুলোর ওপর সবাই চটা? এই খুনের সাক্ষী যারা তাদের মধ্যে থেকে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? বড় অস্বস্তি লাগে শহীদের।

ঠিক এই সময় একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল দূর থেকে। গাছের তলায় আবছা আলো-অন্ধকারেও শহীদ স্পষ্ট দেখলো একজন নিগ্রো রাস্তায় পড়েই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুফুয়া বাড়ির দিকে হাঁটছে চিন্তিত মুখে। কিছু না বলে শহীদ তার পিছন পিছন চলতে লাগলো।

শহীদ ভাবছে, মহুয়ারা ফেরে না কেন এখনও?

ছয়

এদিকে বিকেল বেলা কামাল, মহুয়া, গফুর আর কুফুয়ার এক মেয়ে পেঙা জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখে আসতে গেছে। শহীদ সকালে বেশ খানিকটা ঘুরে এসেছিল, তাই ও আর গেল না। গফুরেরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো না, দিদিমণি যখন যাচ্ছে তখন সেও চললো ওদের পিছু পিছু!

জায়গাটা বেশ ছোটো। কিন্তু বহু লোকের বাস এখানে। কাঠের ব্যবসার মস্ত বড় একটা ঘাঁটি এই **Gungunyana's Ford.** কুফুয়ার বাড়ির দিকটা বেশ নির্জন কিন্তু আর একটু দক্ষিণে অনেক কুঁড়েঘর দেখা গেল পাশাপাশি। ঘরগুলো মাটির তৈরি। ওপরে খড় বা শনের ছাউনি। আলো-বাতাসের কোনো বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে। ছোটো একটা গর্ত মতো জায়গা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকা হয়, দরজাও নেই একটা। মেয়েরা কেউ বাড়ির সামনে মাটি কোপাচ্ছে, ভুট্টার খেত নিড়াচ্ছে কেউ বা ছেলে কাঁখে নিয়ে রান্না চড়িয়েছে। সবাই কামালদের দেখে কাজ ফেলে রেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। অদ্ভুত সব কাপড়-চোপড় পরা এতগুলো মানুষ কোত্থেকে এলো রে বাবা!

কামালরা আরও দক্ষিণে চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। দূরে মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট পাহাড়। কিছুদূর গিয়ে একটা বিল পাওয়া গেল। চওড়া খুব বেশি না। কিন্তু অত্যন্ত লম্বা। বহুদূর গিয়ে বাঁ পাশে বেঁকে গেছে। আরও কতদূর গেছে কে জানে। পেঙার কাছ থেকে জানা গেল ওটা একটা হ্রদ।

কামাল বললো, 'বাড়ির এতো কাছে এতো সুন্দর হ্রদ আছে আগে বলেননি কেন? বোকার মতো আমরা তোলা জলে স্নান করলাম।'

'বোকার মতো নয়, বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন, মি. কামাল। এখানে নামলে আর ফিরতে হতো না। চিরকালের জন্যে রয়ে যেতে হতো।' সুন্দর পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো পেণ্ডা। মিশনারীদের স্কুলে পড়ে খুব ভালো আয়ত্ত করেছে সে ইংরেজি উচ্চারণ।

'কি ব্যাপার, এখানেও কুমীর নাকি!'

'ছিলো না আগে। কুমীরের ভয়ে মানুষ লিম্পোপোতে নামতো না, আগে এখানেই স্নান করতো। কিন্তু কি করে জানি কুমীরেরা এ জায়গার খোঁজ পেয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই হ্রদ থেকে একজন মানুষকে মুখে নিয়ে একটা কুমীর লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠলো, তারপর প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মানুষজন তাড়া করেছিল। কিন্তু কেউ এগোতে পাড়লো না। লেজের প্রচণ্ড ঝাপটায় বড় বড় মাটির চাকা আর পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেল কুমীরটা। তারপর থেকে তিন–চারদিন একই ব্যাপার ঘটলো। প্রতিদিনই কয়েকজন মানুষ মুখে করে নিয়ে যায় কুমীর। রাতে চুপি চুপি এসে ঘাটের কাছে জলের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে থাকে, দিনের বেলায় সুযোগ পেলেই একজন লোককে মুখে করে নদীতে চলে যায়। তারপর পাহারাদার বসিয়ে দেয়া হলো, কাউকে আর নামতে দেয়া হতো না। এখন আর কেউ নামে না এখানে। ভুল করে বিদেশী কেউ নামলে সাথে সাথে কুমীরের পেটে যায়।'

'এখানকার সবাই কি তাহলে তোলা জলে স্নান করে রোজ?'

'এখানে সবাই এক সপ্তাহ পর পর স্নান করে। কেউ কেউ আরও দেরিতে করে। তোলা জলে স্নান করতে অসুবিধে বিশেষ হয় না।'

সূর্য অস্ত গেছে। মহুয়া বললো, 'ফেরা যাক এখন, পেণ্ডা। অনেকদূর এসে পড়েছি, বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।'

'আর একটু গিয়েই ফিরবো আমরা। ওই সামনের বাঁকটায় গেলেই দেখতে পাবেন, আমাদের এখানকার সবচাইতে আশ্চর্য জিনিস।' পেণ্ডা দ্রুত হাঁটে।

বাঁকটায় পৌঁছেই আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। সামনে বিরাট মাঠ, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল মাঠ আর মাঠ। গমের চাষ করা হয়েছে সে মাঠে। এখন গম পাকবার সময়। সোনালি হয়ে গেছে সমস্ত মাঠ। দূরে একটা গিরিশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মাথায় তার জমে আছে বরফ। সূর্যের আলো পড়েছে বরফের ওপর। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের মাথাটা ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। সে পাহাড় থেকে একটা মিষ্টি আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে একটা স্বপ্নের আবেশ মেখে দিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

বিস্তার আর উচ্চতা ঠিক এমনভাবে বোধহয় আর কোথাও একত্র মেশেনি। এখানে এসে দাঁড়ালে মনটাও হয়ে ওঠে প্রশস্ত, আর বৃহৎ।

অনেকক্ষণ কামাল আর মহুয়া মোহগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। পাহাড়ের ওপরের আলোটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। কারও কোনদিকে খেয়াল নেই।

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে পেণ্ডা বললো, 'চলুন, ফেরা যাক।'

'চলুন।' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে কামাল। কিন্তু ফিরতে তার মোটেই ইচ্ছে করছে না। এ সৌন্দর্যের যতটুকু পারে পান করে নিতে চায় সে।

ধীরে ধীরে তারা বাড়ির দিকে চললো। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কামাল বললো, 'এতো সুন্দর জায়গা, বিকেল বেলা কেউ বেড়াতে আসে না কেন?'

'সময় পেলে তো মানুষ আসবে। কেবল খেয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টাতেই এখানকার সব লোকের সময় চলে যায়। আমাদের দেশটা বড় গরীব। সব কিছুই শুষে নিচ্ছে ইংরেজ। সৌন্দর্য বোধটুকুও আর নেই।' পেণ্ডার গলাটা কেমন যেন একটু ভারি হয়ে আসে। একটু কৃত্রিম হাসি হেসে বললো, 'কিন্তু আমার তো জীবন–সংগ্রাম নেই, তাই আমি প্রায়ই আসি এখানে সৌন্দর্য উপভোগ করতে, পয়সার অভাব না থাকলে জীবনে কতো রস ভোগ করা যায়।'

কামাল মনে মনে আশ্চর্য হলো। এতো বোঝে এই কচি মেয়েটা! এর চোখ খোলা। সব কিছুই পরিষ্কার করে দেখবার ক্ষমতা আছে এর! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কামাল বললো, 'আচ্ছা, 'পেণ্ডা' মানে কি?'

'পেণ্ডা মানে?' একটু হেসে বললো, 'পেণ্ডা মানে 'ভালবাসা'।' হ্রদটার পাশ দিয়ে চলতে মহুয়ার খুব ভয় করছে। সে পেণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলো, 'যে কোনো মুহূর্তে আমাদের একজনকে তো কুমীরে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তাই না?'

'কি বললেন? কুমীর? না। ডাঙার ওপর ওরা আক্রমণ করে না। মানুষের সাড়া পেলে আরও ঝুপঝুপ জলে লাফিয়ে পড়ে। অবশ্য এমনও দেখা গেছে, একলা নিরস্ত্র পেয়ে ডাঙার ওপরেও মাঝে মাঝে আক্রমণ করেছে মানুষকে। কিন্তু তিন–চারজন দেখলে ওরা কখনও এগোয় না। আসলে কুমীর জাতটা অত্যন্ত ভীতু। ঠিক বড় লোকদের মতো।'

হ্রদটা ছাড়িয়ে এলো তারা। আঁকাবাঁকা পথ। পথের দু'পাশটায়–মাঝে মাঝে অনেকগুলো বড় বড় গাছ আছে। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। তারপর আবার ফাঁকা।

গফুর বেশ একটু পিছিয়ে পড়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে ধীরে ধীরে আসছে! যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্যে সে ভালো করে নজর করে দেখেছে মাঝে মাঝে কামালদের। পথ হারিয়ে ফেললে ও আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। দাদামণিরা ইংরেজিতে কথা বলে

ওদের সাথে, কিন্তু সে তাও জানে না। এখানকার একটা ব্যাটাও বাংলা বোঝে না।

কিছুদূর গিয়ে গফুর আর কামালদের দেখতে পেলো না। একটা ঘন অন্ধকার জায়গায় তারা অদৃশ্য হয়েছে। বিড়িটা শেষ হয়ে গেছে, একটা সুখ টান দিয়ে গফুর ফেলে দিলো বিড়ি। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চললো সে। অন্ধকার জায়গাটায় এসে পড়েছে, গফুর, এমন সময় কাছেই একটা ঝটপটির আওয়াজ শোনা গেল। কয়েকজন মানুষ মৃদুস্বরে কথা বলছে। গফুরের কেমন যেন সন্দেহ হলো। কামাল ভাইদের দেখা যাচ্ছে না কেন? সে কি জোরে ডাকবে নাম ধরে? না, তাতে বিপদ হতে পারে।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো সে। কাছেই একজন লোক টর্চ জ্বালালো। সেই আলোতে গফুর দেখলো, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে কামাল, পেণ্ডা আর তার দিদিমণি। সবারই মুখের মধ্যে কাপড় গোঁজা। কেউ চিৎকার করতে পারছে না। আট দশজন লোক তাদেরকে কাঁধের ওপর তুলে নিলো। তারপর পিছনে যতদূর দেখা যায় টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে হাঁটা শুরু করলো যে পথে ওরা গিয়েছিল সেই পথেই।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল গফুরের। কিছু না পারে, অন্ততঃ একজন লোকের টুঁটি তো সে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে। তারপর যা হয় হোক। তার দিদিমণিকে আক্রমণ করার মজা সে টের পাইয়ে দেবে। ওদের দিকে জোরে হাঁটা শুরু করলো গফুর। পরক্ষণেই আবার ভাবলো, এতো লোককে আক্রমণ করা মানেই এদের হাতে বন্দী হওয়া। তা সে চায় না। দাদামণিকে সব খবর দিতে হবে, নইলে উদ্ধারের কোনো পথই থাকবে না। এদের পিছনে পিছনে গিয়ে দেখতে হবে এরা যায় কোথায়।

বেশ কিছুটা পিছিয়ে এলো সে। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো লোকগুলোর উপর।

কুফুয়ার বাড়ি বাঁ দিকের রাস্তায়, সে রাস্তায় না গিয়ে এরা ডান দিকের একটা পথ ধরলো। অনেকটা পিছনে গফুরও চললো। মাঝে মাঝে বড় ফাঁকা জায়গা পড়লে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় ধরা পড়বার ভয়ে।

ডান দিকের রাস্তা ধরে বরাবর মাইল দু'য়েক চলে গেল তারা। এদিকে লোকালয় নেই। গাছ-গাছঁড়া বেশ ঘন হয়ে এসেছে। পথটা সরু হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। আর কিছুদূর গেলেই ঘন বনের মধ্যে পড়বে তারা।

আকাশে চাঁদ উঠছে এখন। বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে অন্ধকার। একটা বাঁক ঘুরতেই গফুর ডাকবাংলোর মতো ফুটফুটে একটা বাড়ি দেখতে পেলো। কাঠের বাড়ি, বাইরেটা চুনকাম করা। চাঁদের আলোয় ধব্ ধব্ করছে বাড়িটা।

লোকগুলো সে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একজন এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খুললো, তারপর সবাই ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে।

একটা গাছের আড়ালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো গফুর। কেউ আর বাইরে আসে না। আরও খানিকক্ষণ পর চারজন লোক বেরিয়ে এলো বাড়িটা থেকে। তারা ফিরে চললো যে পথে এসেছিল সেই পথে। সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল বাড়িটার। অনেকখানি পিছনে থেকে গফুরও চললো ওদের সাথে সাথে। অনেকদূর গিয়ে একটা ছোটো খড়ের ঘরে ঢুকলো ওরা সবাই।

কিন্তু এই বাড়িগুলো এমন কেন? একটা এদিকে আরেকটা ওদিকে এবড়ো-খেবড়ো করে সাজানো। বিকেলবেলা বেড়াতে যাওয়ার সময় তো বাড়িগুলো এমন দেখেনি সে, পরিপাটি করে সাজানো ছিলো সেসব কুঁড়েঘর। পথ ভুল হলো নাকি? হ্যাঁ, ঠিক ভুল পথে এসেছে সে।

আবার অনেকদূর ফিরে গেল গফুর। রাস্তাগুলো এমন যে চেনা যায় না, এঁকেবেঁকে চলেছে পথ। এক রাস্তা থেকে আবার বহু রাস্তা বেরিয়েছে। ঠিক সমানই চওড়া। সেগুলো আবার ঠিক অন্য সব রাস্তার মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। একটা রাস্তা আন্দাজ করে গফুর চলতে শুরু করলো। মাইলখানেক যাওয়ার পর দেখলো সামনে লিম্পোপো নদী। আবার ফিরে গেল সে।

এমনিভাবে অনেক ঘুরেও ঠিক রাস্তা সে কিছুতেই চিনতে পারছে না। রাগে, দুঃখে, ক্লান্তিতে তার অবস্থা কাহিল। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে। আর চলা যায় না। রাতও এদিকে অনেক হয়েছে। তার বুদ্ধি লোভ পাওয়ার উপক্রম হলো। অনেকক্ষণ রাস্তার উপর বসে রইলো। একটা বিড়ি খেলো। তারপর আবার চলা শুরু করলো সে। এদিকে আকাশে মেঘ করেছে অনেকক্ষণ ধরে। চাঁদ সেই যে মেঘের আড়ালে গেছে আধঘন্টা আগে আর বেরোবার নাম নেই। আবছা ভাবে পথ দেখা যাচ্ছে। অনেকদূর এসে সে কতগুলো বাড়ি দেখতে পেলো। কিছুমাত্র উৎসাহিত হলো না সে। এই গোলক-ধাঁধায় পড়ে তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেছে ঘুরতে ঘুরতে। এদিকে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নেমে এলো বড় বড় ফোঁটায়।

আর চিন্তা করবার অবসর নেই। সে ছুটে গেল একটা বাড়ির সামনে। ছোট্ট দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগলো, 'কে আছো ভাই বাড়িতে ও···ও ভা···ই, কে আছো?'

একজন বৃদ্ধ নিগ্রো বেরিয়ে এলো। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হয়েছে সে। গফুর তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আরও কয়েকজন লোক ঘুম থেকে উঠে এসেছে। গফুরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তারা। একজন কি জানি জিজ্ঞেস করলো গফুরকে। কিছু বুঝলো না গফুর। ওরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে তাকে। প্রমাদ গোনে গফুর। আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল তো। কেউ ওর কথা কিছু বুঝবে না। হঠাৎ

ওর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ও বললো, 'এই হারামজাদারা, তোরা কি আমাকে কুফুয়ার বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবি?'

এইবার বুঝলো তারা। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কুফুয়া কুফুয়া করে কি কি সব বলাবলি করতে লাগলো। তারপর একজন জোয়ান নিগ্রো তার হাত ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলো। গফুরকে সঙ্গে আসতে ইশারা করে সে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করলো। প্রায় পাঁচ–ছ' মাইল হাঁটার পর গফুর চিনতে পারলো, বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। লোকটার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তারপর একটা বিড়ি বের করে দিলো। লোকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে নিজে বিড়ি ধরালো। বাংলায় বললো, 'এইভাবে খেতে হয়।' বলে টান দিয়ে দেখালো। লোকটা বুঝতে পেরে বিড়িটা ধরিয়ে নিলো। একবারও কাশলো না দেখে গফুর বুঝলো তামাকে অভ্যাস আছে ব্যাটার। আরও কয়েকটা বিড়ি সে ধরিয়ে দিলো লোকটির হাতে। খুব খুশি হলো নিগ্রোটা। গফুর বাড়ি চিনতে পেরেছে দেখে সে ফিরে চলে গেল একটা বিট্‌কেল হাসি দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। বাড়ির কাছে এসেই থ হয়ে গেল গফুর। বাড়ি তো নেই, অনেক ছাই গাদা হয়ে রয়েছে। বাড়ি পুড়ে গেছে। কেউ নেই আশেপাশে। স্তম্ভিত হয়ে কাদার মধ্যেই মাটিতে বসে পড়লো গফুর।

সাত

শহীদ আর কুফুয়া ঘরে ফিরে এসে একটা চৌকিতে বসলো। শহীদ জিজ্ঞেস করলো 'ধরা পড়বেন না পুলিসের হাতে?'

'না। ধরা পড়লেও ভয়ের কারণ নেই।'

'কেন?'

'যে লোকগুলোকে খুন করা হলো ওদের এদেশে প্রবেশাধিকার নেই। সরকারীভাবে বহু আগেই আইন পাস হয়েছে। এরা গায়ের জোরে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের লোকের সাথে এরা এমনভাবে মিশে যায় যে এদের চিনে বের করে তাড়াতে পারছে না পুলিস। আর চিনতে পারলেও সব সময় সাহসও পায় না।'

'এরা থাকে কোথায়?'

'বোঙ্কারা। সেখানেই ওদের বাসা।'

'I see! অনেক মিলে যাচ্ছে। ঢাকায় যে সব লোক গেছিলো তারাও বোঙ্কারার লোক। তারাও আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে মন্ত্র পড়েছিল।'

'হ্যাঁ। এই এদের নিয়ম,' গম্ভীরভাবে বলে কুফুয়া।

'এরা কি যে কোনও একজন নতুন লোকের সামনে এমনি করে?'

'সে সব বলতে গেলে অনেক কথা, শহীদ। তোমাকে পরে সব গুছিয়ে বলবো। এখন এ প্রসঙ্গ থাক। তোমাকে নিয়ে সকালবেলা বাইরে যাওয়াই উচিত হয়নি। I should have doubted this befor.'

'আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না, মি. কুফুয়া। Will you kindly make it clear?'

'পরে শহীদ, পরে।'

'আপাততঃ একটা কথার জবাব দেবেন কি?'

'কি কথা?'

'এতগুলো মানুষ শুধু শুধু খুন করলেন কেন?'

'Oh Shahid! You're questioning like a pleader

যাক তোমার যখন এতোই আগ্রহ, তখন শোনো। এদের খুন না করলে আজ রাতে এ বাড়ি আক্রমণ করে বা যে করেই হোক তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যেতো বোঙ্কারায়। সকালে আমার সাথে তোমাকে দেখেছে ওরা। তাই সন্ধ্যায় এসে হাজির হয়েছিল তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি ভয় দেখিয়েছিলাম যে ঘরের মধ্যে আমার দশ–বারজন লোক আছে। ওদের কেবল মাত্র ইশারা করলেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই ওরা শেষ পর্যন্ত এই শর্তে রাজি হয়েছিল যে ওরা কেবল প্রার্থনা করেই ফিরে যাবে। সত্যি সত্যিই তাই তারা যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম এদের কিছুতেই বাঁচতে দেয়া যেতে পারে না। আজ এরা এমনিতেই ফিরে যাচ্ছে বটে কিন্তু যে কোনও উপায়ে এরা তোমাকে হস্তগত করবেই। তাই সব ক'জনকে শেষ করে দিলাম। এখন তোমাকে লুকিয়ে কোনও মতে ভারতগামী জাহাজে তুলে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

'এরা আমাকে কেন নিয়ে যেতে চায়?'

'ছাড়বে না যখন, তখন গোড়া থেকেই বলি। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বোঙ্কারা অঞ্চলের অসভ্য অধিবাসীরা কুমীর পূজা করে। এর জন্যে তাদের একজন পুরোহিত থাকে। তাদের ধারণা পুরোহিতই একমাত্র কুমীরের কোপ থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই পুরোহিতের সামনে রোজ সন্ধ্যায় এরা হাঁটু গেড়ে বসে কুমীর দেবতার আনুগত্য স্বীকৃতির শ্লোক উচ্চারণ করে। ওদের পুরোহিত যখন বুড়ো হয়ে যায় তখন এরা দেশ–বিদেশে লোক পাঠায় আরেকজন পুরোহিত ধরে আনার জন্যে। নতুন পুরোহিতের চেহারা অনেকটা পুরোনো পুরোহিতের মতো হওয়া চাই। নতুন পুরোহিতকে

কাজ বুঝিয়ে দেয়ার পর পুরোনো জনকে লিম্পোপোর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার চেহারা পুরনো বৃদ্ধ পুরোহিতের মতো দেখতে। তাই তাঁকে ছুটি দেয়ার জন্যে ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

শহীদের মাথায় বোঁ করে অনেকগুলো চিন্তা ঘুরে গেল। তবে কি তার বাপকেও ওরা নিয়ে গেছে? নইলে তার ঠিকানা পেয়ে ওরা ঢাকায় যাবে কি করে? তার বাবা কি এখন বন্দী হয়ে বোঙ্কারার পুরোহিতের কাজ করেছেন? বাবার চিঠির অদ্যোপান্ত মনে পড়লো ওর।

'তোমার মাথায় এখন যে সব চিন্তা ঘুরছে, সে সব কথা আমার মাথায়ও আজ সন্ধ্যায় ঘুরেছে। তাই অতো গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছো তো, কেন খুন করেছি এতো লোককে? ওরা তোমাকে দেখে ফেলেছিল, আর মনে মনে পুরোহিত হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। ওদের পথ থেকে সরিয়ে না ফেললে তোমার খুবই বিপদ হতো। ওরা গিয়ে শত শত লোককে খবর দিতো। তাদের ঠেকাতাম কি করে?'

'ওদের সবাই কিন্তু মারা পড়েনি, মি. কুফুয়া। আমরা যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন দেখেছি একজন লোক গাছের আড়াল থেকে সরে রাস্তায় পড়েই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'তাই নাকি? আগে বলোনি কেন?' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো কুফুয়া। চিন্তিত মুখে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলো সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'তোমাদের লঞ্চটা আছে না? আজ রাতে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে থাকবো। গয়না-গাটি টাকা-পয়সাও সাথে নিতে হবে। আজই রাতে হয়তো দল বেঁধে বাড়ি ঘেরাও করে খুনের প্রতিশোধ নিতে আসবে। তার আগেই আমাদের সরে পড়তে হবে। আমরা অল্প কয়েকজন ওদের অতো লোক ঠেকাতে পারবো না।'

'কিন্তু কামালরা ফিরছে না কেন? রাত তো অনেক হলো।'

'পেগুার সাথে গেছে, অতএব পথ হারাবার ভয় নেই।'

'আমি ভাবছি, কোনও বিপদে পড়লো না তো?'

'বোঙ্কারার লোক ছাড়া এখানকার সব লোকই মোটামুটি ভালো। তাছাড়া পেগুা রয়েছে সাথে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে পেগুা।'

শহীদ কিন্তু অতোটা নিঃসন্দেহ হতে পারে না। মনটা খুঁত খুঁত করছে তার অমঙ্গল আশঙ্কায়। তাছাড়া ওরা যদি ফিরে এসে ওই নিগ্রোগুলোর হাতে পড়ে?

কুফুয়া বাড়ির ভিতরে গিয়ে কি কি যেন বললো ওর স্ত্রীকে। কিছুক্ষণ খুট-খাট শব্দ হলো, তারপর দু'জন চাকর আর স্ত্রীকে নিয়ে কুফুয়া বেরিয়ে এলো। শহীদ বললো, 'কামালরা ফিরে এসে যদি ওদের হাতে পড়ে?'

'পড়বে না। আমরা জিনিসপত্র লঞ্চে রেখে আবার ফিরে আসবো। গাছের আড়ালে থেকে পাহারা দেবো। ওরা এলেই দূর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো। যাক, এখন তাড়াতাড়ি চলো লঞ্চে যাওয়া যাক। এরমধ্যে এসে পড়লে ওরা অপেক্ষা করবে।'

লণ্ঠন হাতে নিয়ে তারা লঞ্চে গিয়ে উঠলো। দুইটা বড় বড় বাক্স নামিয়ে রাখলো কুফুয়ার চাকরেরা।

'আর কিছু দামী জিনিস নেই বাড়িতে?'

'না। আমরা দুই-একদিনের মধ্যেই আমাদের নতুন বাসায় উঠে যাচ্ছিলাম। সব জিনিসপত্র সেখানে পাঠানো হয়ে গেছে। **But where's your driver, shahid?** (কিন্তু তোমার ড্রাইভারটা গেল কোথায়?)

'তাই তো! মি ব্লাইদ গেল কোথায়? নেই তো লঞ্চে।'

শহীদ সবখানে খুঁজলো লঞ্চের কোথাও নেই মি. ব্লাইদ। কুমীরে খেলো না তো, শহীদ ভাবে। কুফুয়া বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমরা তো বলেই গেছিলাম, তিন-চারদিনের আগে লঞ্চ ছাড়া হবে না। মি. ব্লাইদ বোধহয় এখন তাড়িখানায়। যুবক মানুষ, বুঝলে না?' হঠাৎ সুর বদলে কুফুয়া বললো। 'কিন্তু আমাদের এখন ফিরতে হবে। **Be quick.**'

কুফুয়ার স্ত্রীকে লঞ্চে রেখে ওরা চারজন চলে এলো বাড়ির কাছে। সকলের কাঁধে রাইফেল। পকেটে একটা পয়েন্ট থ্রি টু ক্যালিবারের রিভলবারও নিয়েছে শহীদ। বাড়ি থেকে বেশ দূরে এক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো ওরা। কামালদের দেখলেই তাদের নিয়ে লঞ্চে চলে যাবে। আর যদি তার আগেই নিগ্রোগুলো এসে পড়ে, তাহলে তাদের নিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ না ওরা ফিরে যায়। কুফুয়ার বাড়ির দুই পাশে অনেক ছোটো বড় গাছ জঙ্গলের মতো হয়ে আছে, ধরা পড়বার ভয় খুব কম।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। রাত দশটা কি এগারোটা বাজে। চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। জনপ্রাণী সবাই ঘুমে অচেতন। একটা ভীষণ কিছু ঘটবার আগে যেমন গুমোট হয়ে যায়, চারদিকটা তেমনি চুপ, তেমনি গুমোট।

হঠাৎ বহু দূরে অনেকগুলো পদধ্বনি শোনা গেল। যেন বীর দর্পে অনেক সৈনিক পা ঠুকে ঠুকে এগিয়ে আসছে। ক্রমেই শব্দটা স্পষ্ট হতে লাগলো। কুফুয়া এসে শহীদের পাশে দাঁড়ালো। ফিসফিস করে বললো, 'ওই শোনো। ওরা এগিয়ে আসছে। ভয় পাওনি তো?'

'না, ভয় পাইনি।'

আরও এগিয়ে এলো তারা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। ক্রমে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শহীদ দেখলো, জ্বলন্ত মশাল হাতে প্রায় শ'দুয়েক লোক এগিয়ে আসছে কুফুয়ার বাড়ির দিকে। মশালের লাল আলো, আর নিগ্রোগুলোর কালো বিকট মুখ একটা ভয়াল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সকলের হাতে একটা করে বর্শা। আলো পড়ে চিকচিক করছে ফলাগুলো।

আরও ঘন জায়গায় সরে গেল শহীদ আর কুফুয়া। সামনে থাকলে এতো আলোতে ধরা পড়ে যেতে পারে।

লোকগুলো যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন সামনের লোকটাকে দেখে চমকে উঠলো শহীদ। এ তো সেই লম্বা সর্দার! আজই এখানে পৌঁছে এদের দলে যোগ দিয়েছে। সব লোকের মধ্যে কেবল তার হাতেই একটা রাইফেল। আজ তারা শহীদকে ধরে নিয়ে যাবেই।

ওরা ভাবছিলো, কাছাকাছি আসতেই গুলি ছুঁড়বে কুফুয়ার লোক। কিন্তু কোনও বাধা না পেয়ে বরাবর এসে থমকে দাঁড়ালো তারা বাড়ির সামনে। কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো কয়েকজন বাড়ির মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই আবার তারা বেরিয়ে এলো। সবাইকে ডেকে লম্বা লোকটা কি যেন বললো চিৎকার করে। হৈ-চৈ পড়ে গেল ওদের মধ্যে। আশেপাশে অন্ধকার জায়গাগুলো ওরা খোঁজা শুরু করলো। এই দেখে শহীদ আর কুফুয়া এক পা এক পা করে পিছনে হেঁটে অনেক দূর পিছিয়ে গেল।

হঠাৎ শহীদ লক্ষ্য করলো আকাশটা লাল হয়ে গেছে। কুফুয়া বললো আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিলো ওরা। জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ শহীদরা পেয়েছে, কিন্তু এতোটা আন্দাজ করেনি।

অনেকক্ষণ ওরা বাড়িটার চারপাশে হৈ-চৈ করলো, তারপর ফিরে চলে গেল।

'ওরা বোধহয় লঞ্চে খোঁজ করতে চললো। ওখানে আপনার স্ত্রী একা রয়েছেন।'

'যাবে না ওরা লঞ্চে। রাতেরবেলা নদীর পঞ্চাশ হাতের মধ্যে ওরা যায় না। ধর্মের নাকি নিষেধ আছে। সেজন্যেই আমি জিনিসপত্র লঞ্চে উঠিয়েছি। কাল দিনের বেলা নতুন বাড়িতে চলে যাবো।'

'আমার জন্যেই আপনার এতো কষ্ট হচ্ছে।' শহীদ বিনয় করে বলে।

'Don't say this young man. I feel insulted. আমার অতিথির জন্যে কি আর কেউ কষ্ট বরণ করবে? Will I bear it? I do all these surely for my own sake, not your's. একথা বলে আমাকে অপমান করো না।'

কাঠের বাড়ি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে যেমন বেশি সময় লাগেনি, তেমনি আগুন নিভে আসতেও আধঘন্টার বেশি লাগলো না। সমস্ত ভস্ম হয়ে গেছে। স্তূপের মধ্যে অবশ্য আগুন এখনও গনগন করছে। কিন্তু তাও নিভে গেল প্রচণ্ড বৃষ্টিতে।

শহীদ কুফুয়া আর কুফুয়ার চাকর দুজন তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কামালরা এখনও ফিরছে না কেন? রাত আড়াইটা বেজে গেছে। নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে ওরা। কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গেলে অন্ততঃ একটা খবর তো পাঠাতো পেণ্ডা। কিন্তু এখন কোথায় খুঁজবে ওরা? ভোর পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। কুফুয়ার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে আবার চাঁদ উঠেছে। শহীদ দেখলো একজন লোক এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। কুফুয়া রাইফেল তুললো। শহীদ তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিলো হাতের ইশারায়। লোকটা এগিয়ে এসে দেখলো বাড়ি আর নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা মাটিতে বসে পড়লো। শহীদ এবার চিনতে পেরেছে। ডাক দিলো, 'কে ওখানে, গফুর না?'

'হ্যাঁ দাদামণি। তুমি কোথায়?' অকুল সাগরে কূল দেখতে পেয়েছে গফুর।

শহীদ বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে। জিজ্ঞেস করলো, 'কামাল, মহুয়া কই?'

গফুর গড়গড় করে বলে গেল সব ঘটনা। শহীদ আবার ইংরেজিতে কুফুয়াকে বললো।

'জিজ্ঞেস করো তো পথ চিনতে পারবে কিনা ও,' কুফুয়া বলে।

গফুর বললো, 'পারবো যদি ওই বিলটা পর্যন্ত কেউ আমাকে নিয়ে যায়।'

গফুরকে নিয়ে অনেক ঘুরাঘুরি করে শহীদ আর কুফুয়া একটা জায়গায় এলো। সেখানে মাটিতে কি যেন একটা সাদা মতো পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে দেখলো, মহুয়ার রুমাল। গফুর এবার চিনতে পেরেছে। বললো, 'এই পথে সোজা গিয়ে একটা ডাকবাংলোর মতো বাড়ি, বাইরে দিয়ে সাদা রং করা।'

কুফুয়াকে এই কথা বলতেই ঠোঁট কামড়ে ধরলো কুফুয়া। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, 'ওই বাড়িটা আমাদের বাড়ি। সামনের সমস্ত বন আমি কিনে নিয়েছি। সেখানে পাহারা দেবার জন্যে একটা বাড়ি তুলেছিলাম অনেক আগে, ইদানীং সেটা মেরামত করেছি। ওখানেই আমাদের উঠে যাওয়ার কথা। এদিকে আর কোনো বাড়িতে তো white-wash করা নেই।'

কুফুয়াই আগে আগে চললো পথ দেখিয়ে। অনেকদূর। পথ আর ফুরোয়ই না। সবাই ক্লান্ত। ধীরে ধীরে চলেছে তারা।

যখন দূর থেকে বাড়িটা দেখা গেল, গফুর চিনতে পেরে বললো, 'এই বাড়িই দাদামণি।'

সবাই বাড়িটার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। বাড়ির ভিতরকার সব ঘরগুলোর দরজায় তালা দেয়া। কেবল একটা দরজা দুপাট খোলা। রাইফেল বাগিয়ে ধরে সবাই একসাথে ঢুকলো সে ঘরে।

দেখা গেল চারজন জোয়ান নিগ্রো হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। আর কেউ কোথাও নাই।

কুফুয়া আশ্চর্য হয়ে বললো,'My sons!' (আমার ছেলে!)

আট

কামাল মহুয়া আর পেণ্ডাকে কাঁধে করে লোকগুলো একটা ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বেলে দিলো একজন। সেই আলোতে কামাল চেয়ে দেখলো পেণ্ডার চোখ বাঁধা। মহুয়ার চোখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ। তিনজনেরই মুখের মধ্যে কাপড় গোঁজা। কথা বলবার উপায় নেই।

চারজন লোক বিদায় নিয়ে চলে গেল। একজন তাদের বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে এলো। এইবার তারা কামাল আর মহুয়ার মুখে গোঁজা কাপড় খুলে ফেললো। স্পষ্ট ইংরেজিতে একজন জিজ্ঞেস করলো,'Where is the cheque kufua gave you this morning?' কুফুয়ার চেকটা বের করো দিকি।

পেণ্ডা একটু চমকে উঠলো। কামালও যেন একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর ইংরেজিতে বললো, 'সেটা আমার কাছে নেই।'

'তবে কার কাছে আছে? এই ভদ্রমহিলার কাছে নিশ্চয়ই!'

কামাল জানতো চেকটা মহুয়ার কাছে ছিলো, আর সেটা ওর ভ্যানেটি ব্যাগের মধ্যেই ছিলো। সে তাড়াতাড়ি বললো, 'সে চেক আমাদের কারো কাছে নেই, আমার বন্ধু শহীদ সেটা নিজের কাছেই রেখেছে।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলো লোকটা। 'ভালোয় ভালোয় চেকটা বের করে দাও। আমি কথা দিচ্ছি তারপর তোমাদের ছেড়ে দেবো। চাই কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। আমি জানি সেটা তোমাদের দুজনের একজনের কাছেই আছে, শহীদের কাছে নেই।'

'তুমি সেকথা গায়ের জোরে বললেই হবে? আমি বলছি, নেই আমাদের কাছে।'

'তাহলে বাধ্য হবো তোমাদের search করতে।'

'সার্চ করলেও কিছু পাবে না।'

'Well let's try. বেশ দেখা যাক।'

একজন লোককে ইশারা করতেই সে মহুয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিলো। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু কোনো চেক নেই ওর মধ্যে। তারপর লোকটা কামালের দিকে এগিয়ে এলো। সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু চেক পাওয়া গেল না। এবার সে মহুয়ার দিকে এগোলো। কামাল চিৎকার করে ওঠে, 'খবরদার! মেয়েমানুষের শরীরে হাত দিয়ো না বলছি।'

'Then hand the cheque over.' তাহলে চেক দিয়ে ফেলো।

'আমাদের কাছে নেই তো দেবো কি করে?'

সেই লোককে আবার ইশারা করলো লোকটা। সে এগিয়ে গেল মহুয়ার দিকে। ইশ্, এখন যদি কামালের হাত পায়ের বাঁধন না থাকতো! টুঁটি টিপে ধরে খুন করতো সে ওই ব্যাটাকে। লোকটা মহুয়ার গায়ে হাত দিতে যাচ্ছে। কামাল অন্য দিকে মুখ ফিরায়।

ঠিক এমনি সময় দরজার কাছ থেকে একটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'Hands up, you rascals! don't move a single step.' (মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও—একপা নড়বে না কেউ।)

চমকে ফিরে দাঁড়ালো সবাই। একটা প্রকাণ্ড নিগ্রো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনের দরজা জুড়ে। হাতে উদ্যত রিভলবার।

সবাই মাথার উপর হাত তুললো। সেই ভীষণ দর্শন নিগ্রো এবার আদেশ দিলো ওদের একজনকে, 'Untie that gentleman.' (ঐ ভদ্রলোকের বাঁধন খুলে দাও।)

একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো লোকটা গিয়ে কামালের বাঁধন খুলে দিলো।

এইবার নিগ্রোটা কামালকে উদ্দেশ্য করে পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'তুমি এবার মহুয়া আর ওই মেয়েটার বাঁধন খুলে ফেলো। তারপর সব রশি একত্র করে এই ব্যাটাগুলোকে আচ্ছা করে কষে বাঁধো।'

তাজ্জব বনে গেল কামাল। এই কাফ্রী মুল্লুকে অপরিচিত নিগ্রোর মুখে বাংলা কথা! কুয়াশা নয় তো। কিন্তু সে তো জাহাজ থেকে নামেনি!

'হাঁ করে কি দেখছো কামাল? আমিই কুয়াশা।'

বিস্ময়ে মহুয়ার মুখ হাঁ হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'দাদা!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারজন নিগ্রোকেই কষে বেঁধে ফেললো কামাল। তারপর ওরা

সবাই বেরিয়ে এলো সে বাড়ি থেকে। মহুয়ার হাত ধরে চলেছে কুয়াশা।

'তুমি কি করে খোঁজ পেলে দাদা?'

'আমি তোদের কাছাকাছিই ছিলাম বোন।'

'ওরা বোধহয় এখানকার চোর ডাকাত, তাই না?'

'ওরা হচ্ছে কুফুয়ার চার ছেলে।'

'অ্যাঁ! কুফুয়ার ছেলেরা ডাকাত?'

'ডাকাত না। তোরা বিদেশ থেকে হঠাৎ উড়ে এসে নব্বই হাজার টাকা খসিয়ে নিয়ে চলে যাবি, তা ওরা কিছুতেই সহ্য করবে না। কিন্তু বাবাকে কিছু বলতেও পারে না এদিকে। তাই প্ল্যান করে ঠিক করলো, কুফুয়া চেক লিখে দেয়ার পর তোদের কাছ থেকে ওরা কেড়ে নেবে সে চেক। তারপর তোরা লরেঞ্জো মারকুইসে পৌঁছবার আগেই সেটা ভাঙিয়ে নেবে ব্যাংক থেকে। কুফুয়া একবার চেক দিয়েছে, তার আর কোনো দায়িত্ব নেই। তোরা সে চেক হারিয়েছিস তো তার কি? সে আর তোদের টাকা দেবে না।'

'ভালো বুদ্ধি খাটিয়েছিল তো! একদিকে বাবাকেও শান্ত রাখতে পারলো, অন্য-দিকে ওদের টাকা ওদের কাছেই রইলো।'

আরও অনেক কথা হলো ওদের মধ্যে।

'তোমরা কাল ভোরেই রওনা হয়ে যাও কামাল। নইলে আরও নতুন বিপদ আছে তোমাদের কপালে। শহীদ বোধহয় ফিরতে চাইবে না এতো তাড়াতাড়ি, বোধহয় বোম্বারায় যাবে। সেখানে হলেও কালই লঞ্চ ছেড়ে দিও।'

'এতো তাড়া কিসের? আগে দু'চারদিন বেড়িয়ে নিই, তারপর...'

'তোমাদের পিছনে কেবল একদল শত্রু নেই কামাল। ভীষণ শক্তিশালী একটা দল গড়ে উঠেছে তোমাদের বিরুদ্ধে। সে দলে অনেক লোক আছে। আমাকে এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, শহীদকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাবে। কিন্তু মনে রেখো কালই ভোরে লঞ্চ ছাড়া চাই।'

এদিকে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। একটা বাঁক ফিরতেই সবাই থমকে দাঁড়ালো। কুফুয়ার বাড়ির দিকের আকাশটা লাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আগুনের লেলিহান শিখা এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। অনেক মানুষের গোলমাল শোনা গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠলো কুয়াশা।

পেণ্ডার দিকে তাকিয়ে কুয়াশা বললো, 'তুমি এদের নিয়ে ঘুর-পথে লঞ্চে গিয়ে ওঠো। আমি দেখি গিয়ে ওদিকে কি ব্যাপার।'

কুয়াশা পিছন ফিরলো, অমনি তার জামায় টান পড়লো। কুয়াশা ঘুরে দেখে

মহুয়া। মহুয়া মিনতি করে বলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে চলো দাদা। ওখানে বিপদের মধ্যে তোমার যাওয়া হবে না।'

অবাক হয়ে মহুয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কুয়াশা। বহু যুগ সে কখনও কারও স্নেহ ভালবাসা পায়নি। জীবন পথে কঠোর সংগ্রাম করতে করতে সে প্রায় ভুলেই গেছে মায়া মমতা এসব কাকে বলে। কতদিনের কাঙ্গাল সে। আজ মহুয়ার কণ্ঠে স্নেহের সুর শুনে সে অবাক হবেই তো। তার কথা ভেবে কেউ উদ্বিগ্ন হয়, একথা সে বিশ্বাস করবে কি করে। কারও কাছে তো সে কোনদিন ভালবাসা পায়নি। কেউ তার জন্যে কখনও একবিন্দু উদ্বিগ্ন হয়নি। সবাই তাকে ঘৃণা করেছে, যে পেরেছে সেই নির্মম আঘাত হেনেছে।

আবার মহুয়া আবদার করে বলে, 'তুমি যেয়ো না দাদা।'

উঃ। কুয়াশা সহ্য করবে কি করে? ভালবাসার দাবি? চাপ চাপ কান্না তার বেরিয়ে আসতে চাইছে একসাথে। হৃদয়টা বুঝি গুঁড়ো হয়ে যাবে। কতদিন সে একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা পায়নি। হৃদয়ে কতো জ্বালা, কতো অভিমান তার। এই প্রকাণ্ড মানুষটা এতো দুর্বল? সবাই যার নাম শুনলে চমকে ওঠে, নিঃশঙ্ক চিত্তে যে একটার পর একটা খুন করতে পারে, তার ভিতরটা এতো নরম, এতই স্পর্শকাতর? টপ্ টপ্ করে কুয়াশার গাল বেয়ে তপ্ত অশ্রু নেমে আসে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় সে বললো, 'শহীদের কোনো বিপদ হতে পারে, আমি যাই রে।'

দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল কুয়াশা যেদিক থেকে আলো দেখা যাচ্ছে সেদিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেণ্ডার পিছন পিছন চলতে শুরু করলো মহুয়া।

নয়

ভোরের দিকে শহীদ, গফুর আর কুফুয়া লঞ্চে ফিরে এলো। সারা রাত্রির ধকলে শরীর অবশ হয়ে গেছে। ক্লান্তি নৈরাশ সব একসাথে ওদের যেন কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু লঞ্চে উঠেই শহীদ দেখলো মহুয়া, কামাল, পেণ্ডা আর কুফুয়ার স্ত্রী বসে আছে। এক মুহূর্তে শহীদের সমস্ত ক্লান্তি চলে গেল। সবকিছু শুনলো সে কামালের কাছ থেকে। মহুয়াও মধ্যে মধ্যে কথা যোগ করতে লাগলো। সব শেষে কামাল বললো, 'কুয়াশার উপদেশ হচ্ছে, এই মুহূর্তে এখান থেকে রওনা হয়ে যাও।'

'আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু তোদের না পাওয়া পর্যন্ত যেতে পারছিলাম না।'

'এখন কোথায় যাবি? লরেঞ্জো মারকুইসে?'

'না। দক্ষিণ রোডেশিয়া যাবো।'

'ওখানে আবার কেন?'

'সে অনেক কথা, পরে বলবো। এর মধ্যে এখানে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে, সে গল্পও শুনিস পরে। এখন দেখি লঞ্চ ছাড়বার বন্দোবস্ত করি।'

কুফুয়ার সাথে কিছুক্ষণ কথা বললো শহীদ। কুফুয়া তার স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেল লঞ্চ থেকে। কুফুয়া অনেক করে মাফ চাইলো শহীদের কাছে।

শহীদ বললো, 'আপনার কি দোষ মি. কুফুয়া? আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না। আপনি আমার জন্য যা করেছেন তা আজীবন মনে রাখবো। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নেই। বাবার বন্ধুর উপযুক্ত কাজ করেছেন আপনি। ছেলেদের দুষ্কর্মের জন্যে আপনি কেন এতখানি লজ্জিত হচ্ছেন?'

'ফিরবার সময় একবার নামবে না তোমরা?'

'দেখি, যদি ফিরতে পারি তাহলে চেষ্টা করবো।'

'কিন্তু তোমাদের ড্রাইভার কই?'

'তাই তো, এখনও ফিরলো না।'

এমন সময় টলতে টলতে মি. ব্লাইদ এসে উপস্থিত হলো। হাতে একটা খোলা বোতলে কিছু অবশিষ্ট আছে। সেটুকু গলায় ঢেলে সশব্দে বোতলটা মাটিতে আছড়ে ভাঙলো ব্লাইদ। শহীদ বললো, 'আমরা এক্ষুণি রওনা হচ্ছি মি. ব্লাইদ। আপনি লঞ্চ ছাড়বার ব্যবস্থা করুন।'

'Oh; yes. certainly.' (নিশ্চয়, নিশ্চয়।)

টলতে টলতে লঞ্চে উঠে গেল সে। শহীদ আর কুফুয়া একটু হাসলো ব্যাটা ইংরেজের বাচ্চার রস দেখে। শীষ দিতে দিতে চলেছে সে।

কুফুয়া বললো, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি তাই তোমাদের সঙ্গে গেলাম না। গেলে সুবিধা না হয়ে অসুবিধাই হতো তোমাদের। এখানকার আর কোনও লোককেও সঙ্গে দিতে চাই না। নিজের ছেলেকে দিয়ে বিশ্বাস নেই, অন্যকে বিশ্বাস করবো কি করে। কিন্তু এই চার্টটা তোমাকে দিচ্ছি, এতে তোমার উপকার হতে পারে।' চার ভাঁজ করা একটা কাগজ শহীদের হাতে দিলো কুফুয়া।

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে শহীদ লঞ্চে গিয়ে উঠলো। লঞ্চ ছেড়ে দিলো। কুফুয়া, তার স্ত্রী আর পেওা পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলো। শহীদরাও রুমাল দোলালো।

ভোর ছ'টায় বড় সুন্দর করে সূর্য উঠলো। রাতের সমস্ত ক্লান্তি, সব কষ্ট হরণ করে যেন প্রভাত এলো আশার বাণী নিয়ে। সবার মন থেকে সব রকম দুশ্চিন্তা মুছে গেল। সবাই প্রাণবন্ত সজীব হয়ে উঠলো।

দুপাশে গভীর জঙ্গল। পরিষ্কার জলে অজস্র কুমীর দেখা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা। আর সুন্দর করে উঠেছে সূর্য। ভয়ঙ্কর আর সুন্দর। দুটো একসাথে মিশলেই হয় সত্যিকার সৃষ্টি। ভয়ঙ্কর সবসময় সুন্দর, আর সৌন্দর্যের মধ্যে ভয় না থাকলে তা অপরিপূর্ণ।

মৃদু একটা এঞ্জিনের শব্দ। জল কেটে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে লঞ্চ সমান গতিতে। কুল কুল করে ছোটো ছোটো ঢেউ লঞ্চের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। গত রাতের সে রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

লঞ্চ একটু ধীরে ধীরে চালানো হচ্ছে। শীতকালে Gungunyara's Ford-এর পশ্চিমে আর যাওয়া যায় না। এখন ভরা বর্ষা। বোঙ্কারা পর্যন্ত অনায়াসে যাওয়া যাবে। কিন্তু তবু সাবধানে চালানোই ভালো; বলা তো যায় না, কোথাও পাথর-টাথরে ঠোক্কর লেগে তলিয়ে যেতে পারে।

চা খেতে খেতে গল্প হয়। কামাল বলে, 'কিন্তু মহুয়া দি, চেকটা তো তোমার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যেই ছিলো, গেল কোথায় ওখান থেকে?'

মহুয়া হাসলো, 'ওই তো মজা! বলো তো কোথায় ছিলো? ওরা যখন অন্ধকার জায়গায় তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখনই আমি বুঝেছিলাম ওদের কী মতলব। তাড়াতাড়ি চেকটা ব্যাগের পকেট থেকে বের করে কয়েক ভাঁজ করে বেণীর মধ্যে গুঁজে রেখেছিলাম।

সবাই হাসলো। শহীদ বললো, মেয়েমানুষ!

বেশ কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা হয়েছে। কামাল সারাদিন হৈ-চৈ করেছে। মি. ব্লাইদের সাথে দোস্তি করে লঞ্চ চালানো শিখে নিয়েছে সে। এখন দেখা যায় বেশির ভাগ সময় সেই বসে আছে হাল ধরে, আর মি. ব্লাইদ পাশেই আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছে।

পাড়ে অনেক কুমীর শুয়ে থাকে। খালি কুমীর আর কুমীর। জলে স্থলে একেবারে গিজ গিজ করছে। কামাল তিনটাকে গুলি করে মেরেছে। শহীদ নিষেধ করলে বলে, হাত সই করছি। মহুয়া তার পয়েন্ট টুটু বোর রাইফেল দিয়ে হাঁস, গিনি ফাউল, পারট্রিজ যা পায় মারার চেষ্টা করে, কিন্তু লাগে না একটাও।

বিকেলের দিকে একটা মস্ত বড় রাজহাঁস একা উড়ে আসছিল পশ্চিম থেকে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে মহুয়ার রাইফেলটা নিয়ে গুলি করলো শহীদ। তার অব্যর্থ সন্ধান বিফল হলো না। ঘুরতে ঘুরতে রাজহাঁসটা নামতে লাগলো।

Excellent shot! মি. ব্লাইদ চিৎকার করে উঠলো। তারপর লঞ্চের মুখটা ঘুরিয়ে দিলো হাঁসটা যেখানে পড়ছে সেদিকে। কিন্তু আশ্চর্য, জলে পড়ার সাথে সাথেই তলিয়ে গেল হাঁসটা। সেখানকার জলে বেশ খানিকটা তোলপাড় হলো। কারও বুঝতে বাকি রইলো না ব্যাপারটা কি। সবাই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। নদীর ভয়াবহতার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে কারও মুখে কিছুক্ষণ কথা সরলো না।

সাঁঝের বেলা হঠাৎ গফুর পাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'দাদামণি, দেখো কি জিনিস।'

সবাই ছুটে গেল লঞ্চের একধারে। দেখা গেল পাড়ের ওপর প্রকাণ্ড শরীরের কয়েকটা জন্তু দাঁড়িয়ে। লঞ্চের মৃদু শব্দ শুনে ওগুলো জলে নামবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। শহীদ বললো, 'হিপোপটেমাস।'

কামাল ততক্ষণে রাইফেল তুলে নিয়েছে। শহীদ বললো, 'এই কামাল, মারিস না, এগুলো মারা নিষেধ।'

'দুত্তোর নিষেধ।' থ্রি নট থ্রি রাইফেলের বিকট আওয়াজে আশেপাশে বন জঙ্গল কেঁপে উঠলো। ঝুপ ঝুপ করে সব কটা জন্তু প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে জলে নামলো। কেবল একটা স্থির হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধপাস করে কাত হয়ে জলে পড়লো।

রেগে গিয়ে শহীদ বললো, 'কেন শুধু শুধু মারলি? তোর কোনও ক্ষতি করছিল ওরা? সবকিছুতেই তোর বাড়াবাড়ি।'

কামাল চুপ করে রইলো। কোনও উত্তর না দিয়ে ফিরে এসে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

হঠাৎ শহীদ যেন কী একটা বুঝতে পারলো। প্রতিহিংসা নয় তো? কামালের বাবাকে এই লিম্পোপোতেই কুমীরে ধরে নিয়ে গেছিলো। কামালের মনে কি তারই কোনও প্রতিক্রিয়া হয়েছে? অবচেতন মনে কুমীরের প্রতি তার জাত বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। তারই জন্যে খেপে গিয়ে সে কুমীর, হিপো যা পাচ্ছে মারছে। নইলে কামাল তো মনের দিক থেকে তার চাইতে অনেক বেশি নরম। শহীদের মনে পড়ে, কামালের শখের কুকুর বিড়াল বা কবুতর মারা গেলে এখনও সে কেমন ছেলে মানুষের মতো কাঁদে, সেই কামাল কি শুধু শুধু জন্তু জানোয়ার খুন করতে পারে?

কামালের প্রতি একটা সমবেদনায় ভরে ওঠে শহীদের মন। না বুঝে ওকে বড় কষ্ট দিয়েছে সে। এখন ওর মনটা কি করে খুশি করা যায় চিন্তা করতে লাগলো শহীদ।

কামালের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো সে। চমকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলো কামাল চুপচাপ। কেমন অস্বস্তি লাগে তার।

গফুর এলো কফি নিয়ে। দু'কাপ শহীদ আর কামালের সামনে রেখে আর একটা মি. ব্লাইদকে দিয়ে এলো।

'আমাদের দেশে কিন্তু এর হাজার ভাগের একভাগও কুমীর নেই দাদামণি,' গফুর বলে।

কথা বলবার বিষয় পেয়ে শহীদ বেঁচে গেল। বললো, 'ঠিক বলেছিস। আগে যাও কিছু ছিলো, এখন আর নেই। বছর পনেরো কুড়ি আগেও বছরে কমপক্ষে হাজার কয়েক লোক কুমীরের পেটে যেতো। আজকাল একটা আধটা খবর কালে ভদ্রে আসে।'

মহুয়া এসে বসলো। বললো, 'তুমি নিজের চোখে কখনও কুমীরের মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া দেখেছো?'

'হ্যাঁ। কতবার দেখেছি।'

'বলো না, কি ভাবে নিলো।' আবদারের সুরে বলে মহুয়া। কামাল ঘুরে বসলো। গফুরও কি একটা কাজের ছুতোয় কাছাকাছিই রইলো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দিয়ে শহীদ শুরু করলো, 'আমার তখন বছর পনেরো বয়স। ক্লাস নাইন কি টেনে পড়ি। ফরিদপুর থেকে নৌকোয় ফিরছি ঢাকায়। নানা-বাড়ি গিয়েছিলাম আম-কাঁঠালের বন্দে। চর-ট্েপাখোলার পুব দিক দিয়ে আসছি আমরা মস্ত এক পানসিতে করে। সাঁঝের কাছাকাছি। আকাশের মেঘগুলো লাল হয়ে গেছে। আমরা ঠিক করেছি সামনের রহমতপুর গ্রামে নৌকো বেঁধে রাতটা কাটিয়ে ভোরে আবার রওনা দেবো। কাছাকাছি আসতেই একটা আর্ত চিৎকার শুনলাম। তাড়াতাড়ি নৌকোর ছইয়ের ওপর উঠে দেখি একজন লোক একটা ছোটো কোষা নৌকোয় দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছে, আর চিৎকার করে আমাদের ডাকছে। নৌকো একবার এদিক একবার ওদিক কাত হচ্ছে। মাঝিদের হুকুম দিলাম শিগগির করে ওর কাছে যেতে। ভাবলাম, ব্যাটা বোধহয় সাঁতারও জানে না, নৌকো চালানোও জানে না, নৌকোয় কিছু জল উঠেছে তাই ভয় পেয়ে চিৎকার করছে।' এইটুকু বলে শহীদ নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট খেতে লাগলো। সবাই ভাবছে, এই শুরু করলো বুঝি, কিন্তু চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকলো ও। কামাল অধৈর্য হয়ে বলে, 'তারপর?'

'আসলে হয়েছিল কি, লোকটা নিশ্চিন্ত মনে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছিলো। নৌকায় বেশ অনেকখানি জল উঠেছিল, কিন্তু রহমতপুর কাছেই, তাই আর ছেঁচে ফেলেনি। নৌকাটা জল থেকে অল্প একটুখানি ভেসে ছিলো।'

হঠাৎ পাশেই জলের মধ্যে একটা কি যেন দেখতে পেলো সে। কি ওটা? খেয়াল করে দেখলো মস্ত একটা কুমীর কটমট করে তার দিকে চেয়ে আছে। লোকটা ভয় পেয়ে গেল ভীষণ। চেয়ে দেখলো দূরে আমাদের নৌকার পাল দেখা যায়, আশেপাশে কোথাও

আর কেউ নেই। কুমীরটাও বোধকরি এই নির্জনতার সুযোগ নেবার চেষ্টা করলো। সে ওই ডুবুডুবু নৌকার একধার দিয়ে উঠে আসবার চেষ্টা করতে লাগলো। লোকটা গিয়ে নৌকার মধ্যখানে দাঁড়ালো। কুমীর উঠবার চেষ্টা করলেই সে উল্টোদিকে ভর দিয়ে কুমীরের দিকটা উঁচু করে ফেলে। কুমীর সেদিক ছেড়ে এদিকে আসে। আবার সে ওদিকে ভর দেয়। এমনি করে বহুক্ষণ যুঝেছে সে। কুমীরও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও অনবরত চেষ্টা করেই চলেছে নৌকায় উঠবার। বোধকরি খুব বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো কুমীরটা।

এদিকে ধীরে ধীরে নৌকায় জল উঠছে। আর বুঝি ভাসিয়ে রাখা যায় না। এবার সে পাগলের মতো চিৎকার করে আমাদের ডাকতে লাগলো।

আমরা যখন খুব কাছাকাছি পৌছলাম, আর হাত পনেরো গেলেই লোকটাকে তুলে নিতে পারবো, ঠিক এমনি সময় ডুবে গেল কোষাটা। মানুষটাও ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পরে দূরে একবার লোকটার মাথা দেখা গেল। জলে খুব আলোড়ন হলো, তারপর আবার ডুবে গেল। আর উঠলো না। নৌকার মাঝিরা সব বলে উঠলো, 'ইয়া আল্লা, বদর বদর।'

শহীদ থামলো। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর কামাল বললো, 'কি হারামী জানোয়ার। তুই আবার এদেরই মারতে মানা করিস।'

দশ

লিম্পোপো থেকে একটা খাল বের হয়ে বোঙ্কারা অঞ্চলে চলে গেছে। সেই খালের মুখের বেশ কিছু পশ্চিমে গিয়ে লঞ্চ নোঙর করা হলো। ঘাটের সাথে লঞ্চ লাগানো গেল না, জল খুব অল্প। লঞ্চ থেকে দুটো তক্তা নামিয়ে তার ওপর দিয়ে হেঁটে পাড়ে নামলো শহীদরা। মি. ব্লাইদ লঞ্চেই রইলো। এই বিকেল বেলা বনের মধ্যে যেতে মানা করলো মি. ব্লাইদ।

'আমরা আশেপাশের জায়গাটা একটু দেখেই ফিরে আসবো। সন্ধ্যার আগে না ফিরলে মনে করবেন আমরা বনের মধ্যেই রাত কাটাবো।'

'এখানকার বন্য জন্তু জানোয়ার যেমন হিংস্র তেমনি চালাক। গাছের ওপরও রয়েছে 'মাম্বা' নামে একরকম বিষধর সাপ। ক্যাম্প নিলেন না, খুব অসুবিধায় পড়বেন।'

'না, যথেষ্ট পরিমাণে দড়ি নিয়েছি, সাত ব্যাটারীর টর্চ আছে সাথে। খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু একটা কথা মি. ব্লাইদ, খুব জরুরী অবস্থায় না পড়লে কখনও

গুলি ছুঁড়বেন না, তাহলে আমরা এখানে এসেছি সেকথা ওদের জানতে দেরি হবে না। আপনাকে তো এই অভিযানের গুরুত্ব কতখানি তা বলেছি।'

'হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।'

শহীদ মহুয়াকে লঞ্চে রয়ে যেতে বললো, কিন্তু সে কিছুতেই থাকবে না, সেও ওদের সঙ্গে যাবে। অনেক তর্কাতর্কি করে শেষ পর্যন্ত শহীদ, কামাল, মহুয়া আর গফুর বনের মধ্যে ঢুকলো।

কিছুদূর গিয়েই একটা সরু পথ পেলো তারা। এঁকে বেঁকে চলেছে পথটা। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটু একটু আঁধার লাগলো তাদের। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শহীদ দেখলো ওপরে উজ্জ্বল আকাশ। বনের মধ্যে গাছের ছাউনির জন্যে অন্ধকার লাগছে। একটু দাঁড়িয়ে দিক নির্দেশক যন্ত্রের দিকে চেয়ে শহীদ দেখলো ঠিক পথেই চলেছে তারা। জংলীদের এলাকাটা আর বেশি দূর নয়। একবার দূর থেকে দেখেই ওরা ফিরে যাবে লঞ্চে। কাল ভোরে আবার রওনা হবে তারা।

আর আধমাইল খানেক গেলেই ওরা দেখতে পাবে জংলীদের আস্তানা। কিন্তু অন্ধকার বড় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। জঙ্গলও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। গফুর বললো, 'আঁধার হয়ে গেল যে! ফিরে চলো দাদামণি, কাল ভোরের বেলা আবার আসা যাবে।'

'আরে চল, বেশি দূর নেই। এতদূর এসে আর ফিরবো না। দেখেই যাই।

পথটা ধরে আরও অনেকদূর গিয়ে দেখা গেল একটা প্রাচীর। মোটা মোটা গাছ পাশাপাশি এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যে তা ভেদ করে ওপাশে যাওয়া যায় না। পথটা দু'ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। শহীদ বুঝলো ডান ধারের পথ ধরে খালটার কাছাকাছি যাওয়া যাবে। চার্ট খুলে দেখলো মন্দিরটা খালের কাছাকাছিই এক জায়গায়। সেই পথেই এগোলো তারা।

কিন্তু এই পথ হলো কি করে? এখান দিয়ে মানুষের যাতায়াত আছে নিশ্চয়ই। বন্য জানোয়ারের তৈরি পথও হতে পারে। শহীদ এতক্ষণ একথা ভাবেইনি। সচকিত হয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখে নিলো সে ভালো করে।

সেই পথ ধরে অনেকদূর চলে গেল তারা। কিন্তু বনের মধ্যেটা ভীষণ অন্ধকার হয়ে এলো। সামনে আর কিছুই দেখা যায় না। এই অন্ধকারে পথ চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। টর্চও বেশিক্ষণ জ্বালাতে ভরসা পাচ্ছে না শহীদ।

কামাল বললো, 'কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। শহীদ এই অন্ধকারে আর ফেরা ঠিক হবে না।'

'তাই ভাবছি। আর এগোনো ঠিক না। সামনের বড় গাছটায় উঠে পড়বো।'

'আমি তো গাছে চড়তে জানি না।' মহুয়া কাতর হয়ে বললো।

'তাহলে নিচেই থাকতে হবে তোমাকে। কি আর করা। আমরা গাছে চড়ে বসে তোমাকে পাহারা দেবো।'

'নইলে ফিরে চলো লঞ্চে।'

'আর তো ফেরা সম্ভব না।'

মহুয়া কি একটা বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় বনের মধ্যে খচ্‌মচ করে শব্দ হলো। সবাই চমকে উঠে সেদিকে রাইফেল তুললো। শহীদ টর্চ জ্বেলে ধরলো। দু'তিনটা শিয়াল। রাস্তার ওপর কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর একছুটে ডানপাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

'বড় ডর লাগিয়ে দিয়েছিল।' গফুর বললো।

'নে, আর ডর পেতে হবে না, এই গাছটায় উঠে পড় চটপট।'

গফুর একটা মস্ত বড় গাছে তরতর করে উঠে গেল রশি হাতে নিয়ে। নিচে টর্চ জ্বেলে ধরে রইলো শহীদ। একটা মোটা ডালে শক্ত করে রশিটা বেঁধে আরেক মাথা নিচে ঝুলিয়ে দিতেই কামাল সেটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। এবার শহীদ মহুয়াকে বললো, 'তুমি আমার পিঠে চড়ে শক্ত করে গলা ধরে থাকো। উঃ! অতো জোরে না, ব্যথা পাই। হ্যাঁ, এই রকম করে ধরে থাকবে, ঢিল দিও না, খবরদার।'

দক্ষ জিমনাস্ট শহীদ মহুয়াকে অনায়াসে পিঠে নিয়ে উঠে এলো গছের উঁচু ডালে। বেশ মোটা ডাল। কারও যদি অফিসের দারোয়ানের মতো বেঞ্চিতে ঘুমানোর অভ্যেস থাকে তো অনায়াসে ডালের ওপর ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শহীদদের কারো চোখে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো তারা। সবাই বুঝতে পারছে, এভাবে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। কতো রকম বিপদ, কতো অসুবিধা। সাথে তারা মনে করে খাবার আনেনি। কেবল কাঁধে করে জল এনেছে সবাই এক এক বোতল।

কতো রকম সাপ থাকতে পারে গাছে। দয়া করে একটা কামড় দিলেই ব্যাস খতম। কয়েকটা বানর ওদের আস্তানা বেহাত হয়ে গেল দেখে খ্যাচম্যাচ করে আপত্তি জানাচ্ছিলো এতক্ষণ। এবার তারা পাশের একটা গাছে গিয়ে নীরবে এইসব অপরিচিত অসভ্য আগন্তুকের উপর লক্ষ্য রাখছে।

কানের পাশ দিয়ে একেকবার পিন্‌ন্‌ করে মশা ঘুরে যাচ্ছে। বোধকরি ভাবছে, ব্যাটারা, ঘুমিয়ে নাও তারপর দেখা যাবে।

হঠাৎ দূর থেকে একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল। মহুয়ার বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠলো। শহীদের হাতটা ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের আওয়াজ?'

'সিংহ ডাকছে।'

'খুব কাছেই মনে হচ্ছে!'

'না। অন্ততঃ পক্ষে দুই মাইল দূরে রয়েছে এখন সিংহটা।'

'বাব্বা!' মহুয়া একটা হাঁফ ছাড়ে, 'এতদূর থেকেই এতো জোরে শোনা যায়, কাছে হলে না জানি কতো জোরে শোনা যাবে! আচ্ছা, এই, বলো না সিংহ গাছে চড়তে পারে?'

'না পারে না।' শহীদ হাসলো। 'পারলেও চিন্তা কি? এতগুলো রাইফেল রয়েছে কি করতে?'

মহুয়া চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বোতল খুলে ঢক্ ঢক্ করে অনেকখানি জল খেলো। গফুর অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। ও জানে দিদিমণির কতখানি ক্ষিধে পেয়েছে। সাথে খাবার নেই, সেজন্যে তার নিজেকে দোষী বলে মনে হতে লাগলো। সে কি করে দিদিমণির জল খেয়ে পেট ভরানো তাকিয়ে দেখবে?

বহুক্ষণ বসে রইলো তারা। শহীদ ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে। তিনজন ঘুমাবে ডালের সাথে বাঁধা অবস্থায়, আর একজন ঘন্টা তিনেক জেগে থাকবে। তারপর এক-জনকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজে ঘুমাবে।

গফুর বললো, 'আমিই প্রথম জাগি দাদামণি।'

'থাক্। আর চালাকি করতে হবে না। আমাদের কাউকে জাগাতে আপনার হাত উঠবে না, তা ভালো করেই জানি আমি। নিজেই সারারাত জেগে থাকবার চেষ্টা করবেন, আর ঢুলতে ঢুলতে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে বাঘের পেটে যাবেন। আমিই থাকবো প্রথম জেগে।'

কিন্তু গফুর কিছুতেই শহীদকে জাগা রেখে ঘুমাবে না। কামাল আর মহুয়াকে ডালের সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললো শহীদ।

আরও অনেকক্ষণ কাটলো। মহুয়া বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ বেশ কাছেই ডিম্ ডিম্ করে ঢাক বেজে উঠলো। আশ্চর্য হয়ে গেল শহীদ। এতো রাতে এভাবে ঢাক বাজে কেন? কেমন একটু হৈচৈ-এর শব্দও যেন পাওয়া যাচ্ছে। জংলীরা কি টের পেলো যে ওরা এতো কাছেই গাছের ওপর রয়েছে?

তরতর করে ডালের পর ডাল ধরে গাছের মগডালে উঠে এলো শহীদ আর গফুর! সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেশ কিছুটা দূরে মন্দিরটার কাছে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের ওপর ফুটবলের গোলপোস্টের মতো করে তিনটা কাঠ। ওপরের কাঠ থেকে ঝুলছে দুইটা মস্ত বড় বড় বাইসন। আগুনে পোড়ানো হচ্ছে তাদের। আর তারই চারপাশে অর্ধ উলঙ্গ জংলীরা নাচছে, চিৎকার করছে। মেয়ে পুরুষ সবাই আছে।

সবারই কোমরের কাছে একটু খানি কাপড় জড়ানো। বাকি দেহ উলঙ্গ। আজ বোধহয় ভালো শিকার পেয়েছে, তাই ওদের এতো আনন্দ! একটু পরেই কামাল উঠে এলো শহীদের পাশে।

'মহুয়া কই?'

'জেগে উঠে ভয় পাবে হয়তো, গফুর যা তো নিচে।'

গফুর নেমে গেল। অনেকক্ষণ ওরা এমনি ভাবে বসে রইলো গাছের মাথায়। আগুন নিভে এসেছে। এবার ওরা পাশের একটা কূপ থেকে জল তুলে ঢালা শুরু করলো আগুনের মধ্যে। অনেক জল ঢালায় আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেছে। কয়েকজন লোক বাইসনগুলো খুলে এনে মাটিতে রাখলো।

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। ঢাকও বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকজন জংলীর হাতে ভর দিয়ে সাদা ধবধবে আলখাল্লা পরা একজন লোক কাছেরই একটা কুঁড়েঘর থেকে আসছে মন্দিরের দিকে এগিয়ে। অনেক মশাল জ্বালানো হয়েছিল। সেই আলোতে দেখা গেল লোকটা জংলী না। ওদের কালো কালো মুখের পাশে এই মুখটা অনেক ফর্সা লাগছে। বুক পর্যন্ত লম্বা পাকা দাড়ি। সৌম্য মূর্তি।

কামাল বললো, 'ইসলাম কাকা না?'

'হুঁ।'

'সেই কতো ছোটো বেলায় দেখেছি, কিন্তু এতদিন পরেও দেখে ঠিক চিনতে পেরেছি।'

শহীদ কোনো উত্তর দেয় না। কি যেন ভাবছে সে।

হয়তো ভাবছে; এই যে মানুষটা জংলীদের পুরোহিতের কাজ করছেন তিনি তার বাবা। কতো যুগ তিনি একটা সভ্য মানুষের মুখ দেখেননি, একজন বাঙালী পাননি যে একটু কথা বলবেন। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কতো শত মানুষকে বলি দিয়েছেন কুমীরের কাছে। সতেরো বছর! উঃ পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। কতো বিনিদ্র রাত হয়তো তিনি চোখের জলে ভেসে দেশের কথা, স্ত্রীর কথা, শহীদ, লীনার কথা ভেবেছেন। কতো কষ্টে কেটেছে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত।

সেই আলখাল্লা পরা লোকটা এসে দাঁড়ালো বাইসনগুলোর পাশে। একটা চকচকে ছুরি বের করে বেশ অনেকটা মাংস কেটে নিলো সেগুলোর শরীর থেকে। কিছুক্ষণ কি মন্ত্র পড়লো নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে। তারপর পুব দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। মাংসের টুকরো দুটো নিয়ে সেই ছ'সাত জন লোক আলখাল্লাধারীর পিছন পিছন চলতে লাগলো। খালটার ওপর দিয়ে একটা ছোটো সাঁকো গেছে, সেই সাঁকোর ওপর গিয়ে মাংসের টুকরোগুলো জলে ফেলে দিলো লোকগুলো।

এইবার কয়েকজন জংলী ধারালো ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়ানো শুরু করলো বলদ

দুটোর। আবার ঢাক আর হৈ-হল্লা শুরু হলো। আলখাল্লা পরা লোকটা আবার লোকগুলোর কাঁধে ভর করে কুঁড়ে ঘরটায় ঢুকে পড়লো। তাকে খুব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে।

শহীদ আর কামাল নেমে এলো নিচে। গভীর ভাবে চিন্তা করছে শহীদ। কিভাবে এখন অগ্রসর হওয়া যায়?

এগারো

গভীর রাত। ঢাক, হৈ-হল্লা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জংলীরা বোধহয় যে যার ঘরে গিয়ে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মহুয়া আঘোরে ঘুমোচ্ছে। গফুর বসে বসে ঝিমাচ্ছে ডালের ওপর। কোন্ সময়ে ঝুল লেগে পড়ে যাবে মাটিতে, তাই কামাল একটা রশি দিয়ে আলগোছে ওকে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে। শহীদের ডিউটি শেষ করে সে কামালকে জাগিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়েছে কামালের জায়গায়, সেও বেশ অনেকক্ষণ হলো। বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে শহীদ।

সময় আর কাটতে চায় না। চারিটা দিক ভীষণ নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ খেয়াল করলে এই নিস্তব্ধতা একজন মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। চিন্তা করলেও মনে হয় যেন প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। ভাগ্যিস মাঝে মাঝে দূর থেকে বন্য জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছে। তাতে করে নীরবতাটা একটা অখণ্ড রূপ নিতে পারছে না।

এই নিঝুম নীরবতা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলে একটা অতীন্দ্রিয় সুরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। মনে হয় শব্দটা যেন পৃথিবীর ডাক। পৃথিবী নিরুদ্দেশের পানে অবিরাম সমান গতিতে চলেছে, তারই একটানা একঘেয়ে শব্দ। এই ডাক চিরকালের। চলেছে, চলছে, চলবে।

বিরাট কিছুর সামনে গেলে যেমন মনটা ছেয়ে যায়, তেমনি এই নিস্তব্ধতা মনকে ছেয়ে ফেলে। চেতনা ছাড়া আর কিছুই বেঁচে থাকে না তখন। মাথাটা নিচু হয়ে আসে এক মহান বিরাটত্বের পায়ের কাছে। মনটা ভক্তিপ্লুত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছে করে কারও কাছে। কিন্তু কার ওপর ভক্তি, কার আছে আত্মসমর্পণ? ঠিক বোঝা যায় না।

এমনি সময় চমকে উঠলো কামাল। কুয়াশা! সরোদ বেজে উঠেছে। নিশ্চয়ই কুয়াশা! সে ছাড়া কেউ না। কাছেরই কোনো গাছ থেকে আসছে আওয়াজ। এখানে পর্যন্ত এসেছে কুয়াশা! অদ্ভুত! কোথায় তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার কথা, আর সে কিনা তাদের সাথে সাথে সুদূর আফ্রিকায় এসেছে, পাছে তাদের কোনও বিপদ হয়।

নিজের ভুলে নিজ হাতে সে তার বাবাকে খুন করেছে, এখন ছোটো বোন মহুয়ার যাতে কোনও কষ্ট না হয় তার চেষ্টা সে করছে। সে জীবন দেবে, তবু বোনটার সুখের ব্যবস্থা করে যাবে।

মালকোষ! ঠিক এই সময়কার রাগ। যখন মনটা শান্ত সমাহিত থাকে ঠিক তখনই মানুষের মন গায় মালকোষ। ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে যোগাসনে বসে গাইতে হয় এই রাগ। এতে প্রেম নেই, তাই মালকোষে কখনও ঠুমরী হয় না। মানুষের মন কেবল প্রেমে সন্তুষ্ট থাকে না, ভক্তি চাই, ধ্যান চাই, জ্ঞান চাই।

কামাল ভাবে; শহীদকে ঘুম থেকে ওঠাবে? না থাক, ও ঘুমাক। চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে কামাল।

'কিসের শব্দ হয় যেন কামাল ভাই?'

কামাল চেয়ে দেখে গফুরের তন্দ্রা কেটে গেছে। ও বলে, 'চুপ! বাজনা বাজছে, চুপচাপ শুনে যাও।'

আবার চোখ বন্ধ করে কামাল। মনে মনে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেঃ

আরক্ত বর্ণে ধৃত রক্ত যষ্টি
বরৈ ধৃতা বৈরী কপালমালা
বিবঃ সুবীরে যুকৃত প্রবীর্য্যঃ
মালা মতো মালবো কৌষি কোয়ম।

বাজনা বেজেই চলেছে। কিন্তু খুব আস্তে বাজাচ্ছে কুয়াশা, জংলীরা যেন শুনতে না পায়। কতো বড় প্রতিভা, কতো সুন্দর মন, কামাল ভাবে। কিন্তু তাকে সারাজীবন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। কোনদিন কোথাও একটা সুখের নীড় বাঁধতে পারবে না। উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরের জীবন তার। কোথাও এতটুকু ভালবাসা এতটুকু স্নেহ নেই তার জন্যে। কতো একা সে! কামাল মরে যেতো ওর অবস্থায় পড়লে।

কামাল চোখ খুললো। বাজনার আলাপ একটু দ্রুত হয়েছে।

ছোটো ছোটো তান চলেছে আলাপের সাথে সাথে। হঠাৎ কামালের চোখে পড়লো, ওটা কি? লম্বা কি একটা যেন ঝুলে রয়েছে ওপরের একটা ডাল থেকে। অল্প অল্প দুলছে সেটা। এটা তো ছিলো না আগে! চোখ রগড়ায় কামাল। না, তেমনি দেখা যাচ্ছে, চোখের ভুল না। সাত ব্যাটারীর টর্চ জ্বাললো কামাল। সেই আলোতে যা দেখলো তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

ওপরের একটা ডাল থেকে মস্ত বড় একটা সাপ নেমে এসেছে ঠিক মহুয়ার গলার কাছে। এরই নাম মাম্বা। কালনাগিনীর মতো ভয়ঙ্কর এর বিষ।

টর্চের আলোয় চক্‌চক্ করছে সাপটার চোখ দুটো। সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টে

চেয়ে আছে সাপটা। জিভটা কেবল এক একবার লক্‌লক্‌ করে বেরিয়ে এসে আবার অদৃশ্য হচ্ছে। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। আলোটা এতক্ষণে সহ্য হয়ে গেছে তার। এবার সে রাগে ফোলা শুরু করলো। কামাল হতভম্ব হয়ে চেয়েছিল এতক্ষণ। এবার তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিভলবার বের করলো। গফুর তখনো ঢুলছে। সাপটা খুব সাবধানে নেমে আসছে। আর একটু নামলেই মহুয়ার গলায় ছোবল দিতে পারবে।

রিভলভার ছুঁড়লো কামাল। রাত্রির নিস্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে গেল এই প্রচণ্ড শব্দে। মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সাপটার। তিনচার সেকেণ্ড শূন্যে দুলে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল সেটা।

সবাই চমকে জেগে উঠেছে। শহীদ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কি হয়েছে কামাল?'

'সাপ মারলাম।'

'কই? কোথায় সাপ?' তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে ফেলে শহীদ।

কামাল নিচে হাত দিয়ে দেখালো। টর্চ জ্বেলে দেখা গেল মস্ত বড় একটা মাম্বা পড়ে আছে মাটিতে আঁকাবাঁকা হয়ে।

মহুয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলো আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায়। কামালের কথা শুনে আর মরা সাপ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললো, 'আমি মনে করেছিলাম জংলীরা আক্রমণ করেছে বুঝি।'

'দাদামণি, আমাকে ধর।' গফুরের আর্ত কণ্ঠস্বরে সবাই সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালো। এতক্ষণ তার কথা কারও মনে হয়নি। ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে গফুর শূন্যের ওপর। গুলির আওয়াজ শুনে সে চমকে গাছ থেকে পড়ে যায়। কিন্তু কামাল আলগোছে বেঁধে রেখেছিল বলে এখনও সম্পূর্ণ পড়েনি, পায়ের সাথে কোনও মতে রশিটা ধরে উল্টো হয়ে ঝুলছে সে। চেষ্টা করেও আর উঠতে পারছে না, কেবল হাত পা ছুঁড়ছে। তার দুরবস্থা দেখে কামাল হেসে ফেললো। শহীদও না হেসে পারলো না।

তাড়াতাড়ি গফুরের পা ধরে ওপরে টেনে আনলো শহীদ। কামালের এতক্ষণে মনে হয়েছে, গুলির সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। শহীদকে কিছুই বললো না সে। কুয়াশা ভাবছে না তো, তাকেই গুলি করবার চেষ্টা করেছে কামাল?

শহীদ ভাবছে গুলির পরিণামের কথা। জংলীদের মধ্যে কোনও সাড়া পড়লো কিনা দেখবার জন্যে গাছের মগডালে উঠে গেল সে। কিছুক্ষণ পর নেমে এসে রাইফেলটা তুলে নিলো কাঁধে। কামালকে বললো, 'তুই টর্চটা নিয়ে আয় তো আমার সঙ্গে, বোধহয় একটা ভালুক পাশের একটা গাছে উঠেছে। কিম্বা কোনও জংলী। কি যেন আবছা দেখা যাচ্ছে।

'ধ্যাৎ, ভালুক কোনদিন গাছে উঠতে পারে? বানর টানর দেখেছিস।'

'আর বিদ্যা ঝাড়িস না তো, চল। বইয়ে পড়িসনি ভালুক গাছে উঠিয়া মৌচাক ভাঙিয়া মধু খায়? চল, টর্চটা নিয়ে চল।'

'যাস না শহীদ। ওটা ভালুক না, কুয়াশা। ভালুক ভেবে কি শেষে বন্ধুকে মারবি?'

'তুই কি করে বুঝলি যে ওটা কুয়াশা?'

'এতক্ষণ সরোদ শুনছিলাম ওর। গুলির শব্দে বন্ধ করে দিয়েছে বাজনা।'

শহীদ বসে পড়লো ডালের ওপর। হাত ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে চারটা বাজে।

'বাকি রাতটুকু জেগেই কাটাই, কি বলিস?'

'রাজি। সিগারেট দে।'

একটা সিগারেট নিজে ধরিয়ে কামালকেও একটা দিলো শহীদ। বললো, 'খুব ভোরে আমরা বনের অন্য দিকে চলে যাবো। গাছের ওপর থেকে দেখলাম জংলীদের দুটো কুঁড়েঘরে বাতি জ্বলে উঠলো। কয়েকজন লোক বাইরে এসে আমাদের এদিকটায় আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করলো। তারপর আবার ঘরে ফিরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিলো। এতো রাতে কেউ আর আসবে না। কিন্তু ভোরের দিকে ওরা বোধহয় দল বেঁধে এসে এ দিকটায় খোঁজ করবে।'

বারো

বড় সুন্দর ভাবে জংলীরা ওদের আস্তানা সুরক্ষিত করেছে। চারপাশে খুব ঘন করে লাগিয়েছে গাছ। সে সব গাছ বড় হয় মোটা হয়েছে, ফলে একটার সাথে আরেকটা লেগে গেছে। ইউক্যালিপটাস গাছের মতো সাদা এই গাছগুলোর শরীর। কোনো বন্য জন্তুর পক্ষে এ প্রাচীর ভেদ করে ওধারে যাওয়া সম্ভব নয়। ওদের এলাকায় ঢুকতে হলে একটাই মাত্র পথ। সে পথ হচ্ছে খালটা। কিন্তু খালের আশপাশে ওদের এতো ঘন বসতি, যে কারও চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়া অসম্ভব। আজ পর্যন্ত কোনো পর্যটক কিম্বা বিদেশী কেউ এদের এলাকায় ঢুকতে পারেনি। অনেক পাদ্রী চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিজেরা কুমীরের পেটে গেছে। এরা মানুষ হয়নি।

কুফুয়ার একটা কথা শহীদের খুব মনে আছে। কথায় কথায় কুফুয়া বলেছিল, হ্রদের ধারে সবচাইতে বেশি শিকার পাওয়া যায়। তাই জংলীরা দিনের বেলা নানা রকম ফন্দি ফিকির নিয়ে হ্রদটার আশপাশে শিকারে যায়।

শহীদরা ফিরে চললো লঞ্চে। সেখান থেকে দরকারী সব জিনিসপত্র নিয়ে সম্পূর্ণ এলাকাটা একবার ঘুরে দেখবে। তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে।

যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরেই নদীর পাড়ে গিয়ে দেখা গেল লঞ্চ নেই নদীতে। সবাই থ খেয়ে গেল। এখন উপায়? তারা ফিরবে কিসে করে? ব্লাইদ কি ভয় পেয়ে চলে গেল ওদের ফেলে রেখে?

হঠাৎ একটা কাগজের উপর চোখ পড়লো শহীদের। একটা গাছের গায়ে পোস্টারের মতো করে সাঁটানো। সবাই কাছে গেল কাগজের ওপর লেখাঃ

5-30 A.M.

Mr Shahid,

I am seeing a mast proceeding in this direction. Perhaps it is our enemy's boat. So I am moving towards west. You will find me within half a mile.

J. Blythe.

'পশ্চিমে তো যাবো, কিন্তু যাবো কোন্ পথে? সবই তো ঘন বন।' কামাল চিঠিটা ছিঁড়ে নিয়ে বলে।

'এরই মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো নইলে ধরা পড়ে যাবো। ওই দেখো নৌকো বাঁধা রয়েছে ঘাটে।'

কামাল চেয়ে দেখলো সত্যি একটা নৌকো অদূরে পাড়ে বাঁধা। ব্যস্ত হয়ে কামাল বললো, 'ওরা বোধকরি নেমে পড়েছে। আমাদের খুঁজছে হয়তো, চলো তাড়াতাড়ি বনে ঢুকে পড়ি।

ঠিক এমনি সময়ে কয়েকজন লোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল খুব কাছেই। ওরা এইদিকেই আসছে।

সবাই বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। বড় বড় গাছ তো রয়েছেই, হাঁটু পর্যন্ত ছোটো ছোটো অসংখ্য ঝাড়। মধ্যে মধ্যে কাঁটাও আছে। পা ছড়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে সাপে কামড়াতে পারে। কিন্তু ওদের কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, যতদূর সম্ভব সরে যেতে হবে।

বেশ অনেকদূর এসে কামাল জিজ্ঞেস্ করলো, 'এরা কারা রে? সেই জংলীর সর্দার দলবল নিয়ে এলো, না এখানকারই জংলীরা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে?'

'কি জানি।'

'সর্দারটা এতো তাড়াতাড়ি চলে আসলো?'

'আসবেই তো। ওদের পুরোহিত মশাইকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে ভেবেছিস এতো সহজে?'

'আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল প্রায়!'

'চল্, চল্, কথা বলিস না। জোরে পা চালা। মহুয়ার কষ্ট হচ্ছে? কাঁধে-চড়বে আমার?'

'না আমি হাঁটতে পারবো।' কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মহুয়া দেখাতে চায় না।

ঘাটের সাথে একদম লাগিয়ে লঞ্চ বেঁধে রেখেছে মি. ব্লাইদ। পাড়ের ওপর চিন্তিত মুখে পায়চারি করছিলো সে। শহীদদের দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো সে।

'আপনার বোটের শব্দ শোনেনি তো ওরা?' প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো শহীদ।

'না। আমি বৈঠা বেয়ে উজানে এসেছি।'

'কি বলছেন! এতবড় লঞ্চ আপনি একা বৈঠা বেয়ে এনেছেন? সাঙ্ঘাতিক তো! বৈঠা পেলেন কই?'

'হালটা খুলে নিয়ে বৈঠা করে নিয়েছিলাম।' একটু হেসে বললো মি. ব্লাইদ।

শহীদ আর কামালের মুখ হাঁ হয়ে গেল। একে প্রকাণ্ড হাল, তার ওপর নিচটা লোহা দিয়ে মোড়া; সেটাকেই আবার বৈঠা বানিয়ে স্রোত ঠেলে এতদূর আসা! সোজা কথা? হালটা কামাল তো তুলতেই পারবে না। সেটা বাওয়া তো কল্পনাও করা যায় না। মি. ব্লাইদের হাতের দৃঢ় পেশীর দিকে কামাল একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো। দেখে কিন্তু অতোটা মনে হয় না।

শহীদকে বাংলায় কামাল বললো, 'ব্যাটা গুল মারছে না তো?'

'না। দেখ্ না, হালটা পিছনে ওঠানো ছিলো, এখন ঠিক জায়গা মতো বেঁধে রাখছে।'

কামাল ব্লাইদের কাছে গিয়ে বাংলায় বললো, 'কোন্ দোকানের চাল খাওয়া হয় মশায়ের? এতো শক্তি পাওয়া গেল কোথায়, অ্যাঁ? ব্যাটা ভীম কোথাকার!'

'What?'

'বলছিলাম, অদ্ভুত শক্তি আপনার।' কামাল ইংরেজিতে বলে।

সাহেব বিগলিত হয়ে গিয়ে বললো, 'না এই সামান্য একটু আছে।'

খাওয়া-দাওয়া করে সবকিছু গুছিয়ে নেয় শহীদ। কয়েকটা ব্যাগে পাউরুটি, মাখন আর বিস্কিটের টিন, কিছু রশি, ছুরি, বুলেট, কয়েকটা হাতবোমা, একটা বায়নোকুলার, সাত ব্যাটারীর টর্চটা, আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস ভরলো শহীদ। তারপর একেকজনের কাঁধে কয়েকটা করে ঝুলিয়ে দিলো। কি ভেবে কতকগুলো পেরেকও নিলো শহীদ। একেকজন দু'বোতল করে পানি নিলো। টু-টু বোর রাইফেলটা সাথে নিলো মহুয়া এবার।

'আবার এই জঙ্গল ভেঙে যেতে হবে আমাদের?' কামাল চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে?

'না। সামনেই ভালো রাস্তা পাবো। তখন তো emergeny ছিলো, তাই ঢুকে

পড়েছিলাম জঙ্গলেই। একটু ঘুরে এলে ভালো পথেই আসতে পারতাম। নদী থেকে প্রচুর রাস্তা উত্তরে চলে গেছে। কোনও না কোনও পথ পেয়েই যাবো আমরা।'

'এসব রাস্তা হয় কি করে?' মহুয়া জিজ্ঞেস করে।

'বন্য জন্তুরা জল খেতে আসে নদীতে। বিশেষ করে জংলী হাতিরা রাস্তা তৈরি করে।'

'তাহলে তো এসব রাস্তা খুব বিপজ্জনক।'

'একটা কথা কি জানো, হাতিই বলো আর খরগোসই বলো মানুষকে সব জন্তুই ডরায়। একজন বা দুইজন লোক হলে, আর খুব ক্ষুধার্ত থাকলে বাঘ, সিংহ বা কুমীর আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আমরা চারজন। এই তিন জানোয়ারের কোনোটাই আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। অতএব ভয় কি? দল বেঁধে যদি আসে, চারজন সমানে গুলি ছুঁড়বো, কার সাধ্য এগোয়? তাছাড়া হাতবোমা তো রয়েছেই।'

মহুয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হলো। সে এখন বনের শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে চলেছে। পথের পাশে কোনো নাম না জানা সুন্দর ফুল পেলে অমনি তুলে খোঁপায় গোঁজে, কিংবা শহীদ বা কামালের শার্টের বোতামের গর্তে পরিয়ে দেয়। বেরসিক গফুরের কানে পর্যন্ত একটা লাল ফুল গুঁজে দিয়েছে সে। গুনগুন করে গান ধরলো মহুয়া। ভালো রাস্তায় পড়েছে তারা। শহীদ আগে আগে চারদিকে অত্যন্ত সর্তক দৃষ্টি রেখে চললো।

মাইল দু'য়েক উত্তরে গিয়ে বাঁ ধারে একটা পথ পাওয়া গেল। সেই পথে এগোলো শহীদরা। জংলী এলাকার খুব কাছে যেতে চায় না ওরা আপাততঃ।

আরও মাইল দুয়েক গিয়ে ওরা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বিশ্রাম করতে বসলো। বেশ গরম। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে কামাল আকাশের দিকে লক্ষ্য করে বললো, 'দক্ষিণে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি হবে না তো?'

শহীদও গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলো, খুব তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে মেঘটা। ভয়ানক ঝড় হবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তার আগেই একটা ঘন গাছের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। উঠে পড়লো সবাই। একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো ওরা। গফুরকে গাছে উঠিয়ে দিয়ে রশি বাঁধিয়ে ওরা গাছের নিচু একটা ডালে উঠে বসলো।

মহুয়া বললো, 'বৃষ্টি হবে হোক, কিন্তু গাছে উঠলাম কেন? এতে কি বৃষ্টি কম লাগবে?'

'আমরা যে কারণে এই গাছটা বেছে নিয়েছি Shelter হিসেবে, ঠিক সেই কারণেই তো কোনো হিংস্র জন্তু এখানে আশ্রয় নিতে পারে। ডালের উপর অনেকটা Safe.'

শহীদের কথাই ঠিক। যখন টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হলো তখন

কোত্থেকে দুটা বানর ছুটে এসে এই গাছে উঠে পড়লো। কিন্তু কয়েক ফোঁটা পড়েই বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। একটু পরে উল্টোদিকে বইতে শুরু করলো বাতাস। গফুর বললো, 'খুব বড় ঝড় হতে পারে, দাদামণি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' কামাল বললো।

মিনিট পাঁচেক আবার চুপচাপ। তারপর শুরু হলো প্রলয় মাতন। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কী যেন গোঁ গোঁ করে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড আওয়াজ। মট্ মট্ করে গাছ ভাঙার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সাইক্লোন।

ঝড়ের শব্দের সাথে সাথে জন্তু-জানোয়ারের ত্রাহী ত্রাহী চিৎকার। শহীদ বড্ডো ভুল করেছে। এই বনটার বিশেষত্ব হচ্ছে গাছগুলো সব ছোটো বড়, অন্য অন্য বনের মতো সব সমান না। দক্ষিণ দিকের কয়েকটা গাছ খুব ছোটো, তারপর শহীদদের গাছটা মস্ত বড়। ফলে ঝড়ের ঝাপটা ছোটো গাছে না লেগে ওদের গাছে সোজা এসে লাগবে। একথা আগে ভাবেনি শহীদ। আগেই লক্ষ্য করেছিল সে, গাছগুলোর দৈর্ঘ্য অসমান। সমান হলে কেবল সামনের কয়েকটা গাছের ক্ষতি হতো, গোটা বন অক্ষত থাকতো। শহীদ ভাবছে নেমে যাবে কিনা। না, এখন আর সময় নেই। ঝড় এসে পড়লো বলে।

মহুয়ার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শহীদ এক হাতে তাকে ধরে আরেক হাতে একটা ডাল জড়িয়ে ধরলো। এসে পড়লো সাইক্লোন। ভীষণ ঝাপটা। গাছ যেন ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। ছিট্কে পড়ে যাবে না তো তারা? কামাল উপরে চেয়ে দেখলো অজস্র পাতা ভয়ানক বেগে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। দুইটা মস্ত বড় বড় ডাল কোথা থেকে যেন ভেঙে এসে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়লো কাছেই কোথাও। প্রচণ্ড শব্দ। কানে তালা লাগার উপক্রম। কয়েকটা জেব্রা এসে গাছের তলায় দাঁড়িয়েছে। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে তারা। তাদের পাশ দিয়ে একটা মস্ত বড় বাঘ উদভ্রান্তের মতো একদিকে ছুট দিলো। এতো উপাদেয় শিকারের প্রতি তার লক্ষ্যই নেই। প্রকৃতির এই দানবিক লীলায় সবাই সমান নিরুপায় হয়ে একটু আশ্রয় খোঁজে।

হঠাৎ মড়মড় করে গাছের একটা অংশ ভেঙে শূন্যে চলে গেল। মনে হলো যেন হৃদয়ের একটা অংশই শূন্য হয়ে গেল। ফাঁকা আকাশ দেখা যাচ্ছে। মহুয়া শহীদের বুকে মুখ গোঁজে।

কিছুদূর দিয়ে পোঁ পোঁ করে ভীষণ আর্তনাদ তুলে কয়েকটা হাতি দৌড়ে চলে গেল পুবে।

মিনিট পাঁচেক পর সাইক্লোন কমলো। শোনা যাচ্ছে ক্রমেই সে ভীষণ শব্দ দূরে

সরে যাচ্ছে। এবার বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশ দেখে বোঝা গেল, বজ্রসহ প্রচণ্ড বারিপাত হবে। এই গাছে থাকলে নির্ঘাৎ ভিজতে হবে। শহীদরা গাছ থেকে নেমে পড়লো। তাদেরকে দেখতে পেয়ে জেব্রাগুলো একদৌড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাছেই আরেকটা অক্ষত ঝাঁকড়া গাছ পাওয়া গেল। শহীদরা তাতে চড়ে বসতেই চেপে বৃষ্টি এলো।

ঝমাঝম ঝমাঝম বৃষ্টি পড়েই চলেছে, থামবার নাম নেই। ঘন্টাখানেক গাছের ওপর ঠায় বসে রইলো ওরা। কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ছে এখানে-সেখানে। বিজলী চমকে উঠছে এই দিনের বেলাতেও।

হঠাৎ মহুয়া মাটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'সাপ।'

সবাই চেয়ে দেখলো, একটা মস্ত পাইথন গাছে উঠবার চেষ্টা করছে। ও উঁচু একটা জায়গা চায়, বৃষ্টির জলে নেয়ে গেছে একেবারে। গাছে উঠে এলে সর্বনাশ হবে। কামাল রাইফেল তুললো। বেশ অনেকক্ষণ সই করে গুলি করলো। পেটের কাছে কোয়ার্টার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ছড়ে গেল সাপটার। স্যাঁৎ করে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে ফেললো সাপটা। কিন্তু চলে যাওয়ার নামও করলো না। কুণ্ডলী পাকিয়ে রাগে ফোঁসফোঁস করলো কিছুক্ষণ, তারপর আবার গাছে উঠে আসার চেষ্টা করতে লাগলো।

এবার একেবারে চাঁদি সই করলো কামাল। ফুটো হয়ে গেল মাথাটা। থপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল সাপটা। আশপাশের খানিকটা জায়গা লাল হয়ে গেল রক্তের রঙে।

মহুয়া বললো, 'দেখো, মরেনি এখনও। কি ভীষণভাবে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।'

'মরে গেছে। মরবার পরেও অনেকক্ষণ এই রকম কুণ্ডলী পাকায় পাইথন। এর মধ্যেও যদি কোনো মানুষ পড়ে তো চাপ দিয়ে দলা করে দেবে। শহীদ ছুরি দিয়ে একটা ডাল কেটে ফেলে দিলো সাপটার কুণ্ডলীর মধ্যে। মড়মড় করে ভেঙে গেল ডালটা। তবু ছাড়ে না, সমানে চাপ দিয়ে চলেছে।

'নামবো কি করে!' মহুয়া সভয়ে জিজ্ঞেস করে।

'সে দেখা যাবে'খন। আপাততঃ বৃষ্টিটা তো থামুক।' শহীদ জবাব দেয়।

বৃষ্টি পড়ে চলে ঝমাঝম, একটানা। একফোঁটা দু'ফোঁটা করে সবার গায়েই জল পড়ছে। মহুয়ার কোঁকড়া চুলের ওপর বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

এমনি সময় খুব কাছ থেকে বেজে উঠলো সরোদ। সবাই একবার সবার দিকে চাইলো, কেউ কোনো কথা বললো না। কুয়াশা ছায়ার মতো তাদের অনুসরণ করছে। আর তা জানাতেও ওর অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সরোদ বাজায় কেন? শহীদ ভালবাসে বলে, নাকি না বাজিয়ে থাকতে পারে না?

'এটা কি রাগ শহীদ? আর কখনো শুনিনি তো,' কামাল বলে।

'গৌড় মল্লার।'
'রূপটা কি এই রাগের?'
শহীদ বললো,

'গৌড় সারং যো মালহার দোনো
মিলমিলে খেড়েঁকার
বোলত হ্যয় বরখাতি রিমঝিম
গাও গৌড় মালহার।'

সবাই চুপচাপ শুনছে। আধঘন্টার মতো বাজিয়ে থেমে গেল কুয়াশা। তবলা নেই। কিন্তু ওদের কারও খেদ থাকে না। আলাপেই সম্পূর্ণ রূপটা ফুটিয়েছে কুয়াশা, গতের দরকার নেই। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। এই অদ্ভুত মানুষটার উদ্দেশ্যে সবারই মাথা নিচু হয়ে আসে শ্রদ্ধায়। কতবড়, কতো উঁচু মানুষটা! বড় কষ্ট লাগে শহীদের।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। শহীদরা নেমে এলো গাছ থেকে। তখনও কুণ্ডলী পাকাচ্ছে পাইথনটা।

তেরো

অনেকদূর পশ্চিমে চলে গেছে শহীদরা। তারপর আবার উত্তরে। জংলী এলাকার কাছে এসে পড়েছে তারা। সেই সারি বাঁধা গাছগুলোর ধার দিয়ে তারা বাঁ দিকের পথ ধরে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ কাছেই একটা রাইফেলের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো শহীদ। পুবদিক থেকে এলো শব্দটা। আবার আওয়াজ। এবার আর একটু কাছে থেকে।

'শিগ্‌গির বনের মধ্যে সরে আয়।' সবাইকে নিয়ে শহীদ রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, 'গফুর দেখ তো এই গাছটায় চড়তে পারিস কি না।' একটা মোটা গাছ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শহীদ।

গফুর চড়তে চেষ্টা করলো গাছটায়। কিছুদূর উঠেই ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল পা পিছলে। ভেজা গাছে এভাবে বেয়ে ওঠা সম্ভব না। সবাইকে রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়ে গফুরের কাঁধে চড়ে গাছটার একটা নিচু ডাল ধরলো শহীদ। তারপর খুব সাবধানে উঠে গেল গাছে। ধীরে ধীরে গাছের আগায় উঠে গেল শহীদ। সেখান থেকে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে সে।

গাছের ওপর থেকে শহীদ দেখলো, ফুলপ্যান্ট আর হাফশার্ট পরা চারজন নিগ্রো

রাইফেল বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পুবদিকে মুখ করে। আর তাদের সামনে বেশ কিছুটা দূরে বিশ-পঁচিশজন নেংটি-পরা জংলী দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন জংলী মাটিতে পড়ে আছে। একজনের কপাল থেকে তাজা রক্ত পড়ছে। এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জংলীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেউ সাহস করে এগোচ্ছে না, দু'জন সাথীকে চোখের সামনে মারতে দেখে। ফুলপ্যান্ট পরা লোকগুলো একপা একপা করে পিছনে সরছে। বোধ করি জংলীরা এদের আক্রমণ করেছিল, তাই এরা গুলি করে দু'জনকে শেষ করে দিয়েছে, এখন পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্যান্ট-পরা লোকগুলো কারা। জংলীরা এদের আক্রমণ করে কেন?

কিন্তু পিছনে ওরা কারা? দশ-বারোজন নেংটি-পরা লোক মুগুর হাতে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে প্যান্ট পরিহিতদের পিছন দিক দিয়ে। শহীদ একবার ভাবে, লোকগুলোকে সাবধান করে দেবে? কিন্তু তাতে নিজেদের বিপদ হতে পারে। জংলীরা তাদেরও আক্রমণ করবে। এই অবস্থায় চুপচাপ দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্যান্ট-পরা লোকগুলো অতি সাবধানে পিছনে হটে যাচ্ছে। ওরা টেরও পেলো না কী বিপদ ঘনিয়ে আসছে তাদের অজান্তে। সামনের জংলীরা পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওরা পিছনে সরছে। শহীদ ভাবে ব্যাটারা ফিরে চায় না কেন একবার!

সৈনিকের মাথার পিছনে চোখ থাকে না; কিন্তু দেখা যায় যুদ্ধ-ফ্রন্টে চলতে চলতে হয়তো কেউ, কোনও কারণ নেই, হঠাৎ শুয়ে পড়লো মাটিতে। কি যেন সন্দেহ হয়েছে তার; আর অমনি তার মাথার ওপর দিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলি চলে গেল সাঁ করে। মানুষ কি করে যেন তার বিপদের কথা আগেই টের পায়; কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না। ঠিক সেই কারণেই, কিংবা শহীদের ইচ্ছাশক্তির জোরে একজন প্যান্ট-পরা নিগ্রো ফিরে তাকালো পিছনে। চমকে উঠে কি যেন বললো সে। কিন্তু আর সময় নেই, পিছনের জংলীরা হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়েছে। প্রস্তুত হবার আগেই মুগুর হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো জংলীরা তাদের ওপর।

আধ মিনিটের মধ্যে ওদের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে মুগুর-পেটা করে মাটিতে শুইয়ে ফেললো ওরা। সামনের লোকগুলোও এগিয়ে এসেছে। চারজনকেই হাত-পা বেঁধে ফেললো ওরা। তারপর তাদের প্রত্যেকের বাঁধা হাত আর পায়ের মধ্যে দিয়ে একটা করে বাঁশ ঢুকিয়ে দিলো। দু'জন করে জংলী একেক জনকে কাঁধে তুলে নিলো। তারপর হৈ হল্লা করতে করতে রওনা হলো।

কিন্তু ফুলপ্যান্ট পরা নিগ্রোগুলোর মুখ দেখতে পেয়েই শহীদ চিনতে পারলো। কুফুয়ার চার ছেলে! চমকে ওঠে শহীদ। এরা এখানে কেন? এরাই তাহলে তাদের

ধাওয়া করে এসেছে! কী সাংঘাতিক! তাদেরকে খুন করে রেখে চেক নিয়ে যাওয়ার মতলবে এতদূরে এসেছে এরা! কাল রাতে কামালের সাপ মারার শব্দ শুনে জংলীরা এদিকটা খোঁজ করতে এসেছিল। কুফুয়ার চার ছেলেকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে চলে গেল।

হৈ-চৈ যখন বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে, তখন শহীদ ধীরে ধীরে নেমে এলো গাছ থেকে। নিচে কামালরা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। ওরা এতক্ষণ কেবল হৈ-হল্লা শুনছে, কি ঘটছে কিছুই বোঝেনি।

শহীদ যা যা দেখেছে সব বললো ওদেরকে। কামাল বললো, 'যেমনি কর্ম তেমনি ফল। আমাদের খুন করতে এসে এখন যাও বাবারা, কুমীরের পেটে যাও।'

'ওদের কি মেরে ফেলবে জংলীরা?' মহুয়া জিজ্ঞেস করে।

'না মারবে না; মেঠাই-মণ্ডা খাইয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে,' কামাল বলে।

'তোর এই উচ্ছ্বাস রাখ তো, কামাল। আমাদের অনেক পথ চলতে হবে, রওনা হওয়া যাক,' শহীদ বললো।

রওনা হলো শহীদরা। সারাদিন হাঁটার পর বিকেলের দিকে পাহাড়ের কাছটায় পৌঁছলো তারা। পথে এক জায়গায় বসে ওরা কিছু খেয়ে নিয়েছে। সবাই কিছু কিছু করে ব্র্যাণ্ডিও খেয়েছে, কিন্তু তবু পুরোপুরি ক্লান্তি যায়নি। সবারই পা টন্ টন্ করছে। মহুয়ার তো সবচাইতে বেশি। কিন্তু মুখে কেউ কিছুই প্রকাশ করে না।

আর কিছুদূর যেতেই শহীদ যা চাইছিল তা পেয়ে গেল। ঝড় দেখেই শহীদ বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল। কামালকে বলেছিল, এর ফল ভালোও হতে পারে। কামাল তখন কিছুই বোঝেনি। এখন দেখলো, সারির মধ্যেকার পাশাপাশি তিনটা গাছ সম্পূর্ণ উপড়ে পড়ে আছে। আর তার জায়গায় টাটকা গর্ত। সেখানে অল্প জল জমেছে। গাছগুলো সাইক্লোনে ভেঙেছে। সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। ইচ্ছেমত ঝাপ্টা দিতে পেরেছে বাতাস।

'ব্যাস। আর চিন্তা কি? এবার অনায়েসে জংলী এলাকায় ঢোকা যাবে।'

'কিন্তু ভেতরেও যেন বন দেখা যায়?' কামাল বললো।

'ওগুলো বন না। জংলীদের নিজ হাতে লাগানো ফলের বাগান। চল তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ি ভিতরে, নইলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারি।'

গাছের ওপর দিয়ে খুব সাবধানে পার হয়ে এলো ওরা। আসার সময় ব্যাগ থেকে একটা রুটি আর কিছু মাখন বের করে শহীদ একটা ভাঙা গাছের ওপর রেখে এলো। কামাল ঠাট্টা করে বললো, 'কিরে, মন্ত্র পড়ে রেখে এলি নাকি।' কোনও জবাব না দিয়ে

সোজা পুবদিকে চলা শুরু করলো শহীদ।

সত্যি। জংলী হলে কি, লোকগুলোর রুচি আছে। গাছগুলোর তলা তকতকে পরিষ্কার। কোনো আগাছা জন্মাতে পারেনি সেখানে। নানারকম ফলের গাছ রয়েছে. কিন্তু কোনটা এলোমেলো না। যেখানে নারকেল, সেখানটায় কেবলই নারকেল. যেখানে আম, কলা বা অন্য কোনও ফল, সেখানে কেবল তাই। অনেকদূর পর্যন্ত নির্ভাবনায় চলে এলো শহীদরা। হঠাৎ কাছেই কথাবার্তার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো। চট করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো তারা। দেখা গেল, চার-পাঁচজন জংলী একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে এই দিকেই আসছে। ভুট্টাখেতের পাশ দিয়ে এতক্ষণ আসছিল বলে শহীদরা দেখতে পায়নি ওদের। জংলীরা খেতের ঠিক পাশের বাগানটায় থামলো। দু'তিনজন গাছে উঠে গেল। ওই সারিটার সবই আম গাছ। ডাল ধরে ঝাঁকি দিয়ে ওরা অনেক পাকা আম পাড়লো। মস্ত বড় বড় ফজলি আমের মতো আম। কয়েকটা গাছ থেকেই পাড়লো ওরা। তারপর ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে আম নিয়ে চলে গেল।

মহুয়া হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'একটা আমও দিলো না!'

'চাইলেই পারতে?' কামাল বলে।

'আর পা চলে না, দাদামণি।' গফুর বসে পড়লো মাটিতে।

'এই, এখানে শুয়ে পড়িস না। একটু এদিকে সরে আয়, পরিষ্কার ঘাস আছে এখানে। আমরা সবাই এখন শুয়ে-বসে বিশ্রাম করবো। আমাদের আজ অনেক পথ চলতে হবে। কিন্তু একটু আঁধার না হলে চলা ঠিক হবে না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা এখানে বিশ্রাম করবো।'

সবাই ঘাসের ওপর বসে পড়লো। গফুর একটু দূরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বললো, 'দাদামণি, যাবার সময় আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিও। আমি একটু ঘুমাবো।'

'তো কাল বাহাদুরী করতে গেছিলি কেন গাধা?' শহীদ স্নেহের সুরে বললো।

কামাল টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর শহীদও। আরও কিছুক্ষণ পর মহুয়াও শুয়ে পড়লো। সবচাইতে ক্লান্ত হয়েছে মহুয়াই। ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে শহীদ।

'মহুয়া, ঘুমিয়ে পড়ো না কিন্তু। এই কামাল, শরীরে মশা-মাছি বসতে দিস না।'

'কিস্ লিয়ে?' আরাম পেয়ে উর্দু বেরোয় কামালের।

'সি-সি' মাছির নাম শুনেছিস?'

চমকে উঠে বসলো কামাল। চোখ বড় বড় করে বললো, 'যে মাছি কামড়ালে জীবজন্তু ঘুমাতে ঘুমাতে মরে যায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেগুলো তো আফ্রিকার মধ্যভাগে থাকে, কঙ্গোর কাছাকাছি।'

'কিছু কিছু সবখানেই থাকে। বিশেষ যেসব জায়গায় মিষ্টি ফলের গাছ আছে সেখানে বেশি থাকে।'

কামাল চুপ করে আবার শুয়ে পড়লো। কিন্তু শহীদ লক্ষ্য করে, বড় বেশি হাত-পা নাড়ছে সে। শরীরের কোথায়ও একটু চুলকালেই ও ভাবে, এই বুঝি 'সি-সি' মাছি কামড়াল। কারণে-অকারণে যেখান-সেখানে চুলকাচ্ছে সে। এদিক-সেদিক কেবল মাছি দেখছে কামাল। ওর অবস্থা দেখে হেসে ফেলে শহীদ।

'অতো ঘাবড়াবার দরকার নেই, কামাল। আমি 'সি-সি' মাছির প্রোটেকশনের জন্যে অ্যানটিসাইড নিয়ে এসেছি সাথে করে। তবু একটু সাবধানে থাকা ভালো, কি দরকার শুধু শুধু ইনজেক্শন নিয়ে।'

এই কথায় কামাল আশ্বস্ত হলো অনেকখানি। বললো, 'আমি তো ঘাবড়াইনি মোটেও। মরতে তো একদিন হবেই।'

কামাল অনেকটা নিশ্চিত হয়ে শুয়ে রইলো চিতপাৎ। মহুয়া এদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। গাছের তলাটা ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে। আর একটু পরেই ওরা রওনা হবে। শহীদ মহুয়াকে জাগালো আস্তে করে। কামাল আর গফুর তখন নাক ডাকাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। ব্যাগ থেকে দুইটা রুটি বের করলো শহীদ। মহুয়াকে বললো, 'তুমি এগুলো কেটে মাখন লাগাও তো, আমি দেখি কয়টা আম পেড়ে আনা যায় কিনা।'

'এখন আবার খাবে?'

'হ্যাঁ, খেয়ে নিই। হয়তো সারারাত পথ চলতে হবে আমাদের।' শহীদ চলে গেল আম আনতে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো দশ-বারোটা ইয়া বড় বড় আম নিয়ে। মহুয়া তখন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো রুটিগুলোতে মাখন লাগানো শেষ করেছে। গফুর আর কামালকে জাগিয়ে সবাই মিলে পেট পুরে খেয়ে নিলো।

আমগুলো যেমন বড়, তেমনি মিষ্টি। খেতে খেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাল বললো, 'লীনা বড় ভালবাসে আম খেতে।'

মহুয়া হেসে ফেলে কি যেন ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হাঁটা শুরু করলো শহীদরা। অনেক ভুট্টাখেত করেছে জংলীরা জায়গায় জায়গায়। তবে ফলের বাগানই বেশি। এক জায়গায় অজস্র কলাগাছ লাগিয়েছে ওরা। অনেকগুলো কাঁদি ঝুলে রয়েছে। সে কাঁদিও কাঁদি বটে। একজন

মানুষের গলা পর্যন্ত উঁচু হবে এক একটা। শহীদরা এগিয়ে চলেছে পুবে। মন্দিরের কাছাকাছি যাবে তারা।

চাঁদের আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে পথ। মাঝে মাঝে ভুট্টাখেতের মধ্যে দিয়ে চলে তারা, মাঝে মাঝে ঘন বাগানের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। কামাল বললো, 'এখানে বন্য জন্তুর কোনও ভয় নেই, তাই না শহীদ?'

'নেই। কিন্তু সাপের ভয় সমানই আছে।'

বহুদূর চলে এলো তারা। পাঁচ ঘন্টা সমানে চলার পর দূর থেকে অনেকগুলো খড়ের-কুঁড়েঘর দেখা গেল। কয়েকজন লোককেও চলাফেরা করতে দেখা গেল বাড়ির আশপাশ দিয়ে। শহীদরা এবার খুব সাবধানে এগোচ্ছে। ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ হবে। আর বেরোবার পথ নেই। এতো পরিশ্রম, এতো কষ্টের পরিণাম হবে মৃত্যু।

হ্যাঁ! এই কুঁড়ে ঘরটাতেই কাল রাতে শহীদের বাবা ঢুকেছিলেন। একটা ভুট্টাখেত পার হলেই ঘরটা। বেশ অনেকটা দূরে ঘন অন্ধকার গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো শহীদরা। দূরে কয়েকজন লোক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। ওটাই বোধ হয় এখানকার সড়ক। আজ জংলীরা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত। খুব বড় একটা ব্যাপার হবে আজ।

কামালদের প্রস্তুত থাকতে বলে শহীদ খুব সাবধানে ভুট্টাখেতের মধ্যে ঢুকে পড়লো। গফুর সাথে আসতে চাইলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়েছে শহীদ। সবাই দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে রইলো গাছের তলে।

হামাগুড়ি দিয়ে ভুট্টাখেতটা পার হলো শহীদ। চারদিকে চেয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। সামনে হাত দশেক খালি জায়গা, তারপরই ঘরটা। আলোটা কমে এলো। শহীদ চেয়ে দেখলো একটা টুকরো মেঘ চাঁদকে আড়াল করেছে। নিঃশব্দে দু'তিন লাফে শহীদ ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ালো।

লম্বা কাঠ চেলা করে পাশাপাশি পুঁতে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। ওপরে খড়। বেশ মজবুত ঘরটা, কিন্তু কাঠের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। একটা ফাঁকে চোখ লাগিয়ে শহীদ দেখলো ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। খাটের ওপর শুয়ে আছেন তার বাবা। কয়েকজন জংলী ঘরের মধ্যে মাটিতে বসে রয়েছে। তাদের মধ্যে কি যেন কথা হচ্ছে।

শহীদের বাবা কি যেন বললেন ওদেরকে জংলী ভাষায়। সবাই বেরিয়ে গেল বাইরে।

লোকগুলো যখন অনেকদূর চলে গেল তখন শহীদ পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ওকে চোরের মতো ঢুকতে দেখে ওর বাবা লাফিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। জংলী ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করলেন তিনি। শহীদ পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'বাবা,

আমি শহীদ, আপনার ছেলে!'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ইসলাম খাঁ। তাঁর চোখ দু'টোতে বিস্ময়। তিনি স্বপ্ন দেখছেন না তো? একী সম্ভব? নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

'আমার ছেলে, শহীদ?' ইসলাম খাঁ ফিসফিস করে বললেন, 'I don't believe. আমি বিশ্বাস করি না। You are a beautiful dream, তুমি একটা মধুর স্বপ্ন!'

শহীদের চোখে পানি ভরে উঠলো। দুঃখ আর করুণায় বিচলিত হলো অন্তর। বললো, 'বাবা···আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি আমি।'

ইসলাম খানের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ–মুখ–শরীর কেঁপে ওঠে একটা প্রবল আবেগে। হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি। শহীদ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। চোখে অবিরল অশ্রুর স্রোত। মৃদু ফিসফিস স্বরে বললেন, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! After seventeen years! God··· আমার মোনাজাত তাহলে খোদা মঞ্জুর করেছেন।'

শহীদ বললো, 'আমি একা না। কামাল আর আরও কয়েকজন এসেছে। ওদিকে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা।'

'তুমি এখানে এলে কি করে, শহীদ?'

'সে অনেক কথা, বাবা। এখন তাড়াতাড়ি বলুন কি ভাবে আপনাকে নিয়ে সরে পড়া যায়। আমরা অনেক কষ্ট, অনেক পরিশ্রম করে এই পর্যন্ত এসেছি।'

'আজ এখানে চারজন লোককে কুমীরের কাছে বলি দেয়া হবে। আমাকেই নিজ হাতে দিতে হবে বলি। তারপর···'

'নদীর ধারে জংলীরা রাতের বেলা যায় না, তাই না?' বাধা দিয়ে কাজের কথা বলে শহীদ।

'না, যায় না। আমার সাথে মাত্র ছ'জন যাবে লোকগুলোকে পানিতে ফেলতে। আমরা···'

'ঠিক আছে। আমরা নদীর ধারে থাকবো। আপনি আমাদের কাছাকাছি এলেই আমরা গুলি করে ছ'জনকেই খতম করে দেবো। তারপর একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যাবে পালাবার। আমাদের লঞ্চ এখান থেকে মাইল চার–পাঁচেক দূরে নোঙর করা আছে। জলপথেই বোধহয় সুবিধা হবে যাওয়ার।'

'ছ'জনকে শেষ করতে পারো হয়তো, কিন্তু আরগুলো? এখানে প্রায় তিন হাজার লোক আছে। সবাই আসবে আজকের এই উৎসবে। এদের ঠেকাবে কি করে? এরা মরণকে ডরায় না।'

এমনি সময় শোনা গেল কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে আসছে ওদের ঘরের দিকে। শহীদ দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোথাও লুকোবার জন্যে চলে যচ্ছিলো। ওর বাবা ওকে টেনে আনলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো এখানে, কথা বলো না।'

দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কবাটের দু'ধার ধরে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর সাথে কি কি সব কথা বললেন। লোকগুলো খুব হাসলো, তিনিও হাসলেন। তারপর চলে গেল ওরা।

'আধঘন্টার মধ্যেই আমাদের পূজা শুরু হবে। তোমরা এর মধ্যে চলে যাও নদীর পারে। আরেকটা কথা। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে। এখানকার লোকগুলো মহাপ্রলয় অর্থাৎ কেয়ামতকে ভীষণ ভয় পায়। ওদের বিশ্বাস একদিন একজন বিদেশী এসে ওদের দ্বারা নির্যাতিত হবে। সেই বিদেশীর অভিশাপে শুরু হবে মহাপ্রলয় আর তার ফলে এখানকার সব লোক মারা যাবে। আমি ওদের বলবো, যেন আঁচ করতে পারছি সেই মহাপ্রলয়ের বিদেশী এসেছে। এই চারজনের মধ্যেই একজন হচ্ছে সেই বিদেশী। এদের বলি দেয়া চলবে না।'

'কিন্তু এই বললেই কি ওরা শুনবে?'

'না শোনাই তো ভালো। ঠিকই ওরা শুনবে না। অনেকে আমার কথা বিশ্বাস করবে, অনেকে করবে না। অবিশ্বাসীরাই সংখ্যায় বেশি হবে। তারা আমাকে বলবে আমার কাজ চালিয়ে যেতে। আমি ওদের কথামত মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে লোকগুলোকে নদীর ধারে নিয়ে যাবো। ঠিক সেই সময় যদি কথা নেই বার্তা নেই রাইফেলের গুলি ছোঁড়া শুরু হয়, তাহলে কারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকবে না যে কেয়ামত শুরু হয়েছে। যে যেদিক পারে পালাবে। তখন আমাদের সরে পড়ার খুব সুবিধা হবে।'

'খুব ভালো বুদ্ধি হয়েছে। আমরা যেই গুলি করবো অমনি আপনি বন্দীদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেবেন। আমি এখন যাই।'

শহীদ বাইরে বেরিয়ে এলো। এদিককার কাজ হয়ে গেছে। এবার ওদিকটা ঠিক রাখতে হবে। ভুট্টাখেতের দিকে কয়েক পা এগিয়েছে শহীদ, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন সাপটে ধরলো তাকে। অত্যন্ত কষে ধরেছে সে। ভীষণ বলশালী হাতের পেশী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোতেও। পিছন থেকে চাপা গলায় শব্দ এলো, 'Now Shahid?'

কিন্তু বেচারা শহীদকে চিনতো না। এক মুহূর্তের মধ্যে যুযুৎসুর এক প্যাঁচে পিছনের লোক সামনে চলে এলো। তারপরেই প্রচণ্ড এক লাথি তলপেটে। একটু কুঁজো হয়েছে অমনি তলপেটে আবার হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো। কোঁক করে পড়ে গেল

লোকটা মাটিতে। কাছেই একটা শব্দ হলো। শহীদ চেয়ে দেখলো তার পাশে দাঁড়িয়ে মি. ব্লাইদ আরেকজনের তলপেটে হাঁটুর ভীষণ এক গুঁতো লাগালো। সেও নিঃশব্দে ঝুপ করে পাটিতে পড়লো। মি. ব্লাইদ বললো, 'dead!'

শহীদ বললো, 'আমারটাও dead; কিন্তু ইংরেজি ছেড়ে এখন বাংলা বলো তো, কুয়াশা। চলো আগে এগুলোকে টেনে ভুট্টাখেতের মধ্যে ফেলে দিই।'

দু'জনে জংলী দু'টোকে টেনে ভুট্টাখেতের বেশ ভিতরে এনে রেখে দিলো। শহীদ লক্ষ্য করলো তাকে যে ধরেছিল, সে হচ্ছে সেই লম্বা সর্দার। যাক, আর কোনদিন সর্দারী করতে হবে না তাকে, এতক্ষণে আর এক দুনিয়ায় চলে গেছে সে।

'তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালে কখন?' শহীদ জিজ্ঞেস করে।

'ওই ব্যাটা তোমার মাথায় মারবার জন্যে মুগুর উঠিয়েছিল, তাই চট্ করে ধরলাম গিয়ে! কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে?'

'তুমি এমন হাজারটা তাগড়াই মোচ লাগাও না কেন, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও বেশ সুন্দর করে লাগিয়েছ, কিন্তু এমন সুন্দর চোখ দু'টো কোথায় লুকোবে বলো তো বন্ধু?'

'তাহলে বলো আগেই চিনতে পেরেছো আমাকে?'

'লরেঞ্জো মারকুইসে যেদিন প্রথম তোমার লঞ্চে উঠেছি, সেদিনই চিনেছি।'

'তাই তো, চোখ দু'টোর জন্যে কিছু বের করতে হয় তো এবার! আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি অথচ তোমরা চিনতে পারছো না, এ ভেবে আমি কতো আনন্দই না পেয়েছি, অথচ···! ছিঃ!'

হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে ওরা। কিছুদূর এসে কুয়াশা বললো, 'তুমি যাও, আমি আমার সরোদটা নিয়ে আসি।'

'কিন্তু তোমাকে যে আমার খুব দরকার, বন্ধু। আমরা আজই বাবাকে নিয়ে যেতে চাই। তারই কথাবার্তা হলো এখন। ওরা যখন কুফুয়ার ছেলেদের খালে ফেলতে যাবে তখনই আমরা গুলি ছোঁড়া শুরু করবো।'

'বেশ। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আমার সরোদটা নিয়ে আসি। কাছেই লুকিয়ে রেখেছি ওটা ভুট্টাখেতের মধ্যে।'

'ওটা থাক না এখন। আনতে গেলে দেরি হবে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'আচ্ছা···চলো।'

মি. ব্লাইদকে দেখেই কামাল শহীদকে বললো, 'এই ব্যাটাকে আবার কোত্থেকে পেলি, শহীদ? হঠাৎ উড়ে এসে হাজির!'

'আমি কুয়াশা, কামাল।' কুয়াশা হেসে বলে।

'অ্যাঁ! কি বললেন? আপনি কুয়াশা? কুফুয়াদের ওখানে নিগ্রো সেজে ছিলেন, এখন দেখছি দিব্যি সাহেব।'

'তোমাকে কিন্তু মি. ব্লাইদের মতো লাগছে দাদা,' মহুয়া বলে।

শহীদ হেসে ফেললো, 'ও-ই তো ব্লাইদ। এতদিন ছদ্মবেশে আমাদের লঞ্চ চালিয়েছে।'

কামাল আর মহুয়া হেসে উঠলো। গফুর ভীষণ লজ্জা পেলো, এতদিন সাহেবকে বাংলায় যা-তা কথা বলেছে মনে করে।

'আর দেরি করো না, চলো, খালের ধার এখনও অনেকখানি দূর।' কুয়াশা চলতে শুরু করে।

খালের ধারের বিরাট ঝুপড়ীওয়ালা গাছটার নিচে দাঁড়ালো গিয়ে শহীদরা। গাছটার তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। আত্মগোপন করে থাকবার পক্ষে এই জায়গাটাই সবচাইতে ভালো।

সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মন্দিরের সামনের মাঠের সবটুকু। অসংখ্য নারী-পুরুষ সমবেত হয়েছে সেই মাঠে। ভীষণ হৈ-চৈ। কয়েকটা ঢাকের আওয়াজে কানে তালা লাগবার উপক্রম।

কামাল বললো, 'পল্টন ময়দানে ফজলুল হকের বক্তৃতা শুনতেও এতো লোক হয় না।'

'ওদের একটু তাড়াতাড়ি করতে বলো না, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে,' মহুয়া বলে।

সবাই একটু হাসে। শহীদ হাতঘড়ির দিকে তাকায়। আড়াইটা।

হঠাৎ গোলমাল থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সমস্ত মাঠটায় অখণ্ড নীরবতা থমথম করতে লাগলো। এতগুলো লোক একখানে, কিন্তু একটু শব্দ নেই। চার-পাঁচজন পরপরই একজনের হাতে একটা করে মশাল জ্বলছে। তার আলোতে থমথমে মুখগুলো ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

একটু পরেই উঁচু একটা পাথরের ওপর কয়েকজন লোকের সাহায্যে উঠে দাঁড়ালেন ইসলাম খাঁ। সাদা আলখাল্লা পরেছেন তিনি। বন্দীদেরও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাথরের ওপর এনে রাখা হলো।

এবার ইসলাম খাঁ চিৎকার করে কি যেন বললেন। সবাই হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর একটা গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য ভ্রমর উড়ে বেড়াচ্ছে আশপাশে। গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শুনে কেমন যেন ভয় ভয় করে। কোনো এক অদৃশ্য মহাশক্তির সামনে মাথা নতো হয়ে আসে।

থেমে গেল মন্ত্রোচ্চারণ। চারদিক নিস্তব্ধ। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো সবাই। এবার

ইসলাম খাঁ মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। কয়েকজন জংলী পাথরের ওপর উঠে এসে বন্দীদের পায়ের বাঁধন খুলে দাঁড় করালো। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করলেন ইসলাম খাঁ। মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গি করলেন তিনি। তাই দেখে মহুয়া তো হেসেই খুন।

মন্ত্রপাঠ শেষ করে বাটি থেকে কি একটা জিনিস তুলে বন্দীদের কপালে মাখিয়ে দিলেন তিনি।

হঠাৎ অত্যন্ত কাঁপা শুরু করলেন তিনি। থরথর করে সমস্ত শরীর কাঁপছে। কপালের দু'ধারের রগ টিপে ধরেন ইসলাম খাঁ। ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে তাঁকে। কয়েজন জংলী এগিয়ে এসে তাঁকে ধরলো।

ময়দানের সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো দেখা যাচ্ছে। সবাই এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। কামাল উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো, 'কি হলো চাচাজানের? শরীর খারাপ নাকি?'

শহীদ হাসলো। বললো, 'অভিনয় শুরু হয়েছে। বুড়োর রস তো কম না।'

'কিসের অভিনয়?'

'পরে শুনিস। এখন কেবল দেখে যা।'

কাঁপতে কাঁপতে পাথরের ওপর বসে পড়লেন ইসলাম খাঁ।

এবার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সবার মুখেই এক প্রশ্ন, 'কি হলো?'

আবার উঠে দাঁড়ালেন ইসলাম খাঁ। হাত উঁচু করে থামতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই চুপ হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ওদের কি কি সব বললেন।

ময়দানের সব লোককে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি কি বলাবলি করতে লাগলো। ক্রমে ভীষণ কলরব। কারও কথা কেউ শুনতে পায় না, সবাই কথা বলতে চায়।

আবার হাত ওঠান ইসলাম খাঁ। সবাই থেমে যায়। আবার কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। এবার জন–পনেরো লোক এগিয়ে আসে তাঁর দিকে। বোধহয় এরাই মোড়ল এখানকার। কিছুক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে কথা বললো, তারপর ইসলাম খাঁকে কি যেন বললো। তিনি হাত নেড়ে ওদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে এলেন বন্দীদের কাছে। তিনি তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বোধকরি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন জোরে জোরে। সকালের মৃতদেহ দুটোও পাথরের ওপর নিয়ে আসা হলো। তিন–চারজন জংলী জল নিয়ে এলো কুঁজো করে। তারপর মৃতদেহ দুটোকে স্নান করালো সেই পাথরের ওপরই উলঙ্গ করে। তাদের কপালেও সেই বাটি থেকে কি যেন নিয়ে মাখিয়ে দিলেন ইসলাম খাঁ।

তারপরই শুরু হলো ঢাক আর হট্টগোল। ওরা এগিয়ে আসছে। পাথর থেকে নেমে

ইসলাম খাঁ খালের দিকে চলতে লাগলেন খুব ধীরে ধীরে। ছ'জন জোয়ান লোক বন্দী চারজন আর লাশ দু'টোকে কাঁধে তুলে নিয়ে তার পিছন পিছন চলছে। আর বাকি সবাই কিছুটা দূরত্ব রেখে পিছন পিছন ভীষণ হৈ-হল্লা করতে করতে আসছে। কাছে এসে পড়েছে ওরা। খাল থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে এসে পিছনের জনতা থেমে গেছে। জংলীরা সব পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে মহুয়ার। এখনি একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে। ফলাফল কি হবে তা এখনও অনিশ্চিত। হয়তো ওরা জংলীদের হাতে ধরা পড়বে। হয়তো বা পালিয়ে যেতে পারবে। চোখের সামনে দেখছে সে, শহীদের বাবা এগিয়ে আসছেন। চারদিকে সব চুপ। এই নিস্তব্ধতা সময়টাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। বড্ডো আস্তে হাঁটছেন শহীদের বাবা। সময় যেন এগোতেই চাইছে না। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা কিসের স্রোত অনুভব করে মহুয়া।

'সবাই প্রস্তুত?' শহীদ প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। প্রস্তুত।' স্থির দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে থাকে কুয়াশা।

সকলেই উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে। কামাল আর গফুরের কপাল ঘামতে শুরু করলো। শুধু পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা আর শহীদ। অদ্ভুত এদের স্নায়ুর শক্তি। কোনো চাঞ্চল্য নেই।

'আমি, কুয়াশা আর কামাল গুলি করবো। গফুর, তুই হাতবোমা নিয়ে তৈরি থাক। আমাদের গুলির পরই ছুঁড়বি।'

এগিয়ে আসছেন ইসলাম খাঁ। সাঁকোটার ওপর গিয়ে জলে ফেলে দেয়া হবে মৃতদেহ আর বন্দীদের। সবাই চুপ করে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

ইসলাম খাঁ অর্ধেক পথ এসেছেন, অমনি তিনটা রাইফেল একসাথে গর্জন করে উঠলো। তিনজন বাহক তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল মাটিতে। আবার গর্জন করে উঠলো রাইফেল। বাকি তিনজনও। শহীদের বাবা বসে পড়লেন বন্দীদের বাঁধন খুলবার জন্যে।

এদিকে জংলীরা ভড়কে গেল। সত্যই কি তাহলে মহাপ্রলয় শুরু হলো? এমন তো আর কখনো হয়নি।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে তাদের সামনের কয়েকজনের ওপর হাতবোমা পড়লো। সামনের লোকগুলো আর্তনাদ করে পড়ে গেল মাটিতে। কেউ কেউ আহত না হয়েও ভয়েই চিৎকার করছে আর মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে।

ব্যাস, আর সন্দেহ নেই। মহাপ্রলয় এসে গেল। চারদিকে ভীষণ চিৎকার। মেয়েরাই চিৎকার করছে বেশি। যে যেদিকে পারে ছুটতে শুরু করলো এবার প্রাণভয়ে।

আবার বোমা পড়লো, আবার পড়লো। সেই সাথে তিন তিনটা রাইফেল সমানে চলছে। প্রচণ্ড শব্দ, আহতদের আর্তনাদ। সবাই প্রাণপণে ছোটে।

দু'মিনিটের মধ্যেই আহত আর মৃতদেহ ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন রইলো না সেখানে। দু'একজন আহত জংলী হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

বাঁধন খোলা হয়ে গেছে। শহীদের বাবা কুফুয়ার চার ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে আসছে শহীদদের দিকে। কিন্তু এখন পালাবার উপায় কি? কুয়াশা ছুটে গিয়ে নদীর ধারটা দেখে এলো। একটা নৌকাও নেই।

ইসলাম খাঁ বললো, 'এখানকার সব নৌকা আরও উত্তরে হ্রদের কাছে থাকে, এখানে তো একটাও পাওয়া যাবে না।'

সর্বনাশ! শহীদের মাথায় যেন বাজ পড়লো। নৌকার আশায়ই সে এতো কিছু করছে। এখন উপায়? পালাবে কোন পথে? আবার এতো ঘুরে পাহাড়ের কাছ দিয়ে? অসম্ভব! ঠিক ধরা পড়ে যাবে জংলীদের হাতে।

'আর হাতবোমা নেই?' কুয়াশা জিজ্ঞেস করলো।

'আর মাত্র একটা আছে। রাইফেলের গুলিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।' শহীদ বলে।

'দাও তো আমার কাছে ওটা।'

বোমা নিয়ে কুয়াশা এগিয়ে গেল গাছের সারির কাছে। তারপর ছুঁড়ে মারলো একটা গাছের গোড়া লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড আওয়াজে ফাটলো বোমা। ধুঁয়া সরে গেলে শহীদরা কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো দুটো গাছের গোড়ার দিকটা অনেকখানি গর্ত হয়ে কেটে গেছে। কিন্তু কিছুটা এখনও লেগে রয়েছে। গাছ দু'টো ওদের দিকে একটু হেলে দাঁড়িয়ে আছে।

'এবার উপায়? একমাত্র সম্বল শেষ বোমাটাও গেল।' কামাল বলে।

'গাছ প্রায় কেটে গেছে। এখন গোটা কতক রাইফেলের গুলি লাগলেই পড়ে যাবে।'

শহীদ, কুয়াশা আর গফুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়া শুরু করলো। গোটা পঁচিশেক গুলি লাগতেই মড়মড় করে ভেঙে পড়লো একটা গাছ।

সবাই একে একে টপ্‌কে বেরিয়ে এলো জংলী এলাকা থেকে। ইসলাম খাঁ অত্যন্ত দুর্বল। শহীদ আর কুয়াশা তাঁকে হাত ধরে পার করে আনলো।

'এবার যতো শিগ্‌গির সম্ভব লঞ্চে গিয়ে উঠতে হবে।' শহীদ বলে। কিছুক্ষণ পরই যখন জংলীরা বুঝতে পারবে মহা-প্রলয়ে ওরা সবাই মরেনি, তখন আবার সাহস করে ফিরে আসবে এখানে। তখন আহতদের কাছ থেকে শুনবে আমাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা।

'ওদের বৃক্ষ-প্রাচীরও দেখবে ভাঙ্গা। তখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়া করবে আমাদের, এই তো!' কামাল বললো।

'হ্যাঁ। তার আগেই আমাদের পালিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো সবাই।'

কিন্তু ইসলাম খাঁ অসুস্থ। তিনি হাঁটতে পারছেন না। শহীদ কুফুয়ার বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাদের দু'জন কি আমার বাবাকে কাঁধে করে নিতে পারবে? আমরা খুবই ক্লান্ত, নইলে আমরাই নিতাম!'

ওরা সকলেই সাগ্রহে এগিয়ে এলো। বড় ভাইটা হঠাৎ শহীদের দুই হাত ধরে ফেললো। মিনতি করে বললো, 'আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, মি. শহীদ, আমরা এখানে এসেছিলাম আপনাদের খুন করে সাত হাজার পাউণ্ডের চেকটা কেড়ে নিতে। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের এখানে দেখে একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তবু আপনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন। আমরা এ ঋণ শোধ করতে পারবো না। আপনি জানেন না, নিগ্রোদের মধ্যে কেউ যদি কারও প্রাণ বাঁচায়, তবে সারাজীবন সে তার কেনা গোলাম হয়ে থাকে। নিগ্রো জাত কোনদিন কৃতঘ্নতা করে না। বলুন, আপনি ক্ষমা করেছেন, মি. শহীদ?'

'তোমাদের প্রাণ বাঁচানো আমার কর্তব্য ছিলো। তোমার বাবা আমাকে মস্ত বড় বিপদ থেকে কয়েকবার রক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী ছিলাম।'

'তার কাছে, আমাদের কাছে নয়। তিনি আমাদের ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।'

'তোমরা যদি এখন থেকে আমাদের সঙ্গে ভালো হয়ে চলো, কোনও রকম চালাকির চেষ্টা না করো, তো তোমার বাবাকে বলে আমি তাঁর মত বদলাবার চেষ্টা করবো। তিনি আমার কথা শুনবেন, আমার যতদূর বিশ্বাস। আর আমিও তোমাদের ক্ষমা করবো।'

'আপনি আর আমাদের অবিশ্বাস করবেন না, মি. শহীদ। আর কোনও অসদুদ্দেশ্য নেই আমাদের।'

শহীদের বাবাকে ওরা দু'জন পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো, তারপর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলা শুরু করলো। দু'দিনের অনবরত পরিশ্রম আর মানসিক উৎকণ্ঠায় মহুয়ার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সে শহীদের কাঁধে ভর করে চলেছে।

সব মিলিয়ে তাদের চলাটা বড় ধীরে হচ্ছে। অথচ অনেক দ্রুত চলা দরকার। নদীর ঘাট এখনও বহুদূর।

শহীদ কি একটা কথা বলতে কুয়াশাকে খুঁজলো। চারিদিক চেয়ে দেখলো সকলের অজান্তে কখন জানি কুয়াশা অদৃশ্য হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে। শহীদ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সাড়ে তিনটা বাজে।

চৌদ্দ

ভোর পাঁচটা। অন্ধকার দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। জংলী এলাকা থেকে প্রচণ্ড গোলমাল শোনা যাচ্ছে। অথচ শহীদরা এখনও পৌছতে পারলো না লঞ্চে। আরও আধ মাইল পথ যেতে হবে। পথে অনেকবার থামতে হয়েছে তাদের। শহীদের বাবা ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পরই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। মহুয়াকে শহীদ আর গফুর তুলে নিয়েছে পাঁজাকোলা করে। এই পথটুকু চলতে হলে ও ঠিক মরে যেতো।

হঠাৎ ঢাক বেজে উঠলো প্রচণ্ড শব্দে। অনেক লোকের হৈ-হল্লাও শোনা গেল।

'এটা ওদের যুদ্ধ ঘোষণার ঢাক।' ইসলাম খাঁ বললেন।

'তার মানে ওরা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে?'...কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ। ওরা সবাই যুদ্ধ-সাজে সেজে রওনা দিয়েছে। এখানে পৌছতে ওদের পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'দেড় ঘন্টার পথ পনেরো মিনিটে আসবে কি করে?'

'দেড় ঘন্টার পথ আমাদের কাছে।' ইসলাম খাঁ হাসলেন। 'ওদের কাছে এটা পনেরো মিনিটের পথ! ওরা ঘন্টায় দশ-পনেরো মাইল চলতে পারে গভীর বনের মধ্যে দিয়েও।'

'তার মানে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা ধরা পড়ছি? আমাদের আর গুলিও তো নেই বেশি। ঠেকাবো কি করে ওদের?' কামাল হতাশ হয়ে পড়ে।

'সবাই জোরে পা চালাও।' শহীদ হুকুম দেয়।

প্রায় দৌড়ের মতো করে চলেছে ওরা। বাঁচতেই হবে তাদের। কোনও মতে লঞ্চে পৌছতে পারলে হয়। সমস্ত শক্তি একত্র করে সবাই প্রাণপণ ছুটছে। কিন্তু সমান গতিতে চলা যাচ্ছে না! পথের মাঝে প্রায়ই মোটা ডাল কিংবা আস্ত গাছ কালকের ঝড়ে ভেঙে পড়ে আছে।

'থাম, থাম, আর পারি না।' চিৎকার করে উঠেন ইসলাম খাঁ। ভীষণ হাঁপাচ্ছেন তিনি।

দাঁড়িয়ে পড়লো সবাই। কিন্তু বিশ্রাম করবার সময় নেই। অথচ ইসলাম খাঁ আর সহ্য করতে পারছেন না। সবাই প্রমাদ গুণলো। শেষকালে তীরে এসে তরী ডুববে?

'আমাকে ফেলে রেখে তোমরা চলে যাও। আমাকে ওরা মারবে না, তোমাদের মারবে। আমার জন্যে তোমাদের সবাইকে আমি মৃত্যু বরণ করতে দেবো না।' ইসলাম খাঁ নামার চেষ্টা করেন! এদিকে ঢাকের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অনেক

ঢাক একসাথে বাজছে। 'লোকজনের চিৎকার একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শহীদরা আবার ছুটলো। আর অপেক্ষা করা যায় না। ঢাকের শব্দ যেভাবে এগিয়ে আসছে, আর বেশিক্ষণ লাগবে না তাদের ধরতে।

'প্রাণপণে ছোটো সবাই। কেউ থামবে না।' শহীদ চিৎকার করে বলে।

সবাই ছুটছে। খুব কাছে এসে পড়েছে ঢাকের শব্দ। হৈ-হল্লা আর পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, কম হলেও হাজার দু'য়েক লোক হবে ওরা।

ওই তো নদীর ঘাট দেখা যায়। হ্যাঁ, এসে পড়েছে তারা। পিছনে জংলীরাও প্রায় এসে পড়েছে। ঢাকের শব্দে আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। ইসলাম খাঁ প্রাণপণে চিৎকার করছেন, 'থামো, থামো আমাকে ফেলে রেখে যাও। বড় কষ্ট পাচ্ছি...'

কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সমানে দৌড়ে চলেছে। কামাল সবচাইতে আগে আগে চলছে।

শহীদের মনে মনে একটা ভয় ছিলো। কালকের সাইক্লোনে যদি লঞ্চ ভেসে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সর্বনাশ হবে। নদীর ঘাটে পৌঁছে দেখা গেল মোটা গাছের সাথে বাঁধা লঞ্চ ঠিক তেমনিই রয়েছে।

লাফিয়ে সবাই লঞ্চে উঠলো। জংলীরা এসে পড়েছে, কিন্তু আর ভয় নেই। জলে কেউ নামতে সাহস পাবে না। কামাল গাছের সাথে বাঁধা দড়িটা খুলে লঞ্চে উঠেই স্টার্ট দিলো।

ঘাট থেকে বেশ অনেকটা দূরে লঞ্চ সরিয়ে সবাই একটা হাঁফ ছাড়লো। অদ্ভুত একটা স্বস্তি। কিন্তু একটা কথা একসাথে সবার মনে পড়লো। কুয়াশা? কুয়াশা কই?

কামাল নোঙর ফেলে দিলো। কুয়াশা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দি দিড়িম্, দি দিড়িম্ ঢাক বাজছে। ওরা একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

ঠিক এমন সময় ভীষণ বেগে নদীর ঘাটের দিকে ছুটে আসছে কে? কুয়াশা না? সেই তো! মহুয়া চিৎকার করে উঠলো, 'দাদা!'

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো সে। পাড়ে এসেই থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। পিছনে চেয়ে দেখলো পঁচিশ গজ দূরেই দেখা যাচ্ছে অর্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণ মূর্তি। এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে এই দিকে। আর চিন্তা করবারও সময় নেই। সেই অবস্থায় লঞ্চ ঘাটে আসতে পারে না।

তরতর করে একটা মস্তবড় গাছে উঠে গেল কুয়াশা। জংলীরা এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ে। ওরা দেখলো শহীদদের ধরা অসম্ভব। কিন্তু কুয়াশাকে তারা দেখেছে। সে পালিয়ে যাবে কোথায়? মহুয়া অস্থির হয়ে উঠলো।

দু'-তিনজন লোক গাছের তলায় ঢাল রেখে কেবল বর্শাটা হাতে নিয়ে গাছে উঠে আসতে লাগলো। বেশ অনেকদূর এসেছে এমন সময় গাছের ওপর থেকে গুলি করলো কুয়াশা। প্রথম জন গুলি খেয়ে চিৎকার করে গাছ থেকে পড়ে গেল। দ্বিতীয় জন একটু থমকে থেকে আবার ওঠা শুরু করলো। আবার গুলি করে কুয়াশা। সেও পড়লো মাটিতে।

শহীদ ভাবছে ওরা বুঝি ভয় পেয়ে গাছে ওঠা বন্ধ করবে। কিন্তু না, আরও অনেক লোক গাছের নিচে ঢাল রেখে উঠে আসতে লাগলো। ক্ষেপে গেছে ওরা। কুয়াশাকে তাদের চাই-ই। ধর্ম ছাড়া আর কিছুকে ভয় পায় না ওরা।

কুয়াশা গুলি করে চলেছে। হঠাৎ রাইফেলটা ক্লিক্ করলো। গুলি বেরোলো না। ফুরিয়ে গেছে গুলি। পকেট হাতড়ায় সে। না, নেই আর।

রাইফেলটা ছুঁড়ে মারে সে একজনের মাথায়।

কিন্তু তারপর? এবার উপায় কি? উঠে আসছে হিংস্র জংলীরা একজনের পর একজন। রাইফেল তুলে নিলো শহীদ। একজন পড়ে গেল গাছ থেকে আর্তনাদ করে। আবার একজন। আবার একজন।

ওরা চেয়ে দেখলো শহীদ গুলি করছে। এবার ওরা লঞ্চের দিকটা গাছ দিয়ে আড়াল করে উঠতে লাগলো।

আর উপায় নেই, গুলি লাগছে না ওদের গায়ে। উঠে আসছে ওরা ক্রমেই।

কুয়াশাও উপরে উঠছে। গাছের মগডালে উঠে গেল কুয়াশা। আর বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

ওকি? লাফিয়ে পড়বে নাকি? কুয়াশা দাঁড়িয়ে উঠে ওপরের ডালটা দোলাচ্ছে। এতদূর লাফিয়ে আসা কি সম্ভব? তবু শেষ চেষ্টা করবে কুয়াশা। খুব জোরে একটা দোলা দিয়ে শূন্যে উঠে গেল সে।

লঞ্চ থেকে হাত পাঁচেক দূরে জলের মধ্যে পড়লো কুয়াশা। পরিষ্কার জল। অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। লঞ্চ থেকে সবাই দেখলো সাত-আটটা মস্ত বড় কুমীর কিলবিল করে উঠলো কুয়াশার আশেপাশে। অনেকখানি জল লাল হয়ে গেল রক্তের রঙে। পিঠে বাঁধা সরোদের চকচকে দিকটা দেখা গেল ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে নিচে। মহুয়া চিৎকার করে উঠলো, 'মাগো!'

ইসলাম খাঁ ওর পরিচয় আগা-গোড়া কিছুই জানেন না। বললেন, 'ব্যাটা আহাম্মক একটা। কে লোকটা, ড্রাইভার না?'

কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

কুয়াশা ৩

এক

গাঢ় হয়ে এসেছে বর্ষার সন্ধ্যা। বাইরে ঝমঝম অবিরাম বৃষ্টি, আর সেই সাথে প্রচণ্ড ঝড়। মাঝে মাঝে কাঁচের শার্শি দিয়ে বিদ্যুতের তীব্র ঝলসানি ঘরের সবাইকে সচকিত করে দিচ্ছে, পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে দূরে কোথাও। হু হু করে দমকা হাওয়া ছুটে এসে জানালার কবাট ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ভিতরে আসবার জন্যে চেষ্টা করছে যেন ভয়ঙ্কর প্রেতলোকের কোনও অতৃপ্ত আত্মা। মহা তাণ্ডবলীলা চলছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে।

শহীদের ছোটো একতলা বাড়ির ড্রইংরুমে মুখোমুখি বসে শহীদ, কামাল আর মহুয়া গল্প করছে। কামালের কি একটা হাসির কথায় কপট রাগ করে মহুয়া কামালকে মারতে যাবে—হঠাৎ কি দেখে যেন উঃ···করে আর্তনাদ করে উঠলো ভয়ে। সবাই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলো। আঙুল দিয়ে দরজার দিকে কি একটা দেখিয়ে মহুয়া শুধু বললো 'ভূত'! তারপরই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লো সোফার ওপর। সবাই একসাথে চাইলো দরজার দিকে। একটা ভয়ঙ্কর দর্শন প্রকাণ্ড গরিলা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। শহীদ একবার চোখ কচলালো, স্বপ্ন না সত্যি? আফ্রিকা জঙ্গলের এই ভীষণ হিংস্র জন্তু কি করে এলো তার ঘরে? ঝর ঝর করে তার গা বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরে কার্পেটের ওপর পড়ছে। কিন্তু এক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। শহীদ উঠে দাঁড়াতেই এক পা এগিয়ে এলো গরিলাটা। শহীদের সাথে রিভলভার নেই। শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে সেটা। দমাদম করে দুবার নিজের বুকের ওপর চাপড় বসালো গরিলাটা। যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিলো শহীদ। একটা কাঠের চেয়ার তুলে নিলো ওকে প্রতিরোধ করবার জন্যে।

এমন সময় গফুর এসে ঢুকলো চা নিয়ে। ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত ভয়ঙ্কর গরিলা দেখে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল—হাত থেকে ট্রে-টা মাটিতে পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে কাপ তস্তরী ভেঙে গেল সব। প্রথমে সে পালাবার জন্যে দু'পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু কি ভেবে থেমে পড়লো আবার। তারপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো জন্তুটার ওপর। গরিলাটা এক পা-ও নড়লো না। শুধু বাঁ হাতটা দিয়ে অবলীলাক্রমে গফুরকে ঝেড়ে ফেলে দিলো শরীরের ওপর থেকে। গফুরের প্রকাণ্ড দেহ ছিটকে গিয়ে পড়লো দেয়ালের

গা ঘেঁষে রাখা শো-কেসের কাঁচের ওপর, তারপর সটান মাটিতে।

এবার একলাফে জন্তুটা চলে গেল গফুরের পাশে। কামালও একলাফে সোফা টপকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। শহীদ এগিয়ে গেল কাঠের চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে গরিলাটার দিকে। ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে থেকে বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন ডাকলো জন্তুটাকে, 'গোগী, কাম হিয়ার!'

তারপর পর্দাটা তুলে ঘরে এসে ঢুকলো কালো আলখাল্লা পরা একজন লোক। খোঁড়া লোকটা। দুই বগলে দুটো ক্র্যাচের ওপর ভর করে এগিয়ে এলো লোকটা ঘরের মধ্যে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে জন্তুটাকে আবার বললো—'গেট আউট, গোগী!' নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা থপ্ থপ্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আমাকে চিনতে পারছো না শহীদ?' লোকটা বললো শহীদের দিকে ফিরে!

'কুয়াশা!' কামালের মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল কথাটা।

শহীদও বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ কুয়াশার মুখের দিকে। তারপর বললো, 'তুমি! তুমি বেঁচে আছো!'

যে লোককে আফ্রিকার লিম্পোপো নদীতে ডুবে যেতে দেখেছে এক বছর আগে, যাকে ঘিরে সেই ভয়ঙ্কর নদীর কুমীরগুলোকে কিলবিল করে উঠতে দেখেছে নিজ চোখে, সে বেঁচে আছে কি করে বিশ্বাস করা যায়?

নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো কুয়াশা, 'হ্যাঁ! বেঁচে আছি! এবং আজ দুটো সত্যি কথা শুনিয়ে যাবার জন্যেই আমার আসা। একটা কথা হচ্ছে, তুমি কাপুরুষ এবং দ্বিতীয় কথা, তুমি বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন বেঈমান। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে আমি কি না করেছি। কতো বড় বিপদ মাথায় নিয়ে আফ্রিকা গিয়েছি তোমার পিছন পিছন, নিজের জীবন বিপন্ন করে কতবার তোমার জীবন রক্ষা করেছি। ছি ছি ছি ছি, শহীদ, সেই তুমি আমাকে কুমীরের মুখে ফেলে পালিয়ে এলে লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে! বিষাক্ত ওষুধ ছড়িয়ে কুমীরের হাত থেকে জীবনটা রক্ষা করতে পেরেছি, কিন্তু পা-টা রক্ষা করতে পারিনি। কাটা পা নিয়ে বহু কষ্টে যখন নদীর অপর পারে উঠেছি, তখনও তোমরা আমার চোখের আড়ালে যাওনি। অসহায় আমি চিৎকার করে ডেকেছি তোমাকে, গায়ের জামা খুলে নিয়ে উড়িয়েছি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তুমি বলতে চাও আমায় দেখতে পাওনি, কিংবা আমার ডাক শোননি? আমি হলপ করে বলতে পারি, তুমি দেখেছো আমাকে, কিন্তু জংলীদের ভয়ে এগিয়ে আসতে সাহস পাওনি। একবার লঞ্চ থামিয়েও আবার না দেখতে পাওয়ার ভান করে পালিয়ে গিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছো।'

শহীদ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু সত্যি বলছি বিশ্বাস করো আমাকে…'

'তোমাকে বিশ্বাস করবো আবার?' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে শহীদকে বাধা দিয়ে বললো কুয়াশা, 'আর অভিনয় করবার চেষ্টা করো না শহীদ। ছি, ছি তোমার লজ্জা করে না? আর বেশি কথার প্রয়োজন নেই, মহুয়া বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি চললাম, আর যাওয়ার আগে আরেকবার বলে যাচ্ছি, তুমি কাপুরুষ, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক এবং নেমকহারাম।'

কুয়াশার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরটা গম্ গম্ করতে থাকলো। ক্র্যাচের ওপর ভর দিয়ে একটা পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেল কুয়াশা। বেদনায় শহীদের মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে কুয়াশার পেছন পেছন। কুয়াশা ততক্ষণে চকচকে কালো একটা শেভ্রোলে গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে সশব্দে দরজা বন্ধ করেছে। ছুটে গিয়ে শহীদ বললো, 'আমার একটা কথা শুনে যাবে না?'

'না না। কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! বেঈমান!'

কালো ধোঁয়া ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পেছনের সীটে বসে আছে সেই প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর কুৎসিত গরিলা।

দুই

সেই সন্ধ্যারই আর একটি ঘটনা। ঢাকার শাহবাগ অঞ্চলে বিশিষ্ট এক হোটেলের তেতলায় একখানা ডবলসিটেড কামরা। মিশরের নাম করা নৃত্যশিল্পী জেবা ফারাহ্ এসে এখানে উঠেছে চার পাঁচ দিন হলো। লাহোর, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডিতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে এসেছে এই নর্তকী গত তিন মাস ধরে। টিকেট বিক্রির হার কমে না গিয়ে বরঞ্চ বেড়েই গিয়েছে দিনের পর দিন। নাচের আসরে তার গায়ে কাপড় চোপড়ের বালাই কমই থাকে। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নির্লজ্জভাবে সে নেচে যায় একের পর এক জিপসী ড্যান্স, বেলী ড্যান্স, স্নেক ড্যান্স আরও কতো কি! তার সুন্দর সুঠাম অর্ধনগ্ন দেহ দর্শকদের লোভাতুর করে তোলে। দলে দলে লোক ভিড় করে দাঁড়ায় গেটের কাছে শো ভাঙার পর এই লাস্যময়ী কামিনীকে একবার কাছে থেকে দেখবে বলে। যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জেবাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে তার কর্মকর্তারা কিছুতেই ছাড়তে চায়নি তাকে। প্রতিরাতের জন্য তাকে হাজার টাকা দিয়েও তারা হাজার হাজার টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু কেন যেন জেবা ফারাহ্ কোথাও বেশিদিন থাকেনি। কি এক অজ্ঞাত শঙ্কায় যেন সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে। আজ পাঁচ দিন হলো সে করাচী থেকে ঢাকায় চলে এসেছে। আজ সন্ধ্যায় প্রসাধন সমাপ্ত করে সে যেই রওনা হবে ভাবছে অমনি টেলিফোন এলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে আজকের

অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জেবা। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আপন মনেই হাসলো সে।

ধবধবে সাদা দামী একটা আলখাল্লায় ওর কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা। কাপড়টার সামনের দিকটা আগাগোড়াই চেরা। কটীতে শুধু একটা কালো রেশমী বেল্ট বাঁধা। কোমরের দড়িটা খুলে আলগোছে গা থেকে কাপড়টা ছেড়ে দিলো জেবা। কার্পেটের ওপর আলুথালু হয়ে খসে পড়ে গেল সাদা নাইলনের আলখাল্লাটা। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নায় এবার ফুটে উঠলো এক সুন্দরী নারী দেহের ছায়া। পরনে তার বহুমূল্য সাদা পাথর বসানো কালো বক্ষাবরণ। ঝিকমিক করে উঠলো সেটা ঘরের উজ্জ্বল আলোতে। আর কোমরে জড়ানো জরীর কাজ করা ছোটো একটা মিশরীয় পরিচ্ছেদ। সেটাও কালো। অপলক দৃষ্টিত সে কিছুক্ষণ নিজ তনুশোভা নিজেই উপভোগ করলো। তারপর আবার হেসে উঠলো আপন মনে।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলো জেবার কাফ্রী দেহরক্ষী খোদা বক্স। মিশরীয় ভাষায় বললো, 'কালকের সেই ভদ্রলোক আবার আজ এসেছে। ভিতরে আনবো?'

'নিয়ে এসো।'

ভিতরে এলো একজন ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের যুবক। দামী কাপড় চোপড় দেখে এক নজরেই বোঝা যায় ধনীর দুলাল। অতিমাত্রায় মদাসক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে চোখের কোণে। তার আধ বোঁজা চোখ এবং এলোমেলো পা ফেলা দেখে হেসে ফেললো জেবা। তারপর বললো, 'এসেছো বাবুজী। কথার ঠিক আছে দেখছি। আমার জন্যে কি আনলে দেখি? শুধু টাকায় চলবে না, আজ আমাকে কিছু উপহার দিতে হবে, কাল বলেছি না!'

'এনেছি গো এনেছি, তোমার জন্য উপহার এনেছি, এই যে আমার উত্তপ্ত প্রেমিক হৃদয়, এ হৃদয় তোমাকে উপহার দিলাম।'

'যাও ঠাট্টা করো না। কি এনেছো দেখি?'

যুবক কোটের পকেট থেকে বের করলো হীরে বসানো একটা মহামূল্যবান জড়োয়া সেট। বিস্মিত জেবা এগিয়ে গিয়ে হাতে নিলো হারটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে উল্লসিত হয়ে বললো, 'তুমি মস্ত বড় শেঠ, বাবুজী!'

গর্বের হাসি ফুটে উঠলো যুবকের ঠোঁটে। জেবাকে কাছে টেনে নিয়ে নিজ হাতে পরিয়ে দিলো হারটা তার গলায়। তারপর তার সারা দেহের ওপর একবার লোভাতুর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে গেল। চট করে সরে গিয়ে জেবা বললো, 'ধীরে বাবুজী, ধীরে। দরজাটা খোলা আছে সে খেয়াল নেই বুঝি?'

দরজাটা ভালো করে লক আপ করে উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে একটা হালকা

সবুজ আলো জ্বেলে দিলো জেবা। গুন গুন করে একটা মিশরীয় সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সহজ সচ্ছন্দভাবে আলগোছে একটা বোতল থেকে দুটো গ্লাস ভর্তি করে শ্যাম্পেন ঢেলে নিয়ে বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর রাখলো।

জেবার দুই কাঁধে দু'হাত রাখলো যুবক। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর এক সময় ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'তোমার হাতটা গলা থেকে একটু সরাও বাবুজী, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

কিন্তু হাত দুটো সরলো না। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করলো জেবা, তারপর প্রাণপণে হাত দুটো সরাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই সে হাত দুটো সরলো না—সাঁড়াশীর মতো চেপে বসলো আরও ওর কণ্ঠনালীর ওপর। ধাক্কা দিয়ে যুবককে সরিয়ে দিতে চাইলো জেবা, কিন্তু নড়াতে পারলো না। হাতের ধাক্কায় একজোড়া গোঁফ খসে পড়লো যুবকের ঠোঁটের ওপর থেকে। মুহূর্তে চিনতে পারলো সে। শিউরে উঠে বহু কষ্টে উচ্চারণ করলো জেবা—

'নেসার আহমেদ!'

'চিনতে পেরেছো তাহলে সুন্দরী!'

ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখে দেখতে পেলো জেবা যুবকের ঠোঁটে একটা তীক্ষ্ণ বক্র হাসি।

ক্রমে নিঃসাড় হয়ে গেল জেবার নগ্ন দেহ।

তিন

পরদিন সকাল আটটার দিকে শহীদের ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন মি. সিম্পসন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এই ভদ্রলোক সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। সরকারী বৃত্তি পেয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তিন বছর বিশেষ শিক্ষা কোর্স কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করে সম্প্রতি মাসখানেক হলো ঢাকায় ফিরেছেন।

তীক্ষ্ণ প্রতিভাবান এই ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। লম্বা দোহারা গড়ন—মাথায় কাঁচা পাকা চুল। শহীদকে ইনি অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং সেই সাথে করেন সমীহ। প্রায়ই তিনি জটিল কেস নিয়ে আসেন শহীদের সাথে আলাপ করতে। বিদেশ যাওয়ার আগে শহীদের সাথে কয়েকটা কেস নিয়ে তিনি একসঙ্গে কাজ করেছেন, সেই থেকেই পরিচয় এবং বন্ধুত্ব।

মহা সমাদরে মি. সিম্পসনকে বসতে বললো শহীদ। কিন্তু তিনি না বসে

বললেন, 'শহীদ, তোমাকে আমার সাথে একটু যেতে হবে শাহবাগে। ওখানে একটা অদ্ভুত খুন হয়েছে–Very interesting. আমি সেই spot থেকে সোজা তোমার এখানে চলে এসেছি–এক্ষুণি রেডি হয়ে নাও।'

'আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি।'

পাঁচ মিনিটে শহীদ বেরিয়ে এলো প্রস্তুত হয়ে। ড্রইংরুমে ফিরে এসেই দেখলো মি. সিম্পসন কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন নিরীক্ষণ করছেন। ঘাড় ফিরিয়ে শহীদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে তোমার ঘরে কোনো বানর জাতীয় জন্তু এসেছিল?'

'না তো! কেন?'

'নিশ্চয়ই এসেছিল। কারো সাথে এই ঘরে তার ধস্তাধস্তিও হয়েছে। এই দেখ তার গায়ের লোম,' একটা সাদা রুমালের ওপর সযত্নে কুড়িয়ে তোলা কিছু লোম দেখালেন মি. সিম্পসন।

'ও আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরের লোম।' শহীদ হেসে বললো।

'অসম্ভব। বাইরে এসে দ্যাখো। এই পায়ের ছাপ কি তুমি কুকুরের বলতে চাও?' বারান্দায় বেরিয়ে শহীদ দেখলো কাদামাখা অনেকগুলো থ্যাবড়া পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে তার বারান্দার ওপর।

'তাই তো, strange!'

'কেবল তাই নয়, সেই জন্তুটার সাথে একজন খোঁড়া লোকও এসেছিল এই ঘরে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তারা এসেছিল গাড়িতে চড়ে। এবং এই একই পায়ের চিহ্ন পাবে তুমি শাহবাগের হোটেলে। চলো, let us start.'

পথে যেতে যেতে ঘটনার বিবরণ ভেঙে বললেন মি. সিম্পসন। জেবা ফারাহ্ নাম্নী এক মিশরীয় নৃত্যশিল্পীকে কে যেন তার কামরায় গলা টিপে হত্যা করে গেছে গত রাতে। হোটেল কর্তৃপক্ষের টেলিফোন পেয়ে কাল রাতেই পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে–এবং বিছানার ওপর জেবার সম্পূর্ণ নগ্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে।

খোদা বক্স জানায় যে রাত আটটার দিকে একজন লোক জেবার কক্ষে প্রবেশ করে জেবার অনুমতিক্রমেই। তারপর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ যারা এই ঘরে ঢোকে ঘন্টাখানেক পরই তারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু রাত এগারোটা বেজে গেলেও যখন সেই লোকটা বেরোলো না, তখন সে দরজায় করাঘাত করে। ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। বারবার করাঘাত করেও যখন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন সে নিচে গিয়ে রিসেপশন রুম থেকে জেবার কামরায় বারবার

টেলিফোন করে।

'ঘরে মৃতদেহ ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি?' শহীদ জিজ্ঞেস করলো।

'না। তবে কতগুলো অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। এবং তাতে ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বলতে বলতে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল।

পুলিস প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে কামরার সামনে। মিঃ সিম্পসনকে দেখেই সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দিলো। সাদা কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহটার ওপর একবার দূর থেকে চোখ বুলিয়েই শহীদ চলে গেল ঘরের পেছন দিককার ব্যালকনিতে। দেখলো, তার বাড়ির বারান্দায় যে দুটো পায়ের ছাপ মি. সিম্পসন তাকে দেখিয়েছেন ঠিক সেই চিহ্ন। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল শহীদের, ব্যাপার কি! এ তো কুয়াশা এবং তার গরিলার পদচিহ্ন! তবে কি কুয়াশাই এই কাজ করলো?

খোদা বক্সকে ডেকে পাঠালো শহীদ। সেলাম জানিয়ে এসে দাঁড়ালো নিকষ কালো জোয়ান কাফ্রী খোদা বক্স। ক্ষণে ক্ষণে জলে ভিজে উঠেছে চোখ দুটো, বারবার রুমাল দিয়ে মুছে মুছে লাল করে ফেলেছে। ওকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে শহীদ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কতদিন ধরে তুমি মিস জেবার কাছে কাজ নিয়েছো?'

'পাঁচ বছর।'

'কাল যে লোকটা এই কামরায় ঢুকেছিল, তার সাথে কোনও জন্তু জানোয়ার ছিলো?'

'জ্বী না।'

'লোকটার একটা পা কি খোঁড়া ছিলো?'

'জ্বী না।'

'তার হাতে কোনও লাঠি ছিলো! পরনে কালো আলখাল্লা ছিলো?'

'না। খয়েরী রঙের দামী স্যুট ছিলো পরনে। হাতে কোনও লাঠি–সোঁটা ছিলো না।'

ভ্রূ কুঁচকে বাইরের দিকে চেয়ে শহীদ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'পুলিশ যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে তখনও কি ঘরটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিলো?'

'জ্বী হাঁ।'

'আচ্ছা তুমি যাও।'

খোদা বক্স চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু মি. সিম্পসন ওকে ডাকলেন। বললেন, 'খোদা

বক্স এদিকে এসো। কাল যে লোকটা এখানে এসেছিল তার চেহারাটা আমি বানিয়ে দিচ্ছি, আমার ভুল তুমি শুধরে দিবে বুঝলে?'

একটা ছোটো বাক্স খুললেন মি. সিম্পসন। তার মধ্যে থরে থরে সাজানো প্লাস্টিকের নাক, কান, চোখ, ভুরু, গোঁফ, চুল বিভিন্ন রকমের। তার থেকে কয়েকটা জোড়া দিয়ে মোটামুটি একটা মানুষের মুখ তৈরি করলেন এক মিনিটের মধ্যেই। প্রায় শেষ হয়ে আসতেই খোদা বক্স বললো,- 'মোচ জোড়া আরও বড় ছিলো।'

'এই রকম?' আরেকটা টুকরো লাগালেন মি. সিম্পসন।

'অনেকটা হয়েছে, কিন্তু আগাটা ওপর দিকে তোলা ছিলো।'

'এই রকম?'

'হ্যাঁ। আর মাথার চুলটা উল্টোদিকে আঁচড়ানো ছিলো। সিঁথি ছিলো না।'

'এই রকম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক।'

এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মানুষের মুখ তৈরি হয়ে গেল। খোদা বক্সই বলে দিলো কোন অংশটা কেমন ছিলো। কিন্তু মূর্তিটা যখন তৈরি হয়ে গেল তখন ও পরম আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, 'হুজুর, আজব কাণ্ড, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই লোকটাই কাল রাতে এসেছিল!'

মি. সিম্পসন তাঁর ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গান ফিট করা লাইকা ক্যামেরা দিয়ে মূর্তিটার দুটো স্ন্যাপ নিয়ে আবার মূর্তিটাকে খুলে বাক্সে ভরে ফেললেন। তারপর শহীদকে বললেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এনেছি এটা। এই বাক্সটাকে কি বলে জানো? একে বলে...

'Identi-kit.'

'বুদ্ধিমান ছেলে! তুমি জানলে কি করে?' আবাক হলো মি. সিম্পসন।

'আমেরিকায় ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের আবিষ্কার তো? পাশ্চাত্যের সমস্ত পুলিস মহলে একটা যুগান্তর এনে ফেললো এই নতুন আবিষ্কার, তার খবর রাখা এমন কি আর আশ্চর্যের হলো?'

'এই লোকটার চেহারা পেলাম, এর আঙ্গুলের এবং পায়ের ছাপও পেয়েছি। এবার চলো। এখানে আর আমাদের কোনো কাজ নেই। প্রব্লেম হচ্ছে,দরজা বন্ধ অবস্থায় চারজন ছিলো এ ঘরে। একজন মৃত। বাকি তিনজন গেল কোথায়...'

'আমি মৃতদেহটা একবার দেখবো।' শহীদ বাধা দিয়ে বললো।

'ওতে দেখার কিছু নেই। ছেলেমানুষ শুধু শুধু লজ্জা পাবে। দেহটা সম্পূর্ণ নগ্ন।'

উত্তর না দিয়ে শহীদ এগিয়ে গেল বিছানাটার দিকে। মি. সিম্পসন নিজের কাঁধটা

একটা বিশেষ বিদেশী কায়দায় ঝাঁকিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে ব্যালকনিতে চলে গেলেন।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো শহীদ। মৃতদেহের ওপর থেকে সাদা কাপড়টা সরিয়ে ফেললো। চোখ দুটো খোলা—এবং তাতে ফুটে রয়েছে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে সে এখনও। আলতোভাবে শহীদ লাশটাকে ডান দিকে পাশ ফিরিয়ে দিলো। ওমনি বিছানার ওপর ছোট্ট একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি পড়লো তার। নিঃশব্দে সেটা তুলে পকেটে ফেললো সে। লাশটার আপাদমস্তকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সেটাকে ঢেকে রেখে ঘরটা একবার পরীক্ষা করে দেখলো শহীদ, তারপর ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। মি. সিম্পসন বললেন, 'এই যে পাম গাছটা দেখছো—ওটা এই বারান্দা থেকে কয় ফিট হবে আন্দাজ করো তো।'

'তা, পনেরো ফিটের কম হবে না।'

'কোনও মানুষের পক্ষে এখান থেকে লাফিয়ে ওখানে যাওয়া বা ওখান থেকে লাফিয়ে এখানে আসা সম্ভব?'

'উঁহুঁ। অসম্ভব।'

'ঠিক মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং বা গরিলা জাতীয় কোনও জন্তুর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই না?' আমার কোনই সন্দেহ নেই যে একজন খোঁড়া লোক এই ধরনের কোনও জন্তুর পিঠে চড়ে এই ঘরে এসেছিল কাল রাতে এবং সেই জন্তুটাই তাকে আবার পিঠে করে নিয়ে অনায়েসে লাফিয়ে গিয়ে ঐ গাছ ধরে নেমে গেছে।

'প্রমাণ?'

'প্রথম প্রমাণ, ঐ গাছটার তলায় তাদের পায়ের চিহ্ন আছে। দ্বিতীয় প্রমাণ, এই ঘরেও তাদের পায়ের চিহ্ন পেয়েছি। আর তৃতীয় প্রমাণ, সদর দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় ঐ গাছটা ছাড়া ঘরে ঢুকবার বা এ ঘর থেকে বেরোবার অন্য কোনও উপায় নেই।'

'গাছের তলায় কি তিনজনেরই পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে?'

'না। রহস্যটা এখানেই। তৃতীয় ব্যক্তিটা যে কি করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল বোঝাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ভোজবাজীর মতো সে অদৃশ্য হয়ে গেছে হাওয়ায়।

আপন মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন মি. সিম্পসন, তা ছাড়া কেনই বা এই নর্তকীকে খুন করা হলো? তৃতীয় ব্যক্তির সাথে খোঁড়া লোকটার কি সম্পর্ক? মনে হচ্ছে এর পেছনে আছে একটা বিরাট দল—বিশেষ কোনও কারণে হয়তো…

শহীদ মাঝপথে বাধা দিয়ে বললো, 'মি. সিম্পসন, আমি এখন বাড়ি ফিরবো, আপনি কি এখানেই থাকবেন?'

'না। আমিও একটু অফিসে যাবো। এই পায়ের চিহ্ন, আঙ্গুলের ছাপ খুনীর

ফটোগ্রাফ সব কিছু আজই ডেভেলপ করে ফেলতে হবে বারোটার মধ্যে। চলো তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই।'

চিন্তিতমুখে শহীদ ফিরে এলো তার ড্রইংরুমে। একটা সোফায় আধ ঘন্টা সে চোখ বন্ধ করে একটার পর একটা সিগারেট পোড়ালো। তারপর তার মুখে মৃদু হাসির চিহ্ন ফুটে উঠলো। চোখ খুলেই গলা ছেড়ে হাঁক দিলো, 'গফুর।'

'ডাকছো দাদামণি?'

'চা নিয়ে আয়—আর তোর কামাল ভাইকে একটু ফোন করে দে এক্ষুণি যেন চলে আসে এখানে। যা, তাড়াতাড়ি কর্।'

চার

ঢাকার ইন্দ্রপুরীতে একটা বহুকালের জীর্ণ দুইতলা জমিদার বাড়িতে দুর্ধর্ষ দস্যু নেসার আহমেদ গুপ্ত আস্তানা গড়েছে বছর পাঁচেক হলো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব শহরেই এর একটা করে আড্ডা আছে। কয়েক বছর ধরে এই দস্যুর পেছনে আঠার মতো লেগে থেকেও একে ধরতে পারেনি পুলিস আজও। তিন তিন বার পুলিস প্রায় ধরেই ফেলেছিল ওকে, কিন্তু প্রতিবারেই সে অভাবিত কৌশলে পিছলে বেরিয়ে গেছে; ধরা পড়েনি।

সেদিনও সারা আকাশ জুড়ে মেঘভার। বৃষ্টিটা ছাড়ছে না কিছুতেই। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না একবারও। মাঝে মাঝে আকাশটা পরিষ্কার হয় একটু, অল্পক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামে। তারপর আবার কালো হয়ে আসে আকাশ, ঝর ঝর করে আবার আরম্ভ হয় সেই এক ঘেয়ে অক্লান্ত বরিষণ।

নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো নেসার আহমেদ। পরনে ওয়াটার-প্রুফ। আর পায়ে গাম-বুট। হাতে সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি একটা দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা। দোতলায় একফালি লম্বা বারান্দা হারিকেনের মৃদু আলোয় আলোকিত। কুৎসিত দর্শন একজন প্রহরী সালাম ঠুকে সরে দাঁড়ালো। কোনও প্রত্যুত্তর না করে নেসার আহমেদ ডানধারের একটা ঘরে মৃদু করাঘাত করলো। একজন সুদর্শনা ভৃত্যাশ্রেণীয় যুবতী দরজা খুলে দিলো। অত্যন্ত সুসজ্জিত এই কক্ষে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। ওয়াটার-প্রুফ ও গাম-বুট খুলে দিলো যুবতী। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো নেসার আহমেদ, তারপর বললো, 'মোতিয়া, কোরবান আলী ফিরেছে?'

'জ্বী।'

'ডেকে নিয়ে আয় এ ঘরে।'

একটা ভেজানো দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল মোতিয়া। অল্পক্ষণ পরেই ঘরে এসে ঢুকলো কোরবান আলী। সেলাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। কিছুক্ষণ নিরিষ্টচিত্তে চুরুট টানবার পর নেসার আহমেদ বললো, 'বিছানার ওপর থেকে কাগজটা নিয়ে এসো।'

'হুজুর, এ তো আপনার ছবি!' আশ্চর্য হয়ে কোরবান আলী পত্রিকাটা তুলে নিলো বিছানার ওপর থেকে। সান্ধ্য পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি বেরিয়েছে নেসার আহমেদের। নেসার বললো, 'এবং ছবিটির নিচে লেখা আছে এই লোকটি একজন খুনী আসামী। যে একে ধরে দিতে পারবে, অথবা এর সম্পর্কে পুলিশে খবর দিতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।'

'কিন্তু আপনার ছবি পেলো কোথায় ওরা?'

'সে কথাই তো ভাবছি। যাক্, এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। কালই আমার ভোল সম্পূর্ণ পালটে যাবে। পুলিশের কেউ আমার টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আমার চিন্তা হচ্ছে সেই ল্যাংড়া লোকটাকে নিয়ে। দুই দুই বার আমার সাথে ওর টক্কর লেগেছে এই একমাসের মধ্যে এবং প্রতিবারই ছলে বলে কৌশলে সে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। অদ্ভুত ধূর্ত এবং কৌশলী এই লোকটা। একে শায়েস্তা করা এখন আমার প্রথম কাজ।'

'আমাদের একজন লোককে লাগিয়ে রেখেছি ওর পেছনে হুজুর। ছায়ার মতো সে অনুসরণ করছে তাকে।'

'কার কথা বলছো, শুক্কুর? সে এখন হাসপাতালে, বাঁচে কি মরে ঠিক নেই। ধানমণ্ডি লেকের ধারে ঝোপের পাশে কাল সারারাত পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। ভোরে লোকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, ল্যাংড়া লোকটাই ওর এ অবস্থা করেছে।'

'কাল থেকেই অন্য লোক লাগিয়ে দেবো হুজুর।'

'তা দিও। কেবল ওর আস্তানাটা বের করতে পারলেই বাকি কাজ শেষ করতে সময় লাগেবে না। মনে রেখো, যে তিনটে কাজ হাতে নিয়ে আমরা ঢাকায় এসেছি, তার প্রথমটা সমাপ্ত হয়েছে। বাকি দুটোও অল্পদিনেই হয়ে যাবে। এখন চতুর্থ কাজ হচ্ছে এই ল্যাংড়াকে শায়েস্তা করে মিশরের দিকে রওনা হওয়া।'

'মিশরে কেন?'

'পরে জানতে পারবে। এখন আজকের রাতের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।'

ধানমণ্ডি লেকের ধারে প্রতিদিন বিকেল বেলায় দুটি যুবক যুবতী এসে বসে, হাত

ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পুল পর্যন্ত চলে যায়—তারপর সন্ধ্যার আগেই মেয়েটি ফিরে যায় বাড়িতে। অত্যন্ত দামি পোশাক পরিচ্ছদ মেয়েটির পরনে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বোঝা যায় স্পষ্ট। ছেলেটি সাদাসিধে পাঞ্জাবী পাজামা পরে আসে। গল্পে হাসিতে বিভোর হয়ে যায় ওরা। আশেপাশে আর কেউ থাকতে পারে, এবং তাদের চালচলন লক্ষ্য করতে পারে, সে খেয়ালই যেন নেই ওদের।

কিন্তু কিছুদিন ধরে একজন খোঁড়া লোকের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে পারেনি ওরা। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রোজই মস্ত একটা কালো গাড়িতে করে আসে ক্র্যাচের ওপরে ভর দিয়ে। দামি নীল স্যুট পরিহিত এই ভদ্রলোক ওরা যেখানটায় বসে তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে লেকের পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখে। ওরা তার দিকে চাইলেই মিষ্টি করে হেসে মাথাটা একটু নত করে, তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে থাকে গোধূলি আকাশের সব রঙ মুছে না যাওয়া পর্যন্ত।

কদিন ধরে মেয়েটি আর আসে না। ছেলেটি রোজ অপেক্ষা করে ওর জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর সাঁঝের মতোই আঁধার হয়ে আসে যুবকের মুখ, উঠে চলে যায় সে।

সেদিনও বিকেল বেলা একা বসে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে যুবক, এমন সময় চমকে উঠলো ঘাড়ের ওপর কার মৃদু স্পর্শে। চেয়ে দেখলো পাশে এসে বসেছে সেই প্রকাণ্ডদেহী খোঁড়া লোকটা। কোনও ভূমিকা না করেই বললো সে লোক, 'কি হয়েছে কলিম, তোমার বান্ধবী আসে না কেন?'

প্রথমে অপরিচিত লোকের মুখে নিজের নাম শুনে বিস্মিত হলো যুবক, তারপর ভাবলো ওর হৃদয়ের গভীরতম বেদনার কথা হঠাৎ একজন অপরিচিতের কাছে বলবেই বা কেন সে? কিন্তু ভদ্রলোকের সাহনুভূতিশীল মুখের দিকে চেয়ে কলিমের উগ্রভাবটা মুহূর্তেই কোমল হয়ে এলো, এই লোকের কাছে মনের সব কথা বলা যায়। কোনো ভূমিকা না করে সহজ ভাবেই সে বললো, 'ওর বাবা আসতে বারণ করে দিয়েছেন।'

'কেন?'

'আমি যে চাষার ছেলে।'

'তুমি যে একজন কৃতী ছাত্র, এবার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে পাস করেছো, সে খবর নিশ্চয়ই ওর বাবা জানে না?'

'জানেন। আমার বাবার মুখের ওপর চৌধুরী সাহেব বলে দিয়েছেন, চাষার ছেলের সাথে ওঁর মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।'

'তিনি জানেন না যে এতে তাঁর মেয়ের সম্মতি আছে?'

'জানেন এবং তা শুনে বলেছেন, এমন মেয়েকে নিজ হাতে কুকুরের মতো গুলি করে মারবেন, কিন্তু চাষার ঘরে যেতে দেবেন না।'

'কি ঠিক করলে তুমি?'

'সহ্য করবো,' করুণ হয়ে আসে যুবকের মুখ।

'ছি, ছি। এ কি বলছো? এ অন্যায় সহ্য করে নেবে? রীনা কি বলে?'

'আজ এক টুকরো চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, আব্বাজানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সেটা আমাদের কারো পক্ষেই মঙ্গলকর হবে না। তুমি তো জানোই কেমন ভয়ঙ্কর একরোখা মানুষ উনি। কথার নড়চড় হয় না কখনও। আমার যা হবার তা হবেই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো,' গলাটা ভেঙে আসে যুবকের।

কলিমের দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিলো খোঁড়া লোকটা, তারপর চোখে চোখ রেখে ধীরে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'একটা কথা মনে রেখো কলিম, তুমি পুরুষ মানুষ। ভেঙে পড়া তোমার সাজে না। কাম্য বস্তু আদায় করে নেয়াই তোমার ধর্ম। ভদ্রভাবে না পারো, ছিনিয়ে নেবে।'

উঠে গেল খোঁড়া লোকটা ক্র্যাচের ওপর ভর করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল মূর্তিটা দূরের অন্ধকারে। আর কলিমের কানের মধ্যে মগজের ভেতর কে যেন উচ্চারণ করে চললো, 'মনে রেখো, তুমি পুরুষ মানুষ। ভদ্রভাবে না পারো, 'ছিনিয়ে নেবে!' 'ছিনিয়ে নেবে!'

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো যুবক।

শহীদ আর কামালকে ঢুকতে দেখেই মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

'এসো, এসো। তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। বসো। কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করার জন্যে তোমাকে ডেকেছি শহীদ।'

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি।'—বসতে বসতে বললো শহীদ, জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলো মি. সিম্পসনের দিকে।

এক মিনিট চুপ করে থেকে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলেন মি. সিম্পসন। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে টেবিলের ওপর রেখে ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, 'করাচী পুলিস জানিয়েছে, আমি যে আঙ্গুলের ছাপ এবং ছবি পাঠিয়েছিলাম সেগুলো নেসার আহমেদ নামে এক ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ দস্যুর। বাড়ি ওর পাঞ্জাবে। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানে বছর সাতেক হলো সে একটার পর একটা ডাকাতি এবং খুন খারাবী করে চলেছে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাকে ধরা যাচ্ছে না। সুসংবদ্ধ একটা দল গঠন করে সে এখন পশ্চিম পাকিস্তানের ধনীত্রাস দস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া নারীঘটিত বহু কুকীর্তির সাথেও সে জড়িত। আরও লিখেছে গোঁফ জোড়া নকল, তাছাড়া আর

সবই তার চেহারার সাথে মিলছে। একটা স্পেশাল নোটে করাচী পুলিশ সুপার আমাকে লিখেছেন, 'সাবধান, যে কাজে হাত দিয়েছো সেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।'

'বেশ। এতে বোঝা গেল নেসার আহমেদের দস্যু দল এখন ঢাকার বুকে তাদের আস্তানা গেড়েছে।'

'হ্যাঁ। আরও বোঝা গেল নর্তকী জেবা ফারাহের হত্যাকারী নেসার আহমেদই। কেবল তাই নয় সেদিনকার সেই বন্দুকের দোকান লুট এবং জুয়েলারীর দোকানে ডাকাতিও ওরই দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।'

'খোঁড়া লোকটা এবং তার সাথে একটা জন্তু তাহলে নেসারেরই দলের লোক?'

'উঁহুঁ। গোলমালটা এখানেই, জুওলজিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখিয়েছি জন্তুটা একটা গরিলা। আফ্রিকার এই ভয়ঙ্কর জন্তু পোষ মানে না কখনও। কিন্তু এ একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম! যাক গে, সে ব্যাপার নিয়ে জুওলজিস্টরা মাথা ঘামাক গিয়ে। আমি মনে করেছিলাম খোঁড়া লোকটা নেসারের অনুচর, কারণ জেবার গলায় নেসারের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেলেও সে ঘরে গরিলার পায়ের ছাপও রয়েছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এরা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটো দল। সেদিন জুয়েলারীতে ডাকাতি করে এক রতি সোনাও নেসার নিয়ে যেতে পারেনি। 'কুয়াশা', নামে সেই অদ্ভুত ধূর্ত এবং কৌশলী খোঁড়া লোকটা ছিনিয়ে নিয়েছে সব কিছু।'

'বুঝলাম, দুটো দল আছে—কিন্তু কোন্ পথে এগোবেন ঠিক করেছেন কিছু?'

'আমি কোনও রাস্তাই পাচ্ছি না শহীদ। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। তুমি কি ভাবলে এ কয়দিন?'

'আমি অনেক দূর পর্যন্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি মি. সিম্পসন। নেসার আহমেদের আস্তানা বের করে ফেলেছি।'

'কি বললে?'

'হ্যাঁ। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্গের মতো করে ফেলেছে সে তার আস্তানাকে। আমি ভিতরে গিয়ে সব দেখে এসেছি।'

'এক্ষুণি চলো। দরকার মনে করলে আমরা মিলিটারী রেজিমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করবো।'

'ধীরে, মি. সিম্পসন ধীরে। তাড়াহুড়োর কি আছে? রেজিমেন্ট নিয়ে গেলে ওখানে কাউকে পাবেন না। গুপ্ত পথে সবাই সরে পড়বে। ওদের ধরবার একটা চমৎকার প্ল্যান ঠিক করেছি। কিন্তু তার আগে...'

'কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকলো একজন লোক। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মাথার চুল কাঁচাপাকা, দামী বিলিতি কাটের স্যুট পরনে। ঢুকেই বললো,

'মাফ করবেন, মি. সিম্পসন। অনুমতির অপেক্ষা না করেই অনধিকার প্রবেশ করলাম।'

সিম্পসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে মি. চৌধুরী যে! হঠাৎ? ব্যাপার কি? বসুন।'

'এইমাত্র আমি শহীদ খানের বাড়ি থেকে আসছি। ওখানে জানতে পেলাম উনি আপনার অফিসে আছেন। ইনিই কি…'

'জ্বী, হ্যাঁ। আমারই নাম শহীদ খান।'

'একটা বিপদে পড়ে আপনার ওখানে গিয়েছিলাম, মি. শহীদ। আমার নাম আনিস চৌধুরী। আমি…'

'ব্যাস। আর পরিচয় দরকার হবে না। এখন বলুন তো এমন হন্তদন্ত হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'দেখুন, কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটা খুলে বলতে চাই আপনাদের, কিন্তু…'

কামালের দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করলেন বিখ্যাত বনেদী জমিদার আনিস চৌধুরী। শহীদ বললো, 'ও হচ্ছে কামাল আহমেদ, আমার বন্ধু এবং সহকর্মী। ওর সামনে আপনি সব কথা বলতে পারেন।'

'সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে খুলে বলছি—একটু ধৈর্য ধরে শুনুন দয়া করে।'

'কাল মাঝরাতে আমার ঘরের মধ্যে কোনও অপরিচিত মানুষের চলাফেরার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চেয়ে দেখলাম ছায়ার মতো কে একজন আমার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালিশের তলায় হাত দিয়ে আমার রিভলভারটা পেলাম না। ভাবছি চিৎকার করে লোক ডাকবো কিনা। এমন সময় মূর্তিটা আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং মৃদুস্বরে বললো, 'খবরদার, কোনও রকম চিৎকারের চেষ্টা করবেন না। আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক এবং তার রিভলভারের নল আপনার দিকেই চেয়ে আছে। এতে সাইলেন্সার লাগানো আছে, নিঃশব্দে আপনাকে পরপারে চলে যেতে হবে একটু নড়াচড়া বা চিৎকার করলে।'

টুঁ শব্দটি না করে বিছানায় পড়ে থাকলাম। মূর্তিটা একটা টর্চ জ্বালিয়ে সারা ঘরের দেয়ালে তন্ন তন্ন করে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন খুঁজলো। ঘরের মধ্যে যে গুপ্ত দেয়াল সিন্দুকটা আছে পরিবারের দু একজন ছাড়া বাইরের আর কারও পক্ষে সেটার অবস্থান জানবার উপায় নেই—আশ্চর্য হয়ে দেখলাম লোকটা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং যেন রোজই ব্যবহার করছে এমনি অভ্যস্ত হাতে আমার স্ত্রীর মস্ত বড় অয়েল পেন্টিং ছবিটা দেয়াল থেকে সরিয়ে সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললো একটা চাবি লাগিয়ে। গতকাল

সকালেই সব টাকা সরিয়ে ফেলেছিলাম আমাদের বাড়ির একটা গুপ্ত কক্ষে। মাত্র হাজার পাঁচেক ছিলো ওখানে তোড়া বাঁধা অবস্থায়। টাকা ক'টা পকেটে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে সিন্দুকের সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলো লোকটা। তারপর বিছানার পাশে এসে বললো, 'কই চাবিটা তো দেখছি না! ওটা কোথায়?'

'কিসের চাবি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।'

'ন্যাকামী রাখুন, মি .চৌধুরী। আপনি স্পষ্ট জানেন আমি কোন্ চাবির কথা বলছি। এই বাড়ির গুপ্ত ঘরের চাবিটা ভালোয় ভালোয় বের করে দিন।'

পুরুষানুক্রমে আমরা এই জমিদার বাড়িতে বাস করছি। বাবার মুখে শুনেছি আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ সমস্ত ধনরত্ন নিরাপদে রাখবার জন্যে এ বাড়িতে একটা গুপ্তঘর তৈরি করিয়েছিলেন অতি গোপনে সে কালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কারিগরকে দিয়ে। এবং যেদিন ঘরটা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেদিন সব কজন কারিগরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন তিনি। সেই ঘরের চাবিটা এমন বিচিত্রভাবে তৈরি এবং সেটা খুলবার কায়দা এমন বিশেষ রকমের যে গুপ্তঘরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ রইলো। কেবলমাত্র বংশের বড় ছেলের অধিকার রইলো ঐ চাবিটা পাবার এবং ঘরটা খোলার কৌশল জানবার। অবাক হয়ে গেলাম। এতো রাতে আমার ঘরে ঢুকে অপরিচিত এক লোক ঐ চাবিটা দাবি করছে কেন? বললাম, 'চাবিটা আমার কাছে নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'বংশের বড় ছেলে আপনি। এ চাবি আপনার কাছেই আছে।'

'আমার কাছে ছিলো, কিন্তু সেদিন গোয়ালন্দ থেকে ফেরবার পথে নারায়ণগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাসায় নেমেও ছিলাম কদিন থাকবো বলে, কিন্তু ঢাকা থেকে জরুরী টেলিফোন পেয়ে চলে এসেছি স্যুটকেস ওখানে রেখেই। চাবিটা সেই স্যুটকেসের মধ্যে আছে।'

'আপনার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করলাম না, চৌধুরী সাহেব। কিন্তু তবু আপনাকে একটু ভেবে দেখার সময় দিচ্ছি। আগামী শুক্রবার রাত আটটায় রেসকোর্সের মধ্যেকার কালীমন্দিরে আপনি নিজে গিয়ে সে চাবি দিয়ে আসবেন। যদি অন্যথা হয়, আর যদি পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা করেন তবে মনে রাখবেন আপনার গচ্ছিত সমস্ত ধনরত্নের চাইতে যা আপনি বেশি মূল্যবান মনে করেন—আপনার সেই বংশের ইজ্জত আমি নষ্ট করে দেবো। টর্চের আলোটা নিভে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর আমি বললাম, 'আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

কোনও সাড়াশব্দ নেই। বেড সুইচটা টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দেখলাম ঘরে কেউ নেই।

সবাই চুপ করে আগাগোড়া ঘটনাটা শুনে গেল। মিঃ সিম্পসন বললেন, 'আপনি বংশের ইজ্জতের ভয় করেন না? পুলিসের কাছে এলেন কেন?'

'বংশের ইজ্জতকে আমি সবচাইতে বড় বলে মনে করি, মি. সিম্পসন। আমি ক্ষুদ্র হতে পারি কিন্তু আমার বংশ মস্ত বড়—সেটাকে আমার সব সময় সকলের চেয়ে উপরে স্থান দিতে হবে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে একজন ডাকাতের হুমকিতে যদি ভয়ে আমি জড়সড় হয়ে যাই এবং ধনরত্ন তার হাতে তুলে দিই তবে আমি নিজের কাছে একেবারে ছোটো হয়ে যাবো। কাল সারারাত ধরে ভেবেছি, কি করবো। একবার মনে হয়েছে, চাবিটা দিয়েই দিই—পরক্ষণেই আবার নিজের ভেতর থেকে কে যেন গর্জন করে বলেছে,

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

'ভালই করেছেন, চৌধুরী সাহেব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনার বংশের ইজ্জত কি করে নষ্ট হতে পারে তার কোনো ইঙ্গিত পেয়েছেন কি?'

'সরাসরি কোনো ইঙ্গিত পাইনি। তবে মনে হয় সে আমার একমাত্র কন্যা রীণার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে। এবং সেটাই আমাকে সবচাইতে বেশি অস্থির করে তুলেছে। আমার অবিবাহিতা এই যুবতী কন্যাকে যদি সে কোনও সুযোগে কোনো রকম অপমান করে তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, মি. চৌধুরী। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমরা আপনাকে প্রোটেকশন দেবো।'

শহীদ বললো, 'আপনার ঘরে আমাদের এখনই একবার নিয়ে যেতে হবে, মি. চৌধুরী।'

'নিশ্চয়ই। চলুন, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

সবাই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আনিস চৌধুরী ড্রাইভিং সীটের দরজাটা খুলেই এক লাফে সরে এলেন গাড়ির কাছ থেকে, 'বাপ রে বাপ!'

'কি ব্যাপার, কি হলো?' সবাই অবাক হয়ে এগিয়ে গেল।

সাপ। সীটের ওপর সাপ।

সবাই কাছে গিয়ে দেখলো একটা গোখরা সাপ ফণা তুলে বসে আছে। লক লক করে তার জিভটা এক একবার বেরিয়ে আসছে। লাল সূতা দিয়ে ওটার ফণার কাছে একটা ভাঁজ করা কাগজ বাঁধা। কাগজটা সরিয়ে ফেলতে পারছে না বলে সাপটা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

রিভলভারটা বের করে গুলি করলো শহীদ। বিষধর গোখরার ফণাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে

গেল। ততক্ষণে একজন সেপাই এসে উপস্থিত হয়েছে। লাঠি দিয়ে সে মরা সাপটা বের করে রাস্তায় ফেললো। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে দেখা গেল একটা চিঠি। তাতে লেখাঃ

চৌধুরী সাহেব,

আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা নেই দেখছি। আমি বিষধর গোক্ষুর। আমি করতে পারি না এমন কাজ নেই! আপনি আমার আদেশ অমান্য করে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করতে চলেছেন। এজন্যে আপনার জন্যে সামান্য শাস্তির আয়োজন করছি। দু'এক দিনেই সেটা হাতে-নাতে টের পাবেন। কিন্তু তবু আপনাকে আরেকবার সুযোগ দেবো ভাবছি। এবং সেটাই শেষ সুযোগ। তারপরও যদি আপনি পুলিস বা শহীদ খানের মতো চুনোপুঁটি টিকটিকির সাহায্য গ্রহণ করেন তবে আপনার কন্যার ইজ্জত নষ্ট করতে দ্বিধামাত্র করবো না। এই আমার শেষ কথা।

নেসার

চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে অসহায় দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে একবার চাইলেন চৌধুরী সাহেব। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মনের উদ্বেগ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে-মুখে।

শহীদ তাড়া দিলো, 'কই, চলুন মি. চৌধুরী!'

'ও, হ্যাঁ, এই যে চলুন।'

পাঁচ

রাত দশটার সময় মিঃ চৌধুরীর ড্রইংরূমে দুটো ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে একজন খোঁড়া লোক এসে দাঁড়ালো। তার দীর্ঘ-ছায়া গিয়ে পড়লো মিঃ চৌধুরীর কোলে খুলে রাখা একটা ইংরেজী বই-এর উপর।

'আসুন মি. শহীদ, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।' বলে বইটা বন্ধ করে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন চৌধুরী সাহেব। আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আপনি কে? কি চান?'

'পরিচয় দিচ্ছি। তার আগে বসতে বলুন।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'বসুন।'

'আমাকে দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই, মি. চৌধুরী।'

আমি আপনার গুপ্তকক্ষের চাবি দাবি কারতে আসিনি। কারণ আমি জানি আপনার বাবা সে চাবি আপনাকে দিয়ে যাননি। আমি বোকা নেসার নই। আমাকে দেখে আতঙ্কিত হবেন না; দেখতেই পাচ্ছেন, ল্যাংড়া মানুষ, কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা। আপনার কোনও ক্ষতিই আমি করতে আসিনি। আপনি নিশ্চিত হয়ে আমার বক্তব্য শুনতে পারেন।

'সব খবরই রাখেন দেখছি। যাক, আপনার বক্তব্যটা শুনি?'

'আমার সময় কম। সংক্ষেপে সব কথা সেরে সরে পড়তে চাই। কলিমের সাথে আপনার মেয়ে রীণার বিয়েতে আপনার অমত কেন?'

'তার আগে আমি জানতে পারি কি আপনি প্রশ্ন করবার কে?'

'আমার পরিচয় শুনলে আঁতকে উঠবেন—তাই পরিচয়টা গোপন রাখছি। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। এ বিয়েতে অমত করে ঠিক করেননি।'

'ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতা আমার আছে। চাষার ছেলের সাথে চৌধুরী বংশের মেয়ের বিয়ে হওয়া অসম্ভব। তা সে ছেলে যতোই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হোক না কেন!'

'এ বিয়েতে আপনার বংশের সম্মান কমে যাবে, আর নেসার আহমেদ যদি আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে সম্মান বাড়বে, এই বলতে চান?'

'আমি আপনাকে কিছুই বলতে চাই না, আপনি এখন যেতে পারেন।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো খোঁড়া লোকটা উত্তেজিত হয়ে, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'বংশের ইজ্জত! ছিঃ লজ্জা করে না খোলশ মুখে পরে সমাজে বংশের বড়াই করে বেড়াতে? আপনার কাপুরুষ পিতা বংশের ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন পুরুষত্বহীন। প্রজনন ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। জানতে পারি কি, তবু আপনার জন্ম সম্ভব হয়েছিল কি করে? একজন সাধারণ চাষাভুষো চাকরের ঔরসে নয় কি?'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো!'—চিৎকার করে উঠলেন চৌধুরী সাহেব।

'সত্যি কথা মুখের ওপর বলে যাচ্ছি। আপনার নিজের জন্ম ইতিহাস আপনার অজানা নেই। তবু সমাজের মাথায় বসে মিথ্যা বংশ গরিমার অহমিকায় বেলুনের মতো ফুলে থেকে যদি নিজে সুখী হতে চান আমার আপত্তির কিছুই ছিলো না। কিন্তু দুটি জীবন নষ্ট করে দেবার কোনও অধিকার আপনার নেই।'

'get out! বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।'

'যাচ্ছি। তার আগে আর একটা কথা বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে হতেই হবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। আপনার এই মিথ্যে বংশ গরিমার চাইতে অনেক বড় অনেক মহান

হচ্ছে দুটি তরুণ তরুণীর নিষ্পাপ প্রেম। এই প্রেমকে সফল করতে আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবো প্রয়োজন হলে।'

দুই কান দু'হাতে চেপে ধরলেন চৌধুরী সাহেব। থর থর করে সর্বশরীর কাঁপছে তাঁর। চোখের সামনে দেখলেন দুটো ক্র্যাচের ওপর ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অকুতোভয় খোঁড়া লোকটা।

আবছা চাঁদের আলোয় রাতটা বড় সুন্দর। সেই সাথে দমকা পুবের হাওয়া মস্ত বড় বড় সাদা মেঘের টুকরোগুলোকে অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোন নিরুদ্দেশে। মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে মেঘে পূর্ণিমার চাঁদ। আবার হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠছে। রাত সাড়ে দশটা। এমন সময়, 'কে?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো রীণা।

'আমি, কলিম।'

'তুমি! এতো রাতে এই দোতলার ছাতে এলে কি করে?'

'পাইপ বেয়ে উঠেছি।'

'পাইপ বেয়ে! পড়ে গেলে কি দশা হতো ভেবেছো একবার?'

'এখন আমি মরতে ভয় পাই না রীণা।'

'বুঝলাম মস্ত বীর পুরুষ তুমি। এখন আবার আমাকে নিয়ে ছাতের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইবে না তো?'

'ঠাট্টা নয় রীণা। আমি তোমার শেষ কথা শুনতে এসেছি। চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। দূরে, কোনও দূর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধবো আমরা।'

রীণার একটা কোমল হাত তুলে নেয় কলিম তার হাতে।

'আব্বাজানকে তো তুমি জানো। এরপরেও তুমি এ কথা কি করে বলছো কলিম আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'দয়া করো রীণা! আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া করো। তোমাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। যদি তুমি আমার মৃত্যু কামনা করো, বলো আমি ফিরে যাচ্ছি, আর কখনও আসবো না।'

'ছিঃ! এ কথা বলো না। তুমি কৃতী ছাত্র, বিলেত যাচ্ছো, ফিরে এসে নিশ্চয়ই কোনও সুন্দরীকে বিয়ে করে সুখী হবে তুমি। ততদিনে আমার স্মৃতি মুছে যাবে তোমার মন থেকে। ভুলে যাবে তুমি রীণা চৌধুরী একদিন তোমায় ভালবেসেছিল—সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। এ কয়দিন অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আত্মহত্যা করবার সাহস আমার নেই, পারিনি। এই বন্দীশালার দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে আমি পাগল হয়ে যাবো কলিম!'

'গলাটা ভেঙে এলো রীণার। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়লো কলিমের হাতের ওপর।'

'কেঁদো না লক্ষ্মী! এখনো সময় আছে। চলো এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে আমাদের প্রেমের অপমান হবে রীণা।'

'কিন্তু আমি যে দুর্বল। অবিবাহিতা তরুণীর সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত দ্বন্দ্ব যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছে।'

'আমি কথা দিচ্ছি রীণা, কালই আমাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করে ফেলবো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে, এবং তার আগে পর্যন্ত তোমাকে আমি স্পর্শ করবো না। আমাকে বিশ্বাস করো রীণা।'

'বেশ, প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার ভার তোমার ওপরেই থাকলো। আমি এই সুন্দর চাঁদ আর ঐ মাতাল হাওয়াকে সাক্ষী রেখে তোমার হাতে নিজকে সমর্পণ করলাম।'

পা টিপে টিপে দুজনে এসে দাঁড়ালো বিরাট জমিদার বাড়িটার পেছনের দিককার পাঁচিলের সামনে। ওপারে জংলা মতো একটা মাঠ আছে আবর্জনায় ভর্তি। সেটা পেরোলেই নিরাপদে রাস্তায় এসে পড়তে অসুবিধে হয় না।

ঝুপ করে পাঁচিলের ওপর থেকে দুজনে একসাথে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে। অমনি ভোজবাজীর মতো জনা ছয়েক যণ্ডামার্কা লোক ঘিরে ধরলো ওদের। প্রস্তুত হওয়ার আগেই প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত এসে পড়লো কলিমের নাকের ওপর। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো কলিম। আরও কয়েকটা আঘাত এসে পড়লো ওর মাথায়, ঘাড়ে পিঠে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে।

এদিকে অপর একজন রীণার মুখ চেপে ধরলো একটা রুমাল দিয়ে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধে মাথাটা ঝিমিয়ে এলো রীণার। অল্প কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে অজ্ঞান হয়ে পড়লো সে-ও।

দুজনে পাঁজাকোলা করে রীণার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে একটা গাড়িতে তুললো। দুমিনিটের মধ্যেই আশেপাশে আর কারো চিহ্নমাত্র থাকলো না। কলিম কেবল পড়ে রইলো ঝোপঝাড়ের পাশে অজ্ঞান অবস্থায়।

ছয়

পরদিন একমাথা উস্কোখুস্কো চুল আর শুকনো মুখে চৌধুরী সাহেব এসে উপস্থিত হলেন শহীদের বাসায়।

'আমাকে বাঁচান মি. শহীদ!'

'কি হলো? নতুন কোনও খবর আছে?'

'রীণাকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল রাত থেকে। আজ একটু আগে একটা চিঠি পেলাম। এই দেখুন।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলো শহীদ। তাতে লেখাঃ

মি. চৌধুরী,

যে সামান্য শাস্তির কথা গত চিঠিতে লিখেছিলাম, আজ নিশ্চয়ই তা টের পেয়েছেন। রীণাকে নিয়ে গেলাম।

আজ রাত এগারোটায় চাবিটা নিয়ে রেস কোর্সে আসবেন। সেখানে আমার লোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।

চাবিটা হাতে পেলে রীণাকে অক্ষত অবস্থায় আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেবো। কিন্তু যদি আবার পুলিসের কাছে যান তাহলে আপনার বংশ গৌরব আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। ধর্ষিতা রীণার উলঙ্গ দেহ পড়ে থাকবে রাস্তার ধারে। পত্রিকা মারফত এ খবর পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে প্রতিটি লোকের কানে। আমার কথার নড়চড় হবে না, তার প্রমাণ পেয়েছেন। এই কথারও নড়চড় হবে না। অতএব সাবধান!

নেসার

চিঠিটা পড়ে বিস্মিত শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'এ চিঠিটা পাওয়ার পরও আমার কাছে এসেছেন! ধন্য আপনার সাহস!'

'ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম, তাই আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি মি. শহীদ। এতো সাহস আমার নেই, আমি বড় দুর্বল। সেদিন অতো লোকের মধ্যে কথাটা আপনাকে বলতে পারিনি। যে চাবির জন্যে এতো কিছু, সে চাবি আমার কাছে নেই।'

'নারায়ণগঞ্জে আছে তো…'

'না। সেখানেও নেই। বাবা আমাকে সে চাবি দিয়ে যাননি।'

'আশ্চর্য তো! যাহোক, সে কথা পরিষ্কার করে জানাননি কেন প্রথম রাতেই!'

'জানাতে পারিনি। আত্মসম্মানে লেগেছে। মিথ্যা অহমিকার মোহজালে আবদ্ধ ছিলাম আমি। গত রাত্রে আমার সে ভুল ভেঙেছে। তার আগেই আমি আমার সর্বনাশ করে বসেছি।'

'আপনার বাবা সে চাবি আপনাকে দেননি কেন? তাঁর একমাত্র সন্তান হিসেবে ওটা তো আপনারই পাবার কথা?'

'কেন যে দেননি তা কারো কাছে ভেঙে বলা যাবে না মি. শহীদ। ও প্রশ্ন থাক।'

'তাহলে ব্যাপার দাঁড়ালো এই যে, চাবিটা আপনার কাছে নেই, অথচ সে চাবি আজ রাত এগারোটার মধ্যে আপনি নেসার আহমেদকে না দিলে আপনার মেয়ের সর্বনাশ করবে সে।'

'তাই যদি সে করে তবে আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না মি. শহীদ। যে করে হোক আমাকে বাঁচান আপনি। এই দুশ্চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। রীণাই আমার একমাত্র সন্তান।'

'আপনি উতলা হবেন না চৌধুরী সাহেব। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজই রাত আটটার মধ্যে সদলবলে ধরা পড়বে নেসার আহমেদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আপনাদের এই অভিযানে আমিও যোগ দিতে চাই মি. শহীদ।'

'তাতে আমাদের সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে বেশি। আমরা ছদ্মবেশে আগে ওদের আড্ডায় কয়েকজন ঢুকে পড়বো। ওদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দেয়ার পর পুলিস বাহিনী প্রবেশ করবে ভেতরে। অনেক বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না সেখানে।'

'আমার যেতেই হবে মি. শহীদ। ওদিকে আমার মেয়ের কপালে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানতে না পেরে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় আমি ছটফট করতে করতে হার্টফেলই করবো। হাই ব্লাডপ্রেশার আমার, যে কোনও সময় কোলাপস্ করতে পারি। আপনার কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করবো না আমি। দয়া করে আমাকে সাথে নিন মি. শহীদ।'

'বেশ, যখন এতো করে অনুরোধ করছেন, নেয়া যাবে আপনাকে। আপনি সন্ধ্যার সময় আমার এখানে চলে আসবেন। ছদ্মবেশ পরিয়ে আপনার চেহারা পাল্টে নিতে হবে রওনা হবার আগে।'

'আমি ঠিক সাতটায় পৌঁছবো এখানে।'

অন্ধকার একটা ঘরে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো রীণার। প্রথমে সে মনে করলো নিজের ঘরেই বুঝি শুয়ে আছে। তারপর হঠাৎ কলিমের কথা মনে পড়লো। এবং সাথে সাথে রাতের সমস্ত ঘটনা একসঙ্গে মনে পড়ে যেতেই চমকে উঠলো রীণা। কোথায় সে? উঠে বসতেই একটা নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো, 'ঘুম ভাঙলো?'

অবাক হয়ে চারপাশে চাইলো রীণা। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতেই দেখলো মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি।

'কে তুমি।'

'আমি? আমার পরিচয় নাই বা জানলে। মনে করে নাও আমিও তোমার মতোই একজন হতভাগিনী। ধরে নাও আমার নাম মোতিয়া।'

'মোতিয়া? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে ওরা?'

'যেখানে আমাকেও একদিন এনেছিল এমনি করে বাবা-মা, ভাই-বোন, সমাজ-সংসার থেকে ছিন্ন করে।'

'কেন? আমাকে ধরে আনলো কেন?'

'তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাদের জমিদার বাড়ির গুপ্ত কক্ষের চাবি আদায় করবার জন্যে।'

'চাবি পেলেই আমাকে ছেড়ে দেবে তো?'

'অসম্ভব। এরা যাকে একবার আনে, সে আর সমাজে ফিরে যেতে পারে না বোন! আমিও ভদ্রঘরের ভদ্র-মেয়ে ছিলাম। একদিন এমনি করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে এলো ওরা আমাকে। আজ আমি কলুষিত। কোথাও আমার স্থান নেই আর। প্রতিরাতে ওদের লালসার শিকার হওয়ার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।'

'এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই?'

'না। বিশ ফুট মাটির তলায় এই ঘর। ওপরে ওঠার পথই তুমি পাবে না।'

'এখন রাত কতো?'

'রাত কোথায়? দুপুর দুটো বাজে। আমি যাই, এখনই সর্দার ফিরবে। আমাকে এ ঘরে দেখলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

ত্রস্তপদে সোজা একটা দেয়ালের দিকে চলে গেল মোতিয়া, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে রীণা একবার চোখ কচলালো, স্বপ্ন না সত্যি! উঠে দেয়ালের কাছে গিয়ে দেখলো কোনও দরজা নেই সেখানে। এবার ভয় পেয়ে গেল রীণা, ভূত নয় তো!

এমনি সময় ঘরের মধ্যে এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়লো। রীণা চেয়ে দেখলো অপর একটা দেয়ালে দরজার মতো একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। পাশের ঘর থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে এই ঘরে।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো কোরবান আলী।

'ঘুম ভেঙেছে সুন্দরী? বাহ্, এই তো বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছো।'

দেয়ালটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। খশ্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে একটা মোমবাতি ধরালো কোরবান। তারপর নিঃসঙ্কোচে বিছানার ওপর বসে পড়ে বললো, 'যখনই তোমাকে দেখেছি তখনই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি সুন্দরী। সারারাত কাল ছটফট করেছি, কলিজাটা শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। তাই এলাম। যদি কিছু অধর সুধা পাই তবে এই অধমের প্রাণটা রক্ষা হয়। এদিকে এসো সুন্দরী, কাছে এসো, দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো রীণা। ভয়ে কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ওর। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কোরবান আলী নিজেই উঠে এলো ওর কাছে। ওর হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বললো, 'অবাধ্য হয়ো না সুন্দরী! তাতে কোনও লাভ আছে? স্বেচ্ছায় না আসো তোমাকে কাছে আনবার শক্তি আমার দেহে আছে। এসো।'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো রীণা। বললো, 'খবরদার। আমার গায়ে হাত দেবে না বলছি।'

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! হাসলে মাইরী। আমার ঘরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। গায়ে হাত দেবো না?'

আবার এগিয়ে আসে কোরবান আলী। টেবিলের ওপর থেকে অলক্ষ্যে একটা কাঁচের ফুলদানি তুলে নিলো রীণা। কোরবান কয়েক পা এগোতেই সেটা ছুঁড়ে মারলো ওর মাথায়। কপালে লেগে মাটিতে পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল কাঁচের ফুলদানি। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো কপাল থেকে। প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল কোরবান আলী। তারপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো রীণার ওপর। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে শূন্যে উঠিয়ে ফেললো, তারপর বিছানার পাশে যেতে যেতে এক হাতের কয়েকটা ক্ষিপ্র টানে শাড়িটা খুলে ফেললো রীণার দেহ থেকে। তারপর ঝপাৎ করে ফেললো ওকে বিছানার ওপর। ব্লাউজের বোতাম খোলার চেষ্টা করছে কোরবান আলী। ছটফট করতে থাকলো রীণা ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। কিন্তু অসুরের মতো শক্তিশালী কোরবানের সাথে পারবে কেন সে?

এমনি সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো মোতিয়া। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকলো, 'কোরবান!'

ঠিক স্প্রিং-এর মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কোরবান আলী।

'এক্ষুণি বেরোও ঘর থেকে, নাহলে আমি সর্দারকে ডাকবো।'

তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে একবার মোতিয়ার দিকে চাইলো কোরবান আলী, তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় চাপাস্বরে বলে গেল, 'এর প্রতিশোধ নেবো আমি। প্রস্তুত থেকো।'

বিছানা থেকে উঠে রীণা মাটি থেকে কাপড়টা তুলে পরে নিলো। তারপর বললো, 'তুমি আমাকে বাঁচালে ভাই।'

'তাই মনে হচ্ছে আপাততঃ, কিন্তু রাত দশটার সময় তোমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সর্দারের শয়নকক্ষে দিয়ে আসতে হবে এই আমাকেই। তিনি আগে তোমাকে ধন্য করবেন তারপর তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা।'

চলে গেল মোতিয়া। বিছানার ওপর বসে পড়লো রীণা। বড় অসহায় লাগলো নিজেকে তার। মেয়েমানুষের জীবনটা কী? এই একটু আগেই একজন তার সর্বনাশ করতে বসেছিল, তাকে ঠেকাবার কোনও শক্তি ছিলো না তার। এ বিপদ কেটে গেল ঠিকই। কিন্তু রাতে? এক দস্যুর অঙ্গশায়িনী হতে হবে তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। হঠাৎ কান্না পেলো রীণার। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে ফেললো সে। মনে পড়লো কলিমকে। এই বুঝি তাদের স্বপ্নের সুখের সংসার? কোথায় তুমি কলিম? তোমার কাছে প্রাণ মন সঁপে একসাথে বেরিয়েছিলাম ঘর থেকে। আমাকে একলা এই বিপদে ফেলে কোথায় রইলে তুমি এখন! বাঁচাও আমাকে কলিম! এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাও!

জ্ঞান ফিরে এলো কলিমের ঠিক দুঘন্টা পর। কে যেন তার চোখে মুখে জল ছিটাচ্ছে। উঠে বসতেই চাঁদের আলোয় দেখতে পেলো ধানমণ্ডি লেকের ধারের সেই খোঁড়া ভদ্রলোককে।

'আপনি? আপনি এখানে!'

'রীণা কোথায় কলিম? এলো না? তোমাকে এমন করে মারলেই বা কে? পড়ে গিয়েছিলে?'

এ প্রশ্নে কলিমের ঘোর কেটে গেল। সব কথা মনে পড়তেই একবার চারদিকে চাইলো সে, তারপর সটান উঠে দাঁড়ালো।

'কোথায় চললে?'

'পাঁচিল টপকে দুজন নেমেছিলাম এই মাঠে কিছুক্ষণ আগে। হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করলো। বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম আঘাত খেয়ে। আর কিছু মনে নেই আমার। কিন্তু রীণা? রীণা কোথায় গেল?'

'যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে দেখছি। আমার পৌছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে নেসার তার কাজ হাসিল করে নিয়েছে।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চলো তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। এই মাঠে রীণাকে খুঁজলে পাবে না। তাছাড়া তোমার এখন চিকিৎসার দরকার। তোমার মাথা থেকে এখনও রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। চলো দেরি করো না।'

অদ্ভুত স্নেহশীল এই কণ্ঠ। যেন কতদিনের বন্ধু, এমনি দাবি এর কথায়। তাই উপেক্ষা করা যায় না এর অনুরোধ। খোঁড়া লোকটার পিছন পিছন গিয়ে একটা কালো

গাড়িতে উঠলো কলিম।

ভোর রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল কলিমের। মিষ্টি একটা বাজনার শব্দ এলো কানে। পাশের ঘর থেকে আসছে শব্দটা। নিজের অজান্তেই উঠে পড়লো কলিম বিছানা থেকে। ভৈঁরো রাগে সুগম্ভীর আলাপ করছে কে যেন সরোদে। অপূর্ব সুরমূর্ছনায় অভিভূত হয়ে পড়লো কলিম। এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের ভারী পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে তাকাতেই কিছু একটা দেখে আঁতকে উঠলো কলিম। ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠলো ওর। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা শিরশিরে আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল।...

আবছা আলো অন্ধকারে একটা বাঘের চামড়ার ওপর ধ্যানাসনে বসে সরোদ বাজাচ্ছে খোঁড়া লোকটা—আর তার সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাটিতে বসে আছে বিকট দর্শন প্রকাণ্ড একটা গরিলা।

সন্তর্পণে নিজের বিছানায় ফিরে এলো কলিম।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম এলো না তার চোখে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত মিষ্টি বাজনাটা বেজেই চললো।

সাত

রাত আটটা। নতুন ঢাকার নির্জন মালিবাগ অঞ্চলের ইন্দ্রপুরী এলাকায় যেন লোক চলাচল একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশি বলে মনে হচ্ছে। হরেক রকম লোক বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ পরে যাতায়াত করছে একটা মস্ত পুরোনো জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে।

আর সেই জমিদার বাড়ির অভ্যন্তরে স্বল্পালোকিত একটা মাঝারি আকারের ঘরে চলেছে ফ্লাশের আড্ডা। ঝনাঝন আধুলি পড়ছে বোর্ড ফী; তারপর তাস বাটা হলে আওয়াজ আসছে, 'এক রুপেয়া।'

'পাশ।'

'এক।'

'এক।'

'দো!'

'দো রুপেয়া।'

'পাঁচ!'

'পাশ।'

'বিশ রুপেয়া!'

'লে লো বিশ!'

'শো!'

'ছে সাত আঠ কা রান।'

'ছোড়ো বেটা, ইয়ে লো রানিং ফ্লাশ! হাহাহা...।' আবার ঝনঝন পড়ছে বোঙ।

দলের একজন নতুন স্যাঙাৎ জিতে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় বেশির ভাগ বোর্ডই। সুদর্শন এই নবনিযুক্ত যুবকের পেছনে চেলাচামুণ্ডা জুটে গেছে ইতিমধ্যেই; হৈ হৈ করছে তাকে ঘিরে। এমন ভাগ্যবান সচরাচর মেলে না। ভালো বিলাতি বোতল নিশ্চয়ই মিলবে আজ এর পিছনে থাকলে।

এই নতুন লোকটি আমাদের শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়। মি. সিম্পসন, চৌধুরী সাহেব আর কামালও আছে ছদ্মবেশে এই জুয়োর আড্ডায় অন্য সবার সাথে মিশে।

খোলোয়াড়দের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন অতিরিক্ত চটে গেছে নতুন মক্কেলের উপর। এ কেমন বেয়াদবী? নতুন ঢুকেই পুরোনোদের হারিয়ে দিচ্ছে। কেমন ধারা শরাফতী এটা? সে বলেই বসলো, 'বহোত চালু মালুম হোতে হো ভাইয়া। যারা সৌচ সামাঝকে চ্যলন।'

নতুন স্যাঙাৎ খাশ ঢাকাই ভাষায় বললো, 'আরে চুপ কইরা থাক। তেরীবেরী করিছ্ না। হারবার আইছত্ হাইরা বাইত্ যাগা।'

রাগে গজ গজ করে পরাজিত জুয়াড়ীরা। কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকজন এসে যোগ দিলো খেলায়। বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের বোতলের টুংটাং শব্দের সাথে মাতাল জুয়াড়ীদের মত্ত কোলাহল একটা নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ঘরটায়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে 'ম'কার 'ব'কার এবং 'শ'কার তুলে অশ্লীল মন্তব্য এবং গালাগালি চলেছে। ভদ্রতা সৌজন্যের প্রশ্ন এখানে বাতুলতা মাত্র।

এ সময় মোতিয়া ঢুকলো ঘরে। হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। কেউ বললো, 'আও মেরী জান! কেউবা—জানে জিগার, আও ইধার পেয়ারী।'

কারও কথায় কর্ণপাত না করে গম্ভীরভাবে মোতিয়া বললো, 'সর্দার মেহমানদের ওপরে তলব করেছেন।'

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথেই কয়েকজন লোক বাঘের মতন লাফিয়ে পড়লো শহীদ, কামাল, সিম্পসন আর চৌধুরী সাহেবের ওপর। প্রস্তুত হবার জন্যে এক মুহূর্ত সময় পেলো না ওরা। শহীদ প্রথম আক্রমণকারীর প্রায় নাকের ওপর একটা ঘুষি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু পেছন থেকে অপর একজন সাপটে ধরে ফেললো ওকে এবং এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিলো। বাকি দুজন এগিয়ে এসে

হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো ওর। ততক্ষণে বাকি তিনজনেরও একই অবস্থা হয়েছে।

শহীদ বুঝতে পারলো এতক্ষণ এ ঘরের সব কটা লোক তাদের না চিনতে পারার ভান করেছিল মাত্র। তাদের পরিচয় কারো কাছেই অজানা ছিলো না। সবাই কেবল সর্দারের হুকুমের অপেক্ষা করছিল। তবে যে দুদিন আগে জুম্মান মিস্ত্রি ওকে এই দলে ভর্তি করিয়ে দিলো সেটাও কি এদের অভিনয়? আজ ওকে দেখা গেল না কেন? সেও কি এদের হাতে বন্দী হয়েছে?

দোতলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হলো বন্দীদের।

একটা ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে চুরুট টানছিল নেসার আহমেদ চোখ বন্ধ করে। পায়ের আওয়াজ শুনে ধীরে চোখ মেললো সে। মৃদু হেসে বললো, 'আসুন, আসুন, স্বাগতম। নেসার আহমেদকে বন্দী করতে এসেছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের কি বিপরীত লিখন—উল্টো আপনারাই তার হাতে হলেন বন্দী। নিজেদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে আমাকেও কচি খোকা ঠাউরে আপনারা মস্ত ভুল করেছেন, মি. সিম্পসন।'

ততক্ষণে একটা মোটা রশি দিয়ে চারজনকেই শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে একটা মস্ত দরজার লোহার কড়ার সাথে।

'আমাদের নিয়ে কী করতে চাও তুমি বদমাশ?' মি. সিম্পসন রাগতঃ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'মুখের ভাষাটাকে আর একটু মার্জিত করতে শিখুন, মি. সিম্পসন। সৌজন্য প্রকাশ করতে পয়সা লাগে না।' যাকগে, আপনাদের তিনজন, অর্থাৎ আপনি, মি. শহীদ এবং মি. কামালকে আমি এই প্রথম বারের মতো মৃদু শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দেবো, মানে ভবিষ্যতে আমার পেছনে লাগবার দুঃসাহস আর যেন না হয়। আপনাদের গোটা শরীর থেকে মাত্র আধ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা আমি কেটে বাদ দিয়ে দেবো। যাতে খাওয়া দাওয়ার কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে ভাবছি বাঁ হাতের কড়ে আঙুল থেকে শুধু একটা করে গিরে খসিয়ে ছেড়ে দেবো এবারের মতো। এর চেয়ে মৃদুতর শাস্তির কথা আমার মাথায় আসছে না।'

'এ ধরনের হুমকি আমি বহুবার বহু চোর ছ্যাঁচোরের মুখে শুনেছি নেসার। ওতে আমাকে কাবু করতে পারবে না। তুমি জানো, আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করলে তোমার…'

'কচু হবে। একগাদা ভীতু পুলিস নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করেই মনে করেছেন নেসার আহমেদ ধরা পড়ে গেল। যাকগে, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় আমার নেই। আমার যে কথা সেই কাজ। তার প্রমাণ পাবেন অল্পক্ষণ পরেই। তবে আপনাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে আমি বিনা শাস্তিতে তাকে এই প্রথম

বারের জন্যে মুক্তি দেবো। বলুন আপনাদের কারও কিছু বলবার আছে?'

চৌধুরী সাহেব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, নেসার আহমেদ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আপনার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না, দুবার আপনাকে সুযোগ দিয়েছি, তৃতীয় বারে আপনার ক্ষমা নেই। আমি শহীদ, কামাল আর সিম্পসনকে জিজ্ঞেস করছি, কারও কিছু বলবার আছে?'

কেউ কোনও উত্তর দিলো না। এবার এক এক করে নাম ধরে ডাকলো নেসার, 'মি. সিম্পসন?'

তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন, যেন শুনতেই পাচ্ছেন না কিছু।

'মি. শহীদ?'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি। অতি নীচ পাষণ্ড তুমি। তোমাকে এছাড়া আর কিছুই বলবার নেই।'

'মি. কামাল?'

কামাল কোনও উত্তর দিলো না, কেবল কটমট করে নেসারের দিকে চেয়ে রইলো।

'বেশ। একটা ঝামেলা গেল। এবার বলুন, মি. চৌধুরী, চাবিটা এনেছেন?'

'চাবিটা আমার কাছে নেই। বাবা আমাকে ঐ চাবি দিয়ে যাননি।'

'বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা। তাহলে চাবি আপনি দিচ্ছেন না?'

'নেই তো সেটা আমার কাছে।'

'ভাল কথা। আমার দ্বিতীয় চিঠিতে কি লেখা ছিলো নিশ্চয়ই পরিষ্কার মনে আছে আপনার। আমার আদেশ উপেক্ষা করে এর পরেও আপনি পুলিসের সাহায্য নিয়েছেন; এমন কি আজ আমার আস্তানায় উপস্থিত হয়েছেন আমাকে গ্রেপ্তার করে মেয়েকে উদ্ধার করবেন বলে।'

'আমি সেজন্যে মাফ চাইছি নেসার আহমেদ।'

'আপনি সে সীমা লঙ্ঘন করে গেছেন অনেক আগেই মি. চৌধুরী। এখন বৃথা মাফ চেয়ে নিজেকে ছোট করবেন না। আমার কথার নড়চড় হবে না। আপনার স্পর্ধার শাস্তি হিসেবে অল্পক্ষণ পরেই আপনার চোখের সামনে আপনার কন্যার সর্বনাশ করা হবে। ঐখানে বাঁধা অবস্থায় ছটফট করবেন আপনি, তাছাড়া আর কিছুই করবার উপায় থাকবে না আপনার।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে নেসার আহমেদ কয়েকবার পায়চারি করলো ঘরের মধ্যে। তারপর পাঞ্জাবী ভাষায় অনুচরদের কি যেন বললো। তার মধ্যে

'কোরবান আলী' কথাটা ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অল্পক্ষণ পরই নেসার আহমেদের প্রধান অনুচর কোরবান আলী এসে ঢুকলো ঘরে। লম্বা প্রায় সাড়ে ছ'ফুট হবে, এবং সেই তুলনায় প্রস্থও প্রকাণ্ড। পেটা শরীরে পেশীগুলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল এবং কপালের নিচে দুটো জ্বলজ্বলে লাল চোখ। ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো কোরবান।

কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর চৌধুরী সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো নেসার আহমেদ, তারপর বললো, 'আমার এই অনুচরটি আপনার কন্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি হয়ে পড়েছে। আজ দুপুরে একবার ঢুকে পড়েছিল ওর ঘরে প্রেম নিবেদন করতে— বহুকষ্টে ওকে ঠেকানো হয়েছে। আমার প্রিয় সাকরেদের নজর দেয়া জিনিস আমি ভোগ করতে চাই না, তাই ওকেই ডেকে পাঠালাম।'

কোরবান আলীর গোটা কতক নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়লো খুশিতে। কোনও মতে সেগুলোকে চেপে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

'পর্দাটা সরিয়ে ফেলো।'

সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো। নেসারের পিছনে যেটা এতক্ষণ দেয়াল মনে হয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁ ধারের দেয়ালের ভেতর। সামনের বেশ কিছুটা জায়গা খোলা। এবং ঘরটার অপর প্রান্তে ঠিক শহীদদের মতো হাত দুটো পিছমোড়া করে দরজার কড়ার সাথে বাঁধা রয়েছে রীণা চৌধুরী। বাবার সাথে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলো রীণা। বোঝা গেল কোনও কথাই ওর আগোচরে নেই। একটা অসহায় মেয়ের ওপর এতো বড় একটা পাশবিক কাণ্ড ঘটতে চলেছে তার পিতার চোখের সামনে; শহীদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চেষ্টা করলো কয়েকবার হাতের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলতে। তাতে ফল কিছুই হলো না, বাঁধন আরও শক্ত হয়ে বসলো। ওর ব্যর্থ প্রয়াস নেসার চেয়ে দেখলো, তারপর মৃদু হেসে কোরবান আলীকে বললো, 'কোরবান তোমার কাজ তুমি কর।'

লোভাতুর কুকুরের মতো ছুটে গেল কোরবান আলী রীণার পাশে। শাড়ির আঁচলটা ঘাড় থেকে ফেলে দিয়ে একটানে ব্লাউজটা ছিঁড়ে দু'টুকরা করে ফেললো।

রীণার দেহ থেকে শাড়িটা খুলে মাটিতে ফেলে দিলো কোরবান আলী। রইলো কেবল বক্ষাবরণ আর পেটিকোটটা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে উন্মত্ত কোরবানের।

রাগে দুঃখে চৌধুরী সাহেবের চোখে জল এলো। বিড় বিড় করে কেবল উচ্চারণ করলেন, 'আল্লা! তুমি আমার মেয়েকে বাঁচাও!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করলো কলিম। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে

পড়লো সে কোরবান আলীর ওপর। পেছন দিকে ফিরে ছিলো কোরবান আলী। অপ্রস্তুত কোরবান আলীর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে এক টানে তাকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে ফেললো কলিম। তারপর জুতো পায়ে দমাদম ওর নাকে মুখে লাথি মারতে থাকলো। কয়েকটা লাথি খাবার পর উপুড় হয়ে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করলো কোরবান আলী, তখন নিষ্ঠুরভাবে কলিম ওর শরীরের যেখানে সেখানে লাথি মারতে থাকলো।

হঠাৎ কলিমের একটা পা ধরে হেঁচকা টান মারলো কোরবান আলী। পাকা মেঝের ওপর পড়ে কলিমের মাথাটা ভয়ানকভাবে ঠুকে গেল। দরদর করে রক্ত বেরিয়ে পড়লো আগের ক্ষত জায়গাটা থেকে। ততক্ষণে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে কোরবান। দেখা গেল, নির্মম লাথির চোটে একটা চোখ গলে বেরিয়ে পড়েছে কোটর থেকে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে নেসার আহমেদ ছাড়া বাকি সবাই শিউরে উঠলো। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হুড়মুড় করে পড়ে গেল কোরবান আলী রীণার পায়ের কাছে।

ঘটনাটা ঘটে যেতে দশ সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগলো না। নেসার আহমেদ ততক্ষণে রিভলভার তুলে নিয়েছে হাতে। গর্জন করে উঠলো উত্তেজিত নেসার, 'কুকুরের মতো গুলি করে মারবো তোকে শয়তান! মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নে।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লাঠির আঘাতে নেসারের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে। চমকে ফিরে চাইলো নেসার। দেখলো ডান ধারের খোলা জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে কুয়াশা। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড এক গরিলা!

প্যান্টের সাথে ঝোলানো একটা খাপ থেকে একটানে একটা ঝকঝকে ছোরা বের করলো নেসার।

'এতদিনে তোমায় সামনে পেয়েছি কুয়াশা! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।'

ছোরা হাতে লাফিয়ে পড়লো নেসার কুয়াশার ওপর।

বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল কুয়াশা একপাশে। আর নেসার আহমেদ সোজা গিয়ে পড়লো গোগীর কবলে। লম্বা হাত দিয়ে প্রথমেই নেসারের নাক মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড থাবড়া বসালো গরিলাটা। পড়ে যাচ্ছিলো নেসার আহমেদ, কিন্তু চট্ করে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে নিলো অসীম শক্তিশালী গোগী, তারপর ছুঁড়ে মারলো দূরের দেয়াল-টার দিকে। দড়াম করে দেয়ালের সাত ফুট উঁচুতে একটা কাঁচের ফ্রেমে আঁটা ছবির ওপর গিয়ে পড়লো নেসারের দেহটা প্রবল বেগে, তারপর ভাঙা কাঁচের সাথে একই সঙ্গে পড়লো একেবারে সটান মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে। আর উঠলো না।

'ওয়েল ডান্ গোগী! ওয়েল ডান্! এখন ভালো মানুষের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে

থাকো তো!'

বলতে বলতে কুয়াশা এসে দাঁড়ালো হাত বাঁধা অবস্থায় শহীদ, কামাল, মি. চৌধুরী আর মি. সিম্পসনের সামনে।

'ছিঃ ছিঃ? এতগুলো বুদ্ধিমান লোক ছাগলের মতো করে বাঁধা কেন?' শহীদ খান, তুমিও যে এমন বোকামী করবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। যাক, বেশি কথার সময় নেই, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, আমি চলে গেলে কলিম তোমাদের বাঁধন খুলে দেবে। ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো।'

নেসারের সংজ্ঞাহীন দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। তারপর নেসার আহমেদের গলায় বাঁধা একটা চারকোণা তাবিজ এক টানে ছিঁড়ে নিলো।

এদিকে কলিম ততক্ষণে ধীরে ধীরে উঠে বসেছে। অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলো, তারপর নেসারের ছুরিটা দিয়ে রীণার বাঁধন কেটে দিলো। মাটি থেকে কুড়িয়ে রীণার শাড়িটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে এলো শহীদের দিকে।

মি. সিম্পসন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এই যে ভদ্রলোক, আমার হাতের বাঁধনটা কেটে দিন তো। একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

কুয়াশা ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে মি. সিম্পসনের সামনে।

'কেন, এতো তাড়া কিসের? এই বুঝি উপকারের যোগ্য প্রতিদান সিম্পসন?' ভেবেছো কেবল হুইসলটায় তিনটে ফুঁ দিলেই কুয়াশা নেসার দুজনকেই একসাথে ধরে ফেলবে? একসাথে দুজনকে গ্রেপ্তার করা এবার আর তোমার কপালে নেই। তোমার সাথে বোঝাপড়া আমার বাকিই থাকলো।'

খোলা জানালার ধারে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো কুয়াশা গরিলাটাকে। তাকে পিঠে নিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোগী।

আট

ধানমণ্ডি এলাকায় ঈদগাহের কাছে একটা ছোটো ঘর ভাড়া করে থাকে কলিম। মি. চৌধুরীর নীল মরিস মিনি মাইনরটা এসে থামলো সে বাড়ির সামনে। রীণার পেছনে পেছনে কলিমের ঘরে এসে ঢুকলেন মি. চৌধুরী। একটা চৌকির ওপর কাত হয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল কলিম। হঠাৎ চৌধুরী সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে যতখানি না আশ্চর্য হলো তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলো কোথায় বসতে দেবে ভেবে। ওকে বিছানা থেকে উঠবার চেষ্টা করতে দেখে চৌধুরী সাহেব একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'শুয়ে থাকো, শুয়ে থাকো কলিম। উঠো না। এই যে আমি এখানে বসছি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন মি. চৌধুরী।

'এখন কেমন বোধ করছো কলিম? ওষুধগুলো খাচ্ছো তো? কই, ঐ তো ভরা শিশি রয়েছে, একদাগও খাওয়া হয়নি। মাথায় আইস ব্যাগের ব্যবস্থা হয়নি! না কলিম! এখানে তোমার থাকা হবে না।'

কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর রয়েছে গায়ে। এবার মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এই অবস্থায় তোমার একা থাকা চলবে না। এক্ষুণি আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে আমার বাসায়। ওখানে রীণা সব সময়ই দেখাশোনা করতে পারবে।'

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো কলিম। এবার গম্ভীরভাবে বললো,

'চাষার ছেলের জন্যে এই ঘরই যথেষ্ট। আমি এখানেই থাকবো।'

'পাগল ছেলে! এখনও বুঝি অভিমান যায়নি? সে জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি কলিম। আমার সব ভুল ভেঙে দিয়েছে সেই খোঁড়া লোকটা। আমার সেই বংশের মিথ্যা গৌরব ঘুচে গেছে চিরকালের মতো। তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করে আমার মেয়েকে রক্ষা করতে পারো; আর আমি এই সামান্য কাজটুকু করার অধিকার পাবো না? আমি কোনো কথাই শুনবো না কলিম, আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখছি, তোমরা দুজন জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও জলদি।'

গটগট করে বেরিয়ে গেলেন মি. চৌধুরী। এবার রীণা এসে বসলো কলিমের মাথার কাছে। কপালে একটা কোমল হাত রেখে বললো, 'চলো কলিম! আব্বাজান ঠিকই বলেছেন, এভাবে একা থাকা ঠিক হবে না। নেসার আহমেদ পাগলের মতো তোমাকে আর সেই খোঁড়া লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের বাড়ি দশজন পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ওখানে চলো, তোমার এই অসুস্থ অবস্থায় তোমাকে চোখে চোখে রাখতে পারবো এই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।'

'নেসার আহমেদ? কেন, সে ধরা পড়েনি?'

'পুলিসের গাড়ি থেকেই কাল রাতে কৌশলে হাতকড়া খুলে উধাও হয়ে গিয়েছে সে। থানা পর্যন্ত আর নিতে পারেনি ওকে। সেই জন্যেই তো ভয়, তুমি চলো আমাদের সাথে।'

'কিন্তু...'

'আর কোনও কিন্তু নয় কলিম। চলো লক্ষ্মী! আব্বাজন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। আজই সকালে তোমার আব্বাকে টেলিগ্রাম করেছেন, সেই সাথে মাফ চেয়ে লম্বা এক চিঠি দিয়েছেন। দশ তারিখে যে আমাদের বিয়ে!'

'সত্যিই!' লাফিয়ে উঠে বসে কলিম। 'কি করে এটা সম্ভব হলো?'

'সত্যি নয় তো কি? কুয়াশা আব্বাজানের এই পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আচ্ছা কলিম, লোকটা কে?'

'জানি না। তবে এইটুকু বুঝেছি অদ্ভুত বুদ্ধিমান এবং দুর্দান্ত সাহসী এই লোকটার মধ্যে আগুন আছে। এই মহান আগুনের কাছে এলে সবার কালিমা ঘুচে যায়। এমন মানুষ আর দেখিনি আমি।'

আনিস চৌধুরীর বাড়িতে বিকেল বেলায় চায়ের আসর বসেছে। শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন, রীণা সবাই গোল হয়ে বসেছে সামনের লাউঞ্জে। সবুজ ঘাসের ওপর পরিপাটি করে খানকয়েক চেয়ার আর ছোটো ছোটো তেপায়া সাজানো।

আনিস চৌধুরী এসে বসলেন একটা খালি চেয়ারে। শহীদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মনে হচ্ছে এই কয়টা দিন যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে বিশ্বাসই হতে চায় না সব কিছু।'

'সত্যি বলেছেন। ঠিক যেন একটা দুঃস্বপ্ন!'

কামাল শহীদের দিকে চেয়ে বললো, 'কয়েকটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না কিছুতেই। এ ক'দিন ব্যস্ততার মধ্যে জিজ্ঞেস করবার সময়ই পাইনি। একটু বুঝিয়ে দে ভাই।'

'জিজ্ঞেস কর, আমি যতটা বুঝেছি বলবো।'

'মিশরীয় নর্তকীকে খুন করা হলো কেন?'

'তার কাছে মিশরের পিরামিডের নিচের একটা গুপ্তধনের নক্সা ছিলো, তাই।'

'গুপ্তধনের নক্সা! পিরামিডের নিচে...'

'হ্যাঁ, এই নর্তকী ছিলো মিশর রাজকুমারীর বাল্য-সখী। রাজ-অন্তঃপুরে ছিলো তার অবাধ যাতায়াত। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই জেবা ফারাহ সুযোগ বুঝে একদিন রাজবাড়ি থেকে নক্সাটা চুরি করলো। মহামূল্যবান ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য সেই পিরামিডের তলায় রক্ষিত আছে কয়েক হাজার বছর ধরে, রাজ্যের দুর্দিনে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। নক্সা চুরির কথা জানাজানি হলে পরে খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো রাজ-অন্তঃপুরে। যে কয়েকজনকে সন্দেহ করে নজরবন্দী রাখা হলো জেবাও তাদের মধ্যে একজন। মিশর সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলো এদের বিরুদ্ধে। রাজরোষ এড়াবার জন্যে নানান ছলে জেবাকে পালিয়ে আসতে হয় তুরস্কে। সেখানেও শান্তি নেই, মনের মধ্যে সন্দেহ—মিশরীয় গুপ্তচর নিশ্চয়ই লেগে আছে পেছনে। তাই সারা মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয়া, ইরান, ইরাক, টার্কি আজ এখানে কাল ওখানে নাচ দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো জেবা ফারাহ। সেই সূত্রেই লাহোরে এসে উপস্থিত হলো একদিন সে।

এবং সেখানেই পড়লো নেসারের খপ্পরে।

'অনেক রকম প্রলোভন এবং ভয় প্রদর্শনেও যখন জেবা কিছুতেই দিলো না নক্সাটা, বারবারই পিছলে বেরিয়ে গেল ওর হাতের মুঠি থেকে তখন তাকে হত্যা করে নক্সাটা ছিনিয়ে নেবার সঙ্কল্প নিয়েই সে এসেছিল ঢাকায়—এবং তাই সে করেছে।'

'গল্পটা মন্দ লাগলো না শুনতে। কিন্তু এ গল্প পেলে কোথায় তুমি শহীদ?' মৃদু হেসে মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছুটা আমার কল্পনা, কিছুটা কাফ্রী দেহরক্ষী খোদা বক্সের কাছ থেকে নানান কথার ছলে বের করে নেয়া আর বাকিটুকু বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি। নেসারের আড্ডায় কুয়াশা যে তাবিজটা ওর গলা থেকে টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল, তারই মধ্যে রয়েছে সেই নক্সাটা। এই তাবিজেরই কিছুটা মোম পেয়েছিলাম আমি জেবার বিছানার ওপর। নেসার আহমেদ তাবিজের মুখে আটকানো এই মোম খুলে পরীক্ষা করে নিয়েছিল সত্যি সত্যিই নক্সাটা আছে কিনা তাবিজের মধ্যে।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও কুয়াশাও জানতো এই নক্সার কথা?'

'নিশ্চয়ই। সেও গিয়েছিল জেবার ঘরে এরই জন্যে। কিন্তু কিছুটা দেরি করে ফেলেছিল।'

'যদি স্বীকার করে নিই এরই জন্যে কুয়াশাও গিয়েছিল সেখানে, তবে সে নেসারের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিলো না কেন?'

'কুয়াশা যখন সে ঘরে উপস্থিত হলো, ততক্ষণে নেসার সরে পড়েছে।'

'কোন্ পথে? নেসার আহমেদ অদৃশ্য হলো কোন্ পথে?'

একটু হেসে শহীদ বললো, 'কেন, সদর দরজা দিয়ে। এটা তো সাধারণ কথা। একটু কল্পনার আশ্রয় নিলেই বোঝা যায়। জেবা ফারাহ্‌কে হত্যা করে নেসার নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছে সেই কামরায়। খোদা বক্স যখন দরজায় করাঘাত করে তখনও সে চুপচাপ বসে আছে সে ঘরে। তারপর যখন মুহুর্মুহু টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করলো তখন নিশ্চিন্ত মনে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে সে।'

'এটা হতেই পারে না। পুলিস এসে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ পেয়েছে।' সিম্পসন আপত্তি তুললেন।

'তাতো পাবেই। দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ পাবেই। নেসারের অন্তর্ধানের অল্পক্ষণ পরেই কুয়াশা এসে উপস্থিত হয়েছে পাম গাছটা বেয়ে। দরজাটা খোলা দেখে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে নক্সাটা খুঁজেছে তন্ন তন্ন করে, তারপর না পেয়ে আবার গাছ বেয়ে নেমে গেছে গরিলার সাহায্যে।'

'I see! এতক্ষণে বুঝলাম! এই সাধারণ কথাটা আমার মাথায় খেলেনি শহীদ।

সেই সেদিন থেকে ভেবে মরছি তৃতীয় লোকটা অদৃশ্য হলো কোন্ পথে। যাক্, আর একটা কথা। সেদিন কুয়াশার জেবার ওখানে যেতে দেরি হয়ে যেতো না, যদি সে তোমার বাসায় সময় নষ্ট না করতো। সে তোমার বাসায় গিয়েছিল একথা আমি যেমন জানি, তুমিও জানো; কিন্তু আমার কাছে অস্বীকার করলে কেন?'

'এখনও অস্বীকার করছি। যদি সে গিয়ে থাকে, গিয়েছে আমার অজান্তে।'

'তুমি বলতে চাও, সেই বর্ষার সন্ধ্যায় তুমি বাড়ি থেকে বেরোওনি, অথচ তোমারই বৈঠকখানায় একটা জ্যান্ত গরিলা কারও সাথে ধস্তাধস্তি করে গেল, ঝনঝন করে একটা আলমারির কাঁচ ভেঙে গেল, আর তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানো না? কুয়াশার প্রতি তোমার এই দুর্বলতার কারণ কি? তোমরা কুয়াশাকে সব সময় আড়াল করে রাখছো কেন? এর কি জবাব দেবে তোমরা শহীদ! তোমাদের সাথে কুয়াশার কি সম্পর্ক? একটা হীন দস্যুর সাথে তোমাদের কি ধরনের যোগাযোগ থাকতে পারে? তোমরা…'

কলিম বাধা দিয়ে বললো, 'কুয়াশাকে হীন দস্যু বলেছেন কেন মি. সিম্পসন। সে তো কোথাও চুরি বা ডাকাতি করেনি! বরং আমাদের সবাইকে নিজের জীবন বিপন্ন করেও এক সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।'

'দেখুন মি. কলিম, সরাসরি কোনও ডাকাতি কুয়াশা করেনি ঠিকই, কিন্তু চোরাই মাল তার কাছে আছে। নেসার আহমেদ ডাকাতি করেছে আর কুয়াশা নিয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে। আইনের চোখে যে চুরি করে আর যে চোরের উপর বাটপারি করে, দুজনেই সমান অপরাধী।'

'তা অবশ্য ঠিকই। তবে…'

'আর কোনও তবে নেই এর মধ্যে, মি. কলিম। আমার দুই একটা প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য উত্তর দিতে হবে আপনাকে। এখন একমাত্র আপনিই ভরসা। আপনার কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেলে আজই রাতে আমি কুয়াশাকে গ্রেপ্তার করতে পারবো।'

'বলুন কি প্রশ্ন আপনার।'

'সেদিন রাতে কি আপনাকে সাহায্য করতেই কুয়াশা নেসারের আড্ডায় গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে সে-ই চিনিয়ে দিয়েছিল সে আড্ডা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সাথে তার পরিচয় কতদিনের?'

'পাচ ছয় দিনের।'

'সে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো কী স্বার্থে?'

'কোনও স্বার্থেই নয়। তিনি স্বার্থপরতার উর্ধে।'

'ওর বাড়িতে গিয়েছেন কখনও?'

'গিয়েছি।'

'এখন চিনতে পারবেন সে বাড়িটা?'

'খুব চিনতে পারবো। কিন্তু প্রাণ গেলেও আপনাকে চিনিয়ে দেবো না। এ নিয়ে দয়া করে বৃথা তর্ক করবেন না। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার?'

কোনও উত্তর না দিয়ে মি. সিম্পসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চৌধুরী সাহেবের প্রতি সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়ালেন গেটের দিকে, তারপর কি ভেবে থেমে শহীদের দিকে ফিরে বললেন, 'শহীদ, এই পার্টিটা সেরেই চলে এসো আমার অফিসে। খুব জরুরী ব্যাপার আছে। ভুলো না কিন্তু।'

চলে গেলেন মি. সিম্পসন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। কালো হয়ে মেঘ করেছে আকাশে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে অল্পক্ষণ হলো। প্রচণ্ড দুর্যোগের পূর্বাভাস।

অতিথিদের নিয়ে মি. চৌধুরী চলে গেলেন ড্রইংরুমে। পাশাপাশি বসে রইলো কলিম আর রীণা। রীণার একটা হাত কলিমের হাতে। কলিম মৃদু স্বরে ডাকলো, 'রিনি!'

'কি?'

'কিছু না।'

'ডাকলে যে?'

'এমনি তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে।'

দুজনেই হাসলো। তারপর চুপ করে বোধহয় একই সাথে ভাবতে লাগলো আগামী দশ তারিখের কথা।

এমন সময় কাছেই একটা পায়ের শব্দে দুজনেই চমকে উঠলো। তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা। কলিমের কাঁধে একটা হাত রেখে কুয়াশা বললো, 'আমি আজ চলে যাচ্ছি এদেশ ছেড়ে। ভাবলাম যাবার আগে তোমাদের বলে যাই। তোমাদের বিয়েতে উপহার দেবার মতো কিছুই নেই আমার। অনেক টাকা উপার্জন করেছি আমি, কিন্তু সে সবই চুরি ডাকাতির টাকা—সে টাকায় কেনা কোনও উপহার দিয়ে তোমাদের আগামী দিনের পবিত্র সুন্দর সূচনাকে আমি অশুভ করবো না। তাই বিদায় কালে আমি শুধু মুখেই তোমাদের আর্শীবাদ করে যাচ্ছি,—চির সুখী হও। কল্যাণময় হোক তোমাদের জীবন! উজ্জ্বলতর হোক তোমাদের প্রেম!'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কুয়াশার ছায়ামূর্তিটা।

চৌধুরী বাড়ির গেট ছাড়িয়েই হঠাৎ কামাল শহীদকে বললো, 'কথাগুলো কিন্তু অন্যায় বলেননি মি. সিম্পসন। আমিও এ নিয়ে কদিন ধরে অনেক মাথা ঘামাচ্ছি। কুয়াশার প্রতি আমাদের এই অহেতুক দুর্বলতা কেন? একটা দস্যুর সাথে আমাদের কিসের এতো দহরম-মহরম? এক সময় হয়তো সে বন্ধু ছিলো—তা আমরা ওকে চিনতাম না বলে—তাই বলে কি ও যা খুশি অন্যায় কাজ করে যাবে, আমরা কিছুই বলবো না? এই কি আমাদের ব্রত—এই কি আমাদের ন্যায়-নীতি? এর কি জবাব দিবি তুই, বল্?'

শহীদের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। মাথাটা সামনের দিকে একটু নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো সে—কোনও উত্তর দিতে পারলো না। সত্যিই তো, এর কি জবাব দেবে সে? অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিজের বিবেককে সে কোন্ ব্যাখ্যা দিয়ে শান্ত করবে? এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। সমস্ত মায়া-মোহ-দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যদি ন্যায়ের পথে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে না-ই পড়তে পারলো, তবে কেন মিছেমিছি ভড়ং করছে সে? কুয়াশার পক্ষে বা বিপক্ষে, কোনও দিকেই কিছু কাজ করতে পারছে না সে। কেউ যেন দুহাত বেঁধে নিরুপায় করে রেখেছে ওকে। ছি, ছি, এ কী অবস্থায় পড়লো সে?

'গোয়েন্দাগিরি আমি ছেড়ে দেবো কামাল।'

'কেন?' বিস্মিত কামাল ভ্রূ কুঁচকে চাইলো শহীদের দিকে।

'দিনের পর দিন নিজের কাছে নিজে ছোটো হয়ে যাচ্ছি।'

'সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সোজা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবি না?'

'না।'

'এই তোর মনের বল্? এই তোর চরিত্রের দৃঢ়তা? এই তোর কর্তব্যনিষ্ঠা? তুই কী রে?'

কোনও উত্তর নেই শহীদের মুখে। বেদনায় বুঝি কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হয়ে। একটা মোড় ঘুরতেই কামাল বললো, 'আমাকে নামিয়ে দে এখানে, একটু কাজ আছে।'

প্রচণ্ড ঝড় এবং সেই সাথে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে শহীদের মরিস মাইনর গাড়িটা এসে থামলো মি. সিম্পসনের অফিসের সামনে। সিম্পসন প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়া দাওয়া শেষ করে এসেছো তো?'

'না। আমি চৌধুরী সাহেবের বাসা থেকে সোজা আসছি।'

'বেশ করেছো। এখন আমার সাথে কিছু খেয়ে নাও তো, আজ সারারাত হয়তো জাগতে হতে পারে বনে–জঙ্গলে।'

'আপনি খান, আমার ক্ষিধে নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ শিকারের ঝোঁক নাকি?'

'শিকার? তা কিছুটা শিকার তো বটেই। গরিলা শিকার। আজ আমার শেষ চেষ্টা। আজও যদি বিফল হই তবে আর কুয়াশাকে ধরতে পারবো না কোনদিন।'

'আমাকে আর এর মধ্যে টানছেন কেন, মি. সিম্পসন। অবিশ্বাসের পাত্র হয়েও আপনার সাথে একসঙ্গে আমি কাজ করতে পারবো না। আমাকে ডেকে ভুল করেছেন।'

'ঠিকই করেছি শহীদ। তুমি তো কুয়াশাকে সাহায্য করছো না, আমাকেও বাধা দিচ্ছো না। কেবল ওর ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ চেপে যাচ্ছো। এতে অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমি বুঝতে পারছি তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা আছে। আমার সাথে চলো শহীদ। তুমি সাথে থাকলে অনেক লাভ আছে।'

'মাফ করবেন, মি. সিম্পসন, আমি কচি খোকা নই কিম্বা খেলার পুতুলও নই। আপনি মনে করেছেন, আমি সাথে থাকলে আপনি নিরাপদে আমার আড়ালে থেকে কাজ উদ্ধার করতে পারবেন। আমাকে কুয়াশা কিছুই বলবে না, সেই সুযোগে আপনিও ওর আড্ডায় হানা দেবার বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। কেন? আপনার সাহস নেই? একটা খোঁড়া লোককে এতো ভয় পাবার কি আছে? আপনি একাই যান, মি. সিম্পসন, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না।'

শহীদ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বিলাতী কায়দায় একবার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নিলেন মি. সিম্পসন, তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন মুচকি হেসে।

তুমুল বর্ষণ চলছে বাইরে। রাত ন'টা সাড়ে–ন'টা হবে। কুয়াশা তার ল্যাবরেটরীতে বসে নিবিষ্টচিত্তে কি যেন পরীক্ষা করছে। শান্ত সৌম্য চেহারা তার।

ঘরের এক কোণে মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে গোগী। বাড়ি থেকে এদিকে ওদিকে বেরিয়ে গিয়ে কি বিপদ বাধিয়ে বসবে সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

কিছুক্ষণ ধরে একটু বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে গোগী। ছটফট করছে, আর শিকলটা ছিঁড়বার চেষ্টা করছে। কুয়াশা একবার ওর দিকে চেয়ে বললো, 'Quite Gogi! চুপচাপ বসে থাকো, কাজ করছি এখন।'

কিন্তু আরো চঞ্চল হয়ে উঠলো গোগী। কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে কিন্তু বোঝাতে পারছে না।

ঠুং ঠাং শিকলের শব্দে বিরক্ত হয়ে কুয়াশা আবার ফিরে চাইলো গোগীর দিকে।

একমুহূর্ত গোগীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলো কি যেন। তারপর বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালো দরজার দিকে।

'এবার? এবার কোথায় যাবে কুয়াশা?'

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেসার আহমেদ। হাতে উদ্যত রিভলভার।

'কোনও রকম চালাকীর চেষ্টা করো না। ভালোয় ভালোয় নক্সাটা বের করে দাও।' বললো নেসার।

এবার কোমরে বাঁধা শিকলটা ছিঁড়বার জন্যে পাগলের মতো টানাটানি আরম্ভ করলো গোগী। চিনতে পেরেছে সে নেসারকে। ওর দিকে চাইতেই জ্বলে উঠলো নেসার আহমেদের হিংস্র দুটো চোখ। রিভলভারের মুখটা ঘুরে গেল গোগীর দিকে।

'তুমিও আজ মজা টের পাবে বাছাধন। আজ শিকলে বাঁধা আছো। তোমার নাগালের বাইরে আজ আমি।'

গুড়ুম্ করে গুলি ছুঁড়লো নেসার। কিন্তু পিছন থেকে কে যেন ওর হাতে একটা ধাক্কা দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলো ওকে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালো নেসার। দেখলো একজন লোক দাঁড়িয়ে আসে ওর সামনে। মুখে একটা কালো মুখোশ পরা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা সবল সুঠাম দেহের অধিকারী এই আগন্তুক। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে।

নেসারের কব্জিতে একটা বিশেষ কায়দায় চাপ দিতেই ঠিক শিশুর হাতের খেলনার মতোই রিভলভারটা পড়ে গেল মাটিতে। পা দিয়ে একটা লাথি মেরে রিভলভারটা ঘরের এক কোণে সরিয়ে দিলো মুখোশধারী। নেসার আহমেদ ততক্ষণে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে। অসুরের মতো শক্তিশালী নেসার এবার খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। এলোপাতাড়ি কয়েকটা ঘুসি খেয়ে আগন্তুক পিছিয়ে গেল কিছুটা। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো নেসার আহমেদ প্রবল বিক্রমে। এবার কিন্তু ফল হলো উল্টো। অদ্ভুত কায়দায় লোকটা অল্প একটু সরে গিয়ে নেসারের একটা হাত ধরে ফেললো। তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে আছড়ে ফেললো মাটিতে। নেসারও কম যায় না। মাটিতে পড়লো বটে কিন্তু মুখোশধারীকে নিয়েই পড়লো। আগন্তুকের বুকের ওপর উঠে বসে তার গলা টিপে ধরলো নেসার।

এদিকে কুয়াশা পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা চাবি—গোগীর শিকল খুলবার চাবিটা পাওয়া যাচ্ছে না।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েও নেসারের হাত দুটো গলা থেকে ছাড়াতে পারলো না লোকটা। তখন পা দুটো ভাঁজ করে এনে নেসারের গলায় বাধিয়ে জোরে একটা লাথি মারলো সে। ডিগবাজী খেয়ে নেসার ছিটকে পড়লো দূরে। জোরে দেয়ালে ঠুকে গেল তার মাথাটা। এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক বুশ শার্টের কলার ধরে টেনে তুললো নেসারকে,

তারপর দেয়ালের সাথে ঠুকতে থাকলো ওর মাথাটা প্রবল বেগে যতক্ষণ না সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লো।

ড্রয়ার থেকে একটা শক্ত দড়ি বের করে ছুঁড়ে দিলো কুয়াশা মুখোশধারীর দিকে। বললো, 'তোমাকে চিনতে পারলাম না ভাই, কে তুমি, এমন ভাবে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে চিরঋণী করে রাখছো?'

কোনও জবাব না দিয়ে মুখোশধারী নেসারের হাত পা ভালো করে বেঁধে ফেললো। এমন সময় কাছেই কয়েকটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ হতেই কুয়াশা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো। আগন্তুককেও একটু বিচলিত মনে হলো।

একটা বোতল থেকে কিছু এসিড ঢেলে দিলো কুয়াশা গোগীর কোমরে বাঁধা লোহার শিকলের ওপর। গলে গেল লোহা। মুক্তি পেয়েই গোগী নেসারের দিকে চললো।

ঠিক এমনি সময়ে সামনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মি. সিম্পসন, সাথে তিনজন রাইফেলধারী সেপাই। ঢুকেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাণ্ডস আপ। যে যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো—কেউ এক পা নড়াচড়া করবে না।

গোগী থমকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলো, তারপর এগিয়ে গেল থপ্ থপ্ করে মি. সিম্পসনের দিকে। সেপাইগুলো এই ভয়ঙ্কর গরিলা মূর্তি দেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। এক মুহূর্তে মনস্থির করে গুলি করলেন মি. সিম্পসন। বাঁ হাতের কনুইয়ের একটু ওপরে লাগলো গুলিটা। যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল বিকট গরিলার ভয়ঙ্কর মুখ। ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলো রক্ত পড়ছে ক্ষত জায়গাটা থেকে। এবার সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো গোগী। এক লাফে মি. সিম্পসনের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাইফেলটা রি-লোড করবার আর অবসর হলো না। গোগীর ডান হাতের এক প্রচণ্ড চাপড়ে ধরাশায়ী হলেন মি. সিম্পসন। পেছনের সিপাইগুলো ততক্ষণে উধাও হয়েছে। ঠিক সেই সময় টমিগান হাতে দশ বারোজন মিলিটারীকে পেছনে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন কমাণ্ডার শেখ।

ঠুং করে একটা শব্দ হলো, যেন কোনও শিশি মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। এক মুহূর্তে ঘরটা পুরো ধোঁয়ায় ভরে গেল, আর সেই সাথে তীব্র বিষাক্ত গন্ধ। ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলেন না কমাণ্ডার শেখ। শুধু শুনলেন, কে যেন মৃদুস্বরে বলছে, 'গোগী, কাম টু মি!'

ধোঁয়া যখন একটু হাল্কা হলো, তখন ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা নেসার আর অজ্ঞান মি. সিম্পসন ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না।

*

আধঘন্টা পর জ্ঞান ফিরে পেলেন মি. সিম্পসন। উঠেই বললেন, 'কুয়াশা কোথায়?'

'পালিয়ে গেছে।' কে যেন পাশ থেকে বললো।

উঠে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন।

'এক্ষুণি যেতে হবে এয়ারপোর্টে। ড্রাইভার, জলদি গাড়ি স্টার্ট করো।

ধানমণ্ডি থেকে একটা জীপ দ্রুত চলে গেল এয়ারপোর্টের দিকে। এবং তার পিছন পিছন চললো বড় একটা মিলিটারী ট্রাক।

মি. সিম্পসন যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন তখন একটা অস্টার প্লেন রানওয়ের ওপর এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। ছুটে গেলেন তিনি প্লেনটার কাছে। কিন্তু বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলো প্লেনটা।

পাইলটের পাশের সীটের জানালা দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর গরিলার মুখ বেরিয়ে এলো বাইরে। মি. সিম্পসন আর তার বাহিনীকে দেখে মুখ বিকৃত করে ভেংচি কাটলো গরিলাটা।

এক মিনিটের মধ্যেই আকাশে উঠে গেল প্লেনটা। একবার মাথার ওপর পাক খেয়েই চলে গেল সোজা মিশরের পথে।

মি. সিম্পসন চিন্তিতভাবে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন,

'কিন্তু, মুখোশধারী লোকটা কে?'

শেষ

ভলিউম–১

কুয়াশা

১–২–৩

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে–বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট–বড় সবাই এবই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।



সেবা প্রকাশনী,২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো–রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পঁচিশ টাকা